॥ প্রাচীন ইরাক ॥

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

স্নেহের রুবি ও রেবা,

গৃহকর্মের অন্তরাল থেকে যিনি তাঁর সজীব আগ্রহের মৌন স্পর্শ দিয়ে আমার এই গ্রন্থরচনায় বিশেষ উৎসাহ যুগিয়ে এসেছিলেন, আজ তিনি আর ইহলোকে নেই। তাঁর পুণ্যস্মৃতির প্রদীপ জেলে ধূপগন্ধে আমার জীবনের প্রদোষক্ষণটিকে ঈষৎ আলোকিত, ঈষৎ সুরভিত করে তোমরা আমায় চালিয়ে নিয়ে যাবে সেই লক্ষ্যপথে, যে পথে চলার সার্থকতা কামনা করতেন তোমাদের মা—এই আমার ভরসা।

বাবা

গ্রন্থকারের নিবেদন

প্রাচীন কালের মিশর, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ইরানের ইতিহাস, কী ঘটনার পারম্পর্যে কী সংস্কৃতির বিবর্তনে, সকল বিষয়েই পরস্পর-সাপেক্ষ, তাই সেসব দেশের কাহিনী একে অন্যের পরিপূরকরূপেই বর্ণনীয় ও পঠনীয়। ইতিপূর্বে 'প্রাচীন মিশর' প্রকাশিত হয়েছে। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলাম, "প্রাচ্যভূমির (নিকট ও মধ্য প্রাচী-র) জ্ঞানের বৃত্ত যা আরম্ভ করা হয়েছে মিশরে, সে বৃত্তকে সম্পূর্ণ করতে হয় সেখানকার অন্যান্য দেশ-গুলির, বিশেষত প্যালেস্টাইন ইরাক ও ইরানের ইতিহাস পাঠ করে।...অদূর ভবিষ্যতে এই ইতিহাসসমূহের প্রকাশন প্রধানত নির্ভর করবে বাংলার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত পাঠকের আগ্রহ এবং সরকারি শিক্ষা-বিভাগের সক্রিয় সমর্থনের ওপর।" বড়ই সুখের কথা, প্রাচ্যভূমির প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের কৌতূহল বাঙালী পাঠকের মনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগও ইরাকের প্রাচীন ইতিহাস মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য অর্থদানে ক্রুটি করেন নি। সেই কারণেই 'প্রাচীন মিশর'-এর পর এত শীঘ্র এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হল। আগ্রহশীল পাঠকের কাছে প্যালেস্টাইন (ইসরায়েল) ও ইরানের প্রাচীন ইতিকথা যথাকালে উপস্থিত করতে পারা যাবে, এমন আশা এখন আর সুদূরপরাহত নয়।

এসব বিদেশ-বিভুঁয়ের প্রাচীন ইতিহাসকাহিনীর সার্থকতা, সে শুধু চলচ্চিত্রের বর্ণাঢ্য মিছিলের অপরূপ শোভাদর্শন নয়, যদিও মিছিলটি এমনই যে আধুনিক মানুষের চিত্তেও তার বৈচিত্র্য বেশ খানিকটা দোল না দিয়ে যায় না। আসলে কিন্তু মানবজাতির সভ্যতার বিকাশ, তার ধর্ম ও পুরোহিত-তন্ত্র, রাজা ও রাজ্যশাসন, রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যগঠন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি শিল্প কারিগরি, এই প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থাৎ গোটা সমাজের বিবর্তন-পদ্ধতিটাই প্রতিফলিত রয়েছে এই দেশগুলির অতীত কাহিনীর মধ্যে। এখানকার মিলনক্ষেত্রেই একদিন সেমেটিক ও আর্য সভ্যতা মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ইহুদিধর্ম, জরথুষ্ট্রধর্ম, খৃস্টধর্ম, মনিধর্ম (Manichaesm) ও

ইসলামের পর-পর আবির্ভাব, নব-নব সমাজের বিকাশ, আর সেই সব ধর্ম ও সমাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংস্কৃতির রূপায়ণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষ, ফলকথা সভ্যতার সার্বিক বিবর্তনধারার পরিচয় লাভ করতে হলে এখানকার স্মৃতিভাণ্ডারের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

স্বীকার করতে বাধা নেই, ভারতের আদিকালের ইতিহাস ঘন-তমসাচ্ছন্ন। মাহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কালের নিদর্শন বহন করলেও আর্যদের সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক জীবনযাত্রার ওপর রশ্মিপাত করে সামান্যই। সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা সমকালীন, ও দুটিকে একই সভ্যতা, একই বৃন্তের দুই প্রসূন বলা চলে। কিন্তু যে উন্নত নাগরিক সভ্যতার প্রতীক সিন্ধু, তার সঙ্গে বৈদিক আর্যসমাজের সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে অনেক পণ্ডিতই গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়েন। প্রশ্ন ওঠে, কোথা গেল বৈদিক দেবরাজ ইন্দ্র, অসুর বরুণ, মিত্র, নাসত্য? আর কেমন করেই বা সেখানে এল শিব কালী, আদ্যাশক্তির পূজা, যেমনটি প্রচলিত ছিল ব্যাবিলোনিয়ায়, মাহেঞ্জোদারো-হরপ্পায়? ভারতীয় সভ্যতার এই গূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করতে সুমেরীয় ইতিহাস যে অনেকখানি সাহায্য করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, প্রাচীন ঐতিহ্য কিরূপে আগন্তুক জাতির ভাবধারাকে প্রভাবিত করে সাংস্কৃতিক পারম্পর্য অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা এখানকার ইতিবৃত্তে দেখতে পাই।

এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছেন কবি কৃষ্ণধন দে। প্রকাশনকার্যে শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এবং মুদ্রণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়। এঁদের সকলকেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচি

চিত্রসূচি

রেখাচিত্র

হাফটোন চিত্র

অবতরণিকা

মানব-সভ্যতার গোড়ার কথা

চতুর্থ বরফযুগের শেষে মানবজাতির জীবনে একটি পরম সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছিল। বরফযুগে আল্‌প্‌স্‌ পিরেনিস পর্বতমালা থেকে শুরু করে ইউরোপের গোটা উত্তরাংশ ছিল বরফ ও গ্লেসিয়ার দ্বারা আচ্ছন্ন। তখন উত্তর আফ্রিকার প্রাকৃতিক অবস্থা অনেকটা এখনকার ইউরোপের মতই ছিল। সারা বছর ধরে বৃষ্টি হত, এবং মানুষ সেখানকার বনে-জঙ্গলে জীব-জন্তু শিকার করে বেড়াত। পুরনো প্রস্তরযুগের আমলের পাথর ছিল তাদের হাতিয়ার, নূতন প্রস্তরযুগ তখনো দেখা দেয় নি। পাথরকে ঠুকে ঠুকে ভেঙে কতগুলি অমসৃণ অস্ত্র তৈরি করত তারা—সেগুলি না ছিল তেমন ধারালো, না ছিল কার্যকরী। তবু এইসব অস্ত্রাদি দিয়ে শিকার করেই মানুষকে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করতে হত। এমন সময় প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটল বরফযুগের অবসানের সঙ্গে। মধ্য ইউরোপের যে জায়গাগুলি ছিল চিরতুষারাবৃত সেখান থেকে বরফ উত্তর দিকে সরে যাবার ফলে আফ্রিকায় বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে গেল, জলাভূমি শুকিয়ে গেল—পরিশেষে সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হল। নূতন আবেষ্টনের মধ্যে তখন নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছিল মানুষের সামনে। বন-জঙ্গল নেই যে সেখানে জীবজন্তু বাস করবে, আর শিকার না পাওয়া গেলে মানুষ জীবনধারণ করবে কেমন করে? জলা-ভূমিও নেই যে মাছ ধরা যাবে। সেখানে থাকতে গেলে করতে হয় অভ্যাসের পরিবর্তন। শিকারের পরিবর্তে পশুপালন-কার্য ধরতে হয়। শিকারী-জীবনেই পশুকে ধরে আটকে রাখার অভিজ্ঞতা বোধ করি তাদের কিছু-কিছু হয়েছিল। যারা সেই পশুপালন-কাজকেই জীবনের মূল বৃত্তি বলে গ্রহণ করল তারা ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতি (nomad)-রূপে চারণভূমিগুলিতে পশু চরিয়ে বেড়াতে লাগল। এইসব যাযাবর জাতির সাক্ষাৎ আমরা এখনো পেয়ে থাকি আরব ও মধ্য এশিয়ার মরু অঞ্চলে। আর যারা অভ্যাসের পরিবর্তন করে যাযাবরের জীবন যাপন করতে চাইল না, তাদের কোন দল গেল শীতপ্রধান ইউরোপে—সেখানে তাদের অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্যে শিকারী মানুষের জীবন পূর্ববৎ চালিয়ে যেতে লাগল তারা। ডানিয়ুব উপত্যকা, সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জলাভূমি প্রভৃতি স্থানে কালক্রমে তারা নব-প্রস্তর-

যুগের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল তারা সভ্যতার পথে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে নি। উত্তর আফ্রিকার আর কতগুলি দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে যে সুজলা সুফলা বনভূমিতে প্রবেশ করেছিল, সেখানে ছিল স্বচ্ছন্দজাত ফলমূল ও আহার্যের প্রাচুর্য। উষ্ণ ক্লান্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের জীবন এখানে স্বভাবতই অলস মন্থর হয়ে আসে, জীবন-রক্ষার জন্য উদ্ভাবনী ও সৃজন শক্তির তেমন প্রয়োজন হয় না। এই তো গেল দুই দলের মানুষ যারা স্থান বদলাল বটে কিন্তু অভ্যাস বদলায় নি। বাকি কতগুলি দল আবার স্থান ও অভ্যাস, উভয়েরই পরিবর্তন করে নীল নদীর উপত্যকা-ভূমিতে এসে বসবাস করতে লাগল। সেইমত আরও কতগুলি দল মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীর উপত্যকাভূমিতে এসে পড়েছিল বলে মনে হয়। মিশরের দক্ষিণ প্রান্তে পর্বতশ্রেণী, সেখান থেকে উত্তর মুখে বয়ে নীল নদী পড়েছে ভূমধ্যসাগরে, একটি ব-দ্বীপ সৃষ্টি করে। তেমনি উত্তর দিকের পর্বতমালা থেকে দক্ষিণ দিকে বয়ে গেছে দুইটি বিশাল খরস্রোতা নদী, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস। নদী দুটিকে এখন দেখা যায়, তারা একটি সংগম-স্থলে গিয়ে মিশেছে, প্রাচীন কালে কিন্তু এই দুইটি নদীর জল বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে সরাসরি পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়ত। নীল নদীর উপত্যকার মত এই দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানটিও ছিল স্নিগ্ধ শ্যামল জলাভূমি— এমন উর্বরা যে পরিশ্রম সহকারে চাষ-আবাদ করলে সেখানে সোনা ফলানো যেত। নব আগন্তুকের দল পূর্বপুরুষের ভ্রাম্যমাণ শিকারীর জীবন ছেড়ে কৃষিজীবী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা যে কেমন করে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করেছিল তার আদি কথাটি এখন পর্যন্ত রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। তবে এ সম্বন্ধে একটা সংগত অনুমান করা চলতে পারে। নদীর তটভূমিতে জংলা গম ও যব জন্মাত স্বাভাবিকভাবে, এবং তাই সংগ্রহ করে আহার করত তারা। শস্যের ঝরতি-পড়তি থেকে নূতন চারা গজিয়ে ওঠে, বর্ষণের পর বা নদীর জলে মাটি যখন সিক্ত হয়, এসব তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিল। তারা আরও দেখেছিল যে বিশেষ কোন কালেই বর্ষণ হয় বা নদীর জল ফেঁপে উঠে তটভূমিকে প্লাবিত করে। বংশপরম্পরায় বার-বার একই রকম অভিজ্ঞতার ফলে তাদের পক্ষে ঋতু নির্ধারণ বছর গণনা প্রভৃতি সম্ভব হয়েছিল, জ্যোতির্বিদ্যার (astronomy) ভিত্তি পত্তন করল তারা এমনি করেই। শুধু তাই নয়,

শস্য-বীজ সংগ্রহ করে রেখে ঋতুকালে বর্ষণের পর জলসিক্ত ভূমিকে খুঁড়ে তার উপর বীজ ছড়িয়ে দিলে ফসল জন্মায়, এই জ্ঞানটুকু হতে তাদের খুব বেশি সময় লাগে নি। শস্যের জন্ম ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কালক্রমে কৃষির উদ্ভাবন এবং কৃষিবিদ্যাকে আয়ত্ত করতে পেরেছিল তারা। শস্য সঞ্চয়, নিয়মিতভাবে চাষ ও ফসলের প্রত্যাশা তাদের জীবন থেকে ভ্রাম্যমাণের অনিশ্চয়তাকে দিল দূর করে। তারা হল তখন স্থিতিবান (settled) কৃষি-জীবী জাতি। পশুপালন করত তারা, এবং পশুকে চাষের কাজে ব্যবহার করতেও কালক্রমে শিখেছিল। তখন হয়েছিল নব-প্রস্তরযুগের (neolithic age) প্রবর্তন, নানাবিধ শিল্পের কাজও কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল। কৃষি-শিল্পের এই নিম্নতম স্তর থেকে ধাপে ধাপে উঠে, উপত্যকার অধিবাসীরা সভ্যতার দুটি বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই দুটি সভ্যতার নাম, মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতা।

মিশর ও সুমের দেশের সভ্যতার সমসাময়িক আরও একটি অতি প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষাৎ পাই আমরা ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায় পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে। এখানকার সভ্যতার আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা সুমেরীয় সভ্যতারই অনুরূপ। পঞ্চনদের জলসিঞ্চিত দেশটি মিশর ও সুমেরের উপত্যকা-ভূমির চেয়েও বিশাল ও উর্বর। উপত্যকাভূমি তিনটির, বিশেষত সুমের ও সিন্ধুনদের সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে এদের সভ্যতা ছিল নাগরিক সভ্যতা। নদীতীরবর্তী স্থানগুলিতে নগর নির্মাণ করা হয়েছিল এবং সেইসব নগরের ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে খুবই উন্নত ধরনের সভ্যতার পরিচয় পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। এই সভ্যতাগুলির ক্ষেত্র, পশ্চিমে সাহারা ও ভূমধ্যসাগর, পূর্বে হিমালয় পর্বত ও রাজপুতানার থার মরুভূমি এবং উত্তরে ইউরেশীয় পর্বতমালা, বল্‌কান্‌, ককেসাস্‌ ও হিন্দুকুশ। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডই বিশ্ব-সভ্যতার জন্মভূমি। এখানেই রচিত হয়েছিল সেই মনোরম উদ্যান যার বক্ষে সভ্যতার রঙিন কুসুমকলি প্রথম চোখ মেলেছিল। এই জায়গাটির ভূগোল ও আবহাওয়া নব-প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর করে তুলেছিল। কৃষি ও শিল্পের নানান নূতন সরঞ্জাম আবিষ্কার করা হয়েছিল এখানে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, রূপসৌন্দর্যের অনুপম সৃষ্টি, রাষ্ট্র, ধর্ম, নীতি, সমাজ-সংস্থা সবই যেন একটি বিচিত্র শোভাযাত্রায়

কালের পথে এগিয়ে চলেছিল। নূতন সভ্যতাগুলির পরস্পর যোগাযোগে ফলে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল। মেঘশূন্য আকাশে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারার ধারাবাহিক নিত্যনৈমিত্তিক গতিবিধি, আবির্ভাব ও অন্তর্ধান লক্ষ্য করবার সুযোগ এখানে যেমন ঘটেছে তেমন আর কোথাও হয় নি। অনেক ঊষর কঠিন অনুর্বর স্থান পড়ে আছে এই বিশাল সীমারেখার মধ্যে, কিন্তু সেসব জায়গাতেও নানান রকমের জংলা ফল, দ্রাক্ষা, জলপাই ও খেজুর জন্মে। অবশ্য সভ্যতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল নদীর উপত্যকাভূমিতেই, কিন্তু তা বর্ষার ঘাসের মত আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠে নি। সভ্যতার সংবৃদ্ধির জন্য এখানেও মানুষের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। খাল কাটতে হয়েছে জমিতে জল-সেচন করবার জন্য, খালগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য বাঁধ নির্মাণ করেছে সে, স্থলপথে সংযোগ-রক্ষার জন্য রাস্তা আর জলপথে যাতায়াতের জন্য নৌকা নির্মাণ করেছে।

এই তিনটি দেশে সভ্যতার জন্ম হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে, নানান রকম প্রমাণ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সিদ্ধান্তই করেছেন। তখন তাম্রযুগ শুরু হয়ে গেছে। মানুষ ধাতুর আবিষ্কার করে ধাতুনির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করতে শিখেছে। তারপর সে উদ্ভাবন করল তাম্র ও টিন মিশিয়ে ব্রঞ্জের প্রস্তুতপ্রণালী, এবং সেই মিশ্র-ধাতু দিয়ে নানা প্রকার আবশ্যকীয় গৃহস্থালি ও কৃষিকর্মের দ্রব্য ও হাতিয়ার তৈরি শুরু হল। ধাতুযুগের পূর্বে আরও দুটো যুগ কেটে গেছে, পুরনো প্রস্তরযুগ আর নূতন প্রস্তরযুগ (Palaeolithic and Neolithic Age)। বিশ হাজার বছরেরও আগের কথা, তখন ছিল পুরনো প্রস্তরযুগ। নূতন প্রস্তরযুগের আবির্ভাব হয়েছে তার অনেক পরে, সম্ভবত মাত্র আট হাজার বছর পূর্বে। এই নব-প্রস্তরযুগ থেকে ধাতুযুগে পদার্পণকে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলতে হবে, কেননা এখানেই হল মানব-সভ্যতার ভিত্তি পত্তন।* বিপ্লবের ফলে সমাজের রীতি-নীতি, ধারা পদ্ধতি, এমন কি সংস্থা পর্যন্ত বদলে গিয়েছিল, এবং তখনই মানুষ গ্রাম্য

* এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ইতিহাসতত্ত্ববিদ্ গর্ডন চাইল্ড্ বলেন, "The thousand year or so immediately preceeding 3000 B. C. were perhaps more fertile in fruitful inventions and discoveries than any period in human history prior to

জীবন ছেড়ে নগর নির্মাণ করল, নাগরিক সভ্যতা সৃষ্টি করল, বিশেষত ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস ও সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে। নব-প্রস্তরযুগের মানুষরা ছিল গ্রামবাসী—তাদের কৃষি, শিল্প, কারিগরি, এসব কাজ করা হত ব্যক্তির নিজের ও গ্রামের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। গ্রামের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষিজাত বা শিল্পজাত কোন দ্রব্যই উৎপন্ন করা হত না যা অন্য দেশে রপ্তানি করা চলে। তেমনি অন্য জায়গা থেকে কোন দ্রব্য আমদানি করাও হত না। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় 'স্বয়ংপূর্ণ অর্থনীতি' (self-sufficient economy)। নব-প্রস্তরযুগের সমাজের কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল এই অর্থনীতিকেই অবলম্বন করে। তাম্রের আবিষ্কার, ধাতুদ্রবণ (metallurgy), জন্তুকে চালন-শক্তি রূপে ব্যবহার, চক্রযুক্ত যান, কুম্ভকারের চক্র, ইষ্টক নির্মাণ প্রভৃতি কার্য, যা এখন আমাদের সমাজজীবনে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, সেই-সকল অনুষ্ঠানই তখন নব-প্রস্তরযুগের স্বয়ংপূর্ণ অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। তখন কেবল গ্রামের প্রয়োজনমত জিনিস উৎপাদন করে ক্ষান্ত হওয়া চলল না। তাম্র সহজলভ্য জিনিস নয়। দূর দেশের পাহাড়ে যেখানে তাম্র স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়, অথবা যে স্থানে উজ্জ্বল বর্ণের পাথর রয়েছে যা থেকে তাম্র গালিয়ে বের করা যায়, সেইসকল স্থানে মানুষকে যেতে হয় ধাতু সংগ্রহের জন্য। ধাতু বহন করে আনবার ব্যবস্থা করা চাই আর ধাতুদ্রবণের জন্য চাই কারিগর। যেসব ব্যক্তি এরকম কাজে নিযুক্ত থাকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও আহার্যাদি যোগাবার জন্য গ্রামবাসীদের উৎপন্ন করতে হয় নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস ও ফসল। নব-প্রস্তরযুগে কোনরূপ কর্মবিভাগ যে একেবারে ছিল না তা নয়। কুমার ছিল, মাটির ঘট হাত দিয়ে বানাত, তন্তুবায় ছিল, বস্ত্র বয়ন করত। এইসব জিনিসের বিনিময়ে চাষীরা দিত তাদের উদ্বৃত্ত ফসল। তাদের প্রয়োজন যেমন সামান্য উৎপন্নদ্রব্যও ছিল সামান্য। কিন্তু সত্যকার বিপর্যয় সৃষ্টি করল ধাতুযুগ, যখন অধিকতর ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল সমাজকে নানা শ্রেণীর কারিগরদের ভরণপোষণের জন্য।

---

the sixteenth century A. D. Its achievements made possible that economic reorganization of society that I term the urban revolution." (*What Happened in History*—p. 69)

ইতিহাসে এমনি সব নূতন ব্যাপার পুনঃপুনঃ দেখা দিয়েছে যার ফলে মানুষের অভ্যাস, প্রকৃতি, চিন্তা ও ভাবধারা, অর্থাৎ গোটা সভ্যতা ও সংস্কৃতিই বদলে গেছে। শিল্পক্ষেত্রে একদিন বিপ্লব (Industrial Revolution) ঘটিয়েছিল বাষ্প-শক্তির উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা। বিদ্যুৎ-শক্তি, তৈল-দাহ-শক্তি, আণবিক শক্তির প্রভাবে সমাজজীবনে যে কত বড় পরিবর্তন ঘটছে—যা যুগপৎ চমকপ্রদ ও ভয়াবহ—তা তো আমরা চোখের ওপরই দেখতে পাচ্ছি। পাথরের পরিবর্তে তাম্রধাতুর উপকরণ ব্যবহার ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে এমনি কোন বিপ্লবের বন্যা ছুটিয়ে দিয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাম্রযুগের প্রাক্কালে মিশর দেশে নির্মিত পিরামিডগুলির মধ্যে আজও বিদ্যমান। পাথরের প্রায় সব গুণই তামার আছে, কিন্তু তাম্রের এমন কয়েকটি গুণ আছে যা পাথরের নেই। তাম্রকে গালিয়ে ছাঁচে ঢেলে ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যায়। আবার গালানো তাম্রখণ্ড ঠাণ্ডা হলে পাথরের মতই শক্ত হয়, তখন তাকে শান দিয়ে ধারালো করলে প্রস্তরাস্ত্রের চেয়েও তীক্ষ্ণ প্রহরণে পরিণত হয়। নব-প্রস্তরযুগে অস্থি ও কাষ্ঠ নির্মিত অস্ত্রও ছিল, কিন্তু সেগুলি ধাতুনির্মিত অস্ত্রের চেয়ে সর্ব প্রকারেই নিকৃষ্ট। প্রস্তর, অস্থি বা কাষ্ঠ নির্মিত অস্ত্র ভেঙে গেলে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তখন তা ফেলে না দিয়ে উপায় নেই। ধাতুনির্মিত অস্ত্র ভেঙে গেলে তা গালিয়ে আবার নূতন করে তৈরি করা যায়। ধাতুদ্রবণের দ্বারা তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রঞ্জ তৈরি করার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করতে বেশি দেরি হয় নি। ধাতুদ্রবণের জন্য দরকার একটি চুল্লীর, যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপাদন করতে পারা যায়। অল্পকালের মধ্যে সোনা, রুপো, সিসা আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রস্তরযুগের মানুষ অলংকার তৈরি করত রংবেরঙের পাথর, অস্থি বা হাতীর দাঁত খোদাই করে। এখন সোনা রুপো গালিয়ে নানান রকম অলংকার, পাত্র, শখের জিনিস তৈরি করা সম্ভব হল। লৌহ তখনো আবিষ্কৃত হয় নি বটে, কিন্তু জ্যোতির্মণ্ডল থেকে যে উল্কা ভূতলে এসে পড়ে, সেই উল্কার লৌহকে (meteoric iron) মিশরীয় ও সুমেরীয় কারিগরগণ কদাচিৎ কখনো কাজে ব্যবহার করত।

এই ধাতুদ্রবণ বিদ্যাকে (metallurgical knowledge) আমরা মনে করতে পারি মানুষের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বলে। সে যুগের

লোকের ধারণা ছিল কিন্তু ভিন্ন রকমের। ধাতুর রূপান্তরকে তারা একটা ইন্দ্রজাল বলেই মনে করেছে। ইন্দ্রজাল বিদ্যার অধিকারী সকলে নয়, শুধু এক শ্রেণীর কারিগর যেমন কর্মকার, খনির শ্রমিক। এটি ছিল গুপ্ত বিদ্যা, কতগুলি রহস্যাত্মক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের (magic rituals) সঙ্গে এই বিদ্যাটি ছিল জড়িত। আসিরিয়ার কয়েকটি শিলালিপিতে এই অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ কিছু পাওয়া যায়। অত্যন্ত বীভৎস রকমের অনুষ্ঠান—কার্যারম্ভের পূর্বেই ভ্রূণ ও কুমারীর রক্ত দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। বর্তমান কালের অনেক আদিম জাতির কারিগরেরা নানা প্রকার ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার পর কার্য আরম্ভ করে। আমাদের কারিগরেরা করে বিশ্বকর্মা পূজা।

ধাতুনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তরাস্ত্রগুলি অন্তর্ধান করে নি। ধাতু মহার্ঘ, সর্বসাধারণের পক্ষে ধাতুর ব্যবহার সম্ভবপর ছিল না। তাই ব্রঞ্জনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র অর্জুনের গাণ্ডীব, পাশুপত অস্ত্রের মত শাসকবর্গেরই হাতে গিয়ে পড়ত, যা দিয়ে তারা জনসাধারণকে রাখত দাবিয়ে আর প্রতিবেশী রাজ্য করত আক্রমণ। তা ছাড়া, ধাতুবিদ্যা শুধু স্থিতিবান সভ্য সমাজের মধ্যেই আটক রইল না। ভ্রাম্যমাণ যাযাবর জাতিরা দূর দেশান্তরে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়, তারা ধাতুদ্রব্য অধিক পরিমাণে সহজেই সংগ্রহ করতে পারত। ফলে. ভ্রাম্যমাণ বর্বর জাতিরা স্থিতিবান সভ্যতাকে আক্রমণ করে বারবার বিধ্বস্ত করেছে। যুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে সভ্য জাতি যে বর্বরের নিকট পরাভূত হয়েছে, তার কারণ বর্বরেরা ধাতুনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার করত নূতন-নূতন রকমের আর প্রভূত পরিমাণে।

ধাতুবিদ্যার সঙ্গে আরও কয়েকটি কারিগরি কার্যে সেকালের মানুষের শিক্ষালাভ ঘটেছিল। কোন নদী-উপত্যকারই ধারে-কাছে পাথর বা খনিজ বস্তু ছিল না। ধাতুদ্রব্য ও শিল্পের জন্য যেসব কাঁচা মাল দরকার, দূর দেশ থেকে সেসব বয়ে আনতে হলে যানবাহনের ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। জন্তু পোষা শুরু হয়েছিল বহুকাল পূর্বে। গরু দিয়ে হাল চাষও করা হত। গর্দভকে ব্যবহার করা হত মালপত্রের বাহনরূপে। ছোট দাঁড়ের নৌকো যে ছিল না তা নয়। কিন্তু এসব যানবাহন দিয়ে দূরস্থ পার্বত্যভূমি বা দেশ-দেশান্তর থেকে মাল আমদানি করা চলে না, আর মাল আমদানির জন্য রপ্তানিও

অনেক বস্তু করতে হয়। তাই মাল পরিবহনের জন্য সে যুগের কোন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ব্যক্তির মনীষাই হয়তো বা মনন-শক্তির দ্বারা উদ্ভাবন করেছিল চক্রযুক্ত (wheeled) শকট আর পালযুক্ত (sailing) তরী। ইতিপূর্বে যেমন লাঙল টানবার জন্য গরুকে জোড়া হয়েছিল জোয়ালের সঙ্গে, তেমনি করে শকটের সঙ্গে জোড়া হল গর্দভকে। শকটের চাকা যে এখনকার দিনের গরুগাড়ির চাকার মত ছিল না, তা বলাই বাহুল্য। চাকা ছিল তখন বৃত্তাকৃতি নিরেট একখণ্ড কাঠ, গাড়ির উপরিভাগের সঙ্গে চামড়া দিয়ে বাঁধা। এরকম নিরেট চাকা এখনও সার্ডেনিয়া, তুর্কীস্থান ও সিন্ধু প্রদেশে দেখা যায়। পাল-তোলা তরী তখন নানান দেশে অভিযান শুরু করেছিল, ভূমধ্যসাগর পারস্য উপসাগর ও আরব সমুদ্রের বক্ষের ওপর দিয়ে। খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পূর্বেই জলযানের চালনা-শক্তিরূপে বায়ুকে ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের পলিনেশিয়ানগণ এক শ' ফুট লম্বা বৃহৎ নৌকা নির্মাণ করত, সেগুলিতে পাল লাগিয়ে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে ঘুরে বেড়াত। মিশরের প্রাচীন মৃন্ময়ভাণ্ডের ওপর অঙ্কিত চিত্র থেকে সে যুগের নৌকার আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রীটবাসী ও ফিনিসিয়ানরা নৌকায় ভূমধ্য-সাগরের বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করত। জলপথে যাবার সময় দস্যুতার সুযোগ পেলেই পরস্বাপহরণ দ্বারা বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সম্পদ বাড়িয়ে তুলতে তারা কিছুমাত্র ইতস্তত করত না।

গাড়ির চাকার সৃষ্টি যখন হয় নি তখন একরকম 'স্লেজ'-এর চলন ছিল। স্লেজ এখনো দেখা যায় বরফের দেশে। স্লেজকে টানত ঘোড়া নয়, গর্দভ বা বলীবর্দ। ঘোড়া তখনো গৃহপালিত হয় নি। মধ্য এশিয়ার মরুপ্রান্তরের যাযাবর জাতিরাই সম্ভবত সর্বপ্রথম অশ্বকে গৃহপালিত করেছিল। চক্রযুক্ত শকট ভারত ও সুমের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুমেরের একটি 'মোজাইক পতাকায়' (Mosaic standard of Ur) দেখা যায়, রণসজ্জায় সজ্জিত এক সারি রথ শ্রেণীবদ্ধভাবে চলেছে—প্রত্যেকটির আরোহী দুজন, সারথি আর রথী এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে জোড়া রয়েছে এক জোড়া গর্দভ। খৃঃ পূঃ ১৫০০ বছরের পূর্বে মিশরে কোন শকটের ব্যবহার দেখা যায় না।

চক্রের ব্যবহার আর একটি ক্ষেত্রে শুরু হয়েছিল। ধাতুযুগের পূর্ব

থেকেই মাটির ভাণ্ড তৈরি করছিল কুম্ভকার, সেগুলির ওপর চিত্রও করা হত। কুম্ভকারের চক্রের (potter's wheel) সৃষ্টির সঙ্গে মৃন্ময়ভাণ্ড প্রস্তুতের প্রণালী বদলে গেল। যেসব মাটির হাঁড়িকুড়ি কুম্ভকার শুধু হস্তের ব্যবহারে তৈরি করত, কুমারের চাকা এখন সেই বস্তুগুলির আকার ও ছাঁদ সুদর্শন করে তুলল। মৃৎভাণ্ডের বিশেষত্ব এই যে, জিনিসটা সব জায়গাতেই আছে, এবং দেশের সভ্যতার উত্থানপতনের সঙ্গে ভাণ্ডগুলির গঠনের বা ছাঁদেরও উন্নতি-অবনতি ঘটে। এইরূপ কতগুলি লক্ষণ দেখে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পুরনো মৃৎভাণ্ডসমূহের কাল নির্ণয় করতে অনেক ক্ষেত্রে সক্ষম হয়েছেন।

মাটি দিয়ে ইষ্টক তৈরি করাও শুরু হয়েছিল। দু রকমের ইঁট তৈরি হত —রৌদ্রে শুকানো ইঁট, আর পাঁজায় পোড়া ইঁট। নব-প্রস্তরযুগে ছিল মাটির ঘর। ধাতুযুগে ইষ্টক প্রস্তুতের সঙ্গে পাকা ইমারত তৈরি হতে লাগল—বিশাল প্রাসাদ, হর্ম্য, সুদীর্ঘ প্রাকার। এইরূপে হল স্থাপত্য (architecture) বিদ্যার প্রতিষ্ঠা। এক শ্রেণীর দক্ষ কারিগর দেখা দিল রাজমিস্ত্রীর কাজ করবার জন্য। প্রাক্-আর্য ভারতে আর সুমের দেশে প্রায় সকল প্রকার নির্মাণের কাজে ইঁট ব্যবহার হত। মিশরে নির্মাণ করা হয়েছিল পাথরে গড়া পিরামিড।

বিভিন্ন শ্রেণীর এইসব কারিগরদের নিজ নিজ কাজ বেশ ভালমতই শিখতে হয়েছিল। স্বয়ংপূর্ণ ক্ষুদ্র সমাজের ব্যক্তিরা ছোটখাট নানান রকম কাজ করে থাকে, কোন একটি কাজে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে না। সেই স্বয়ং-পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ ভেঙে যাবার ফলে যেসব বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ কারিগরের আবির্ভাব হয়েছিল, তারা সব বিভিন্ন কর্ম-সম্প্রদায় (guild) গড়ে তুলেছিল এবং সকলেই তারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে পড়ল। কৃষিকর্ম শুরু হবার পর থেকেই জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নূতন অবস্থায় বিভিন্ন কারিগর শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে গ্রামগুলি ক্রমেই নগরে পরিণত হতে লাগল। নগরটি যেমন কারিগরে ভরে উঠল, সেই সঙ্গেই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মহাজনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যারা বিদেশ থেকে কাঁচা মাল আমদানি করবে, কারিগরদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে। তাই রপ্তানির জন্য কারিগরকে স্থানীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিল্পদ্রব্য তৈরি করতে হত। ব্যবসায়ীর কাজে দরকার হয় হিসাবনিকাশ। চুক্তি করতে হয়

তাদের, চুক্তিমত জিনিস সরবরাহ কেনা-বেচা ইত্যাদি করতে হয়। এসব অতি প্রয়োজনীয় কাজ কিরূপে সম্পন্ন হবে যদি কেবল মুখের কথা ও স্মৃতির ওপরই নির্ভর করতে হয়? তাই এক রকম সংকেত-চিহ্নের উদ্ভাবন করতে হয়েছিল প্রায় সর্বত্রই যেখানে আদি-যুগের সভ্যতা দেখা দিয়েছিল। পেরুতে নানা বর্ণের কাপড়ে সাংকেতিক গেরো বেঁধে শুধু মহাজনী হিসাবনিকাশ নয়, দূরস্থ লোকজনের মধ্যে পত্রবিনিময় পর্যন্ত চলত। মিশরে দেখা দিয়েছিল চিত্র-লিপি (hieroglyphics)। চিত্র-লিপির ছবিগুলির সঙ্গে শব্দ ও অর্থের সাংকেতিক সংযোগ আছে, ছেলেদের বর্ণশিক্ষা বইগুলিতে অজগরের ছবি দেখিয়ে শিশুকে শেখানো হয়, 'অজগর আসছে তেড়ে'— অর্থাৎ শুধু সাপটি নয়, সাপ যে তেড়ে আসছে তাও। তেমনি শব্দ-অর্থের সঙ্গে চিত্রগুলির যোগাযোগ সম্পর্কে যার বিশেষ শিক্ষালাভ ঘটেছে, সে-ই চিত্র দেখে অর্থ করতে পারে। মিশরীদের চিত্র-লিপি লিখন হত প্যাপিরাস্ নামক এক প্রকার কাগজের ওপর। জলজ উদ্ভিদকে থেঁতো করে কাগজের মত বিস্তার করে শুকানো হত—তাকে বলা হয় papyrus roll। সেরকম উদ্ভিদ সুমের দেশে নেই। নদীর সিকতাভূমির ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী নেমে আসে, সেখানকার পলিমাটিতে পক্ষীকুলের অগণিত পদচিহ্ন ছাপা হয়ে থাকে। পদচিহ্ন সমেত পলিমাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেই বোধ করি সুমেরীয়গণ মৃৎ-চাকতির (clay tablets) ওপর এক প্রকার লিখনপ্রণালীর উদ্ভাবন করেছিল। পলিমাটিকে পাতলা ইটের থানের মত করে সেই ট্যাবলেটের ওপর চোখা কাঠি দিয়ে চিত্র-লিপির অনুকরণে যে লিখনটি লেখা হত, দেখতে তা চিত্রের মত নয়, কেননা মাটির ওপর ছবি আঁকা কঠিন। এই লেখা চিত্রের অনুকরণে কতগুলি হিজিবিজি রেখা মাত্র—যাকে বলা হয়েছে cuneiform বা কীলকাক্ষর, 'কাকের ঠ্যাঙ বকের ঠ্যাঙে'র মত বাঁকা (wedge-shaped) লেখাগুলি। এই লিখন-প্রণালী থেকেই কালক্রমে বর্ণমালার (alphabet) উদ্ভব হয়েছিল।

ভাষার উৎপত্তি এককালে মানুষকে জীবজগতের উর্ধ্বে তুলে দিয়েছিল। সভ্যতার ক্ষেত্রে ঠিক সেইমতই বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল লিখনপ্রণালীর উদ্ভাবন ও প্রবর্তন। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ছেড়ে দিলেও, রাজ-শাসন, রাজ-আদেশ, আইন-কানুন, ভূমির ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে রাখার

ফলে নূতন সমাজে ব্যক্তির জীবন সুসম্বদ্ধ ও স্থিতিশীল হয়ে উঠল। সমাজ-জীবনেও তেমনি জাতির স্মৃতিকে চিরন্তন রূপ দিয়ে পূর্বাপর ধারা বজায় রাখা সম্ভবপর হল। এক শ্রেণীর লোক হল লেখক (clerks), লেখা যাদের উপজীবিকা। তাদের ভরণপোষণের ভারও পড়ল সমাজের ওপর। সর্বত্রই লেখক সম্প্রদায়ের কদর ছিল—মিশরে ও চীনে তারা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

নগরের প্রতিষ্ঠা, জন-সংখ্যা বৃদ্ধি, কারিগর, ব্যবসায়ী, লেখক প্রভৃতি নানান শ্রেণীর অভ্যুত্থান নিশ্চয় একটা বড় রকমের খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করেছিল। সকলের আহারের জন্য শস্য উৎপন্ন করতে হয় কৃষককে। ফসল বাড়াতে হলে প্রয়োজন অতিরিক্ত জমির আর অধিক সংখ্যক কৃষকের। যখন খাদ্যের অভাব ঘটে তখন কৃষিসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য পরধন লুণ্ঠন এবং পরের বিষয়সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তিও জাগে। সেই প্রবৃত্তি থেকেই যুদ্ধ দেখা দিল, দলের সঙ্গে দলের, জাতির সঙ্গে জাতির। প্রাক্-সভ্যতা যুগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজ দার্শনিক হব্স্-এর (Hobbs) একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল। তাঁর মতে, তখন ছিল নাকি নিরন্তর সংগ্রামের অবস্থা—"সকলের সংগ্রাম সকলের বিরুদ্ধে" ('War of all against all')। আর মানুষও ছিল নাকি "নিরলম্ব, নিঃস্ব, নোংরা, পশুস্বভাব ও ক্ষুদ্র" ('solitary, poor, nasty, brutish and short')। ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাছাই-বাছাই শক্ত কথা ব্যবহার করেছেন হব্স্, যা আদৌ সত্য নয়। আদিম সমাজে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় না, কেননা সে সমাজ স্বয়ংপূর্ণ। প্রসিদ্ধ জীবন-তত্ত্ববিদ জুলিয়ান হাক্স্‌লে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "War is not an inevitable phenomenon of human life...There is no evidence of prehistoric man's having made war, for all his flint implements seem to have been designed for hunting, for digging or for scraping hides...Organised warfare is most unlikely to have begun before the stage of settled civilization. In man, as in ants, war in any serious sense is bound up with the existence of accumulations of property to fight

about." উক্তিটির মর্মার্থ এই যে, প্রাগৈতিহাসিক মানব যে যুদ্ধ করত তার কোন প্রমাণই নেই—আসলে যুদ্ধ দেখা দিয়েছে মানুষের সভ্যতার যুগে যখন বিত্ত সঞ্চিত হয়েছিল, যা আত্মসাৎ করতে হলে লড়াই করতে হয়। এ কথার অর্থ এ নয় যে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর ঝগড়া-বিবাদ বা হাঙ্গামা বাধত না। কিন্তু সেসব হাঙ্গামাকে ঠিক যুদ্ধ বলা যায় না, সেগুলি শুধু শত্রুতা সাধন বা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার উপায় মাত্র। খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ থেকে যে সিন্ধু-সভ্যতা চলে আসছিল তার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের চিহ্নমাত্র নেই। চীন ইতিহাসের আদিম যুগে যুদ্ধ একরকম অজ্ঞাতই ছিল। পেরুর ইংকা-রাও কখনো যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি।

যুদ্ধ, হল-কর্ষণ প্রভৃতি কঠিন কাজগুলি পুরুষ মানুষরাই চিরদিন করে এসেছে। স্ত্রীলোকেরা করত রন্ধন, গৃহস্থালি আর ফসল কাটার কাজ। প্রাক্-ঐতিহাসিক সমাজে মাতৃস্বত্ব (mother-right) প্রচলিত ছিল বলেই মনে হয়। মাতৃস্বত্বের অস্তিত্বের ইঙ্গিত বাইবেল গ্রন্থে দেখা যায়। আব্রাহামের এই উক্তিটি পাওয়া যায় সেখানে—"সত্য বটে, স্যারা আমার বোন। সে আমার পিতার কন্যা, মাতার কন্যা নয়; এবং সে হয়েছে আমার পত্নী।" কথাটা মাতৃ-কর্ত্রী পরিবারের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়; আব্রাহাম ও স্যারা যেন বিভিন্ন গোত্রের মানুষ (clan), তাই তাদের বিবাহ সম্ভব হয়েছে। মাতৃকর্ত্রী সমাজে বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার জন্মে মাতৃকুল থেকে। মাতার উত্তরাধিকারী হয় পুত্র নয়, মাতার ভগিনী বা ভাগিনেয়রা। এই প্রথা কোন-কোন আদিম জাতির মধ্যে এখনও বর্তমান। Couvade নামক একটি অদ্ভুত প্রথা দেখা যায় ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার কোন-কোন স্থানে। শিশুর জন্মের পর মাতার শয্যা অধিকার করে পিতা। সে উপবাস করে, এমন কি তাকে প্রসববেদনার নকল করে ছটফট ও চীৎকারও করতে হয়। মাতৃস্বত্ব সমাজ যেদিন পিতৃস্বত্ব সমাজে পরিণত হয়ে গেল, সেই দিনকেই ভালরূপে চিহ্নিত করে দেয় এই প্রথাটি। সন্তানের জন্ম মাতৃগর্ভে হলেও, এখন সে শুধু মাতার সন্তান নয়, পিতারও সন্তান। ধাতু-যুগের নবগঠিত সমাজে পিতৃস্বত্ব প্রবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। যোদ্ধা, কারিগর, শিল্পী সকলেই পুরুষ মানুষ। প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের উদ্যোগ-আয়োজন ব্যাপকভাবেই করতে হয় পুরুষদের। এরূপ অবস্থায়

পরিবারের ও সমাজের কর্তা যে পুরুষরাই হবে এবং বিষয়সম্পত্তির স্বত্ব যে পিতার ওপর বর্তাবে, তাতে আশ্চর্য কি ?

সমাজ-সৃষ্টির গোড়া থেকেই এক প্রকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল মূলত যাকে কম্যুনিজম বলা যেতে পারে। শিকারে নিহত জন্তু ছিল গোষ্ঠী-সমাজের ভোজ্য, মাংসের ভাগ সমাজের প্রত্যেকেই পেত। পশুপালন যখন আরম্ভ হল তখন পশু ও চারণভূমির মালিক হল সমাজ, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। শিকারী মানব ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিল পশুপালক, পশুর পিছন তাড়া করে, তাকে ধরে আটক করে রেখে। হয়তো বা তখনি তার মনে বিত্তবোধ (sense of property) জেগেছিল। জমি চাষ আরম্ভ হবার সময় থেকেই যে সমাজে ব্যক্তিস্বত্বের সূচনা দেখা দিয়েছিল তার ভুল নেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থের সংঘাত শুরু হল তখন থেকেই। চাষের জমি প্রত্যেক পরিবারকে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে, আর প্রত্যেক পরিবার জমি ও ফসল ঘটিত নূতন-নূতন দাবি উত্থাপন করেছে সমাজের কাছে। জমির ওপর ব্যক্তির স্বত্বকে সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল আর সেই ব্যক্তিস্বত্ব থেকেই মানুষের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দানা বাধল। গ্রীক কবি হোমার তাঁর 'ইলিয়াড' মহাকাব্যে গ্রীক ও ট্রোজানদের মধ্যে সংগ্রামকে গ্রাম্য বিবাদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

> As when two neighbours in a common field,
> Each line in hand within a narrow space,
> About the limits of their land contend—

মালিকদ্বয়ের মধ্যে পাশাপাশি দুটি জমির সীমানা নিয়ে বিরোধের এই দৃশ্য আজও আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাই। আদিযুগের সমাজে জমিবণ্টন ব্যবস্থার পরিণতি যে অনেকটা ঠিক এইরকমই ঘটেছিল তার আর একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় গ্রীক মাইথলজিতে। ক্রোনোসের (Kronos) তিন পুত্র—জেউস (Zeus), পোসেইডন (Poseidon), হেডস (Hades)। এঁরা তিনজনই হলেন দেবতা। গোটা ব্রহ্মাণ্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করে এক এক ভাগ এক এক দেবপুত্রকে বিলি করা হল লটারি করে। এরূপ ভাগ-বাঁটোয়ারা নিশ্চয়ই মনুষ্যসমাজে প্রচলিত ছিল। চারণভূমি ছিল

সর্বসাধারণের, কিন্তু গৃহপালিত জীবজন্তুগুলি ক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে উঠেছিল।

ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদিতেও পরিবর্তন ঘটতে লাগল। আদিকালের শিকারী মানব মনে করত, তার বংশের উদ্ভব হয়েছে 'টোটেম' থেকে। 'টোটেম' হল কোন পশু বা পক্ষী, যা গোষ্ঠীর অধিপতি, সুতরাং পবিত্র। কৃষিকার্য আরম্ভ হবার পর শিকারের প্রয়োজনীয়তা যেমন হ্রাস পেল, টোটেমেরও আর তেমন আবশ্যক রইল না। টোটেম-জন্তুটিকে পবিত্র মনে করা হত বটে, কিন্তু বংশের উদ্ভব হয়েছে টোটেম থেকে এই বিশ্বাস গেল লুপ্ত হয়ে। সমাজে এক শ্রেণীর মুরুব্বি দেখা দিয়েছিল, যাদের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী মনে করা হত। সমাজের নেতা, আবার বৈদ্যও (medicine men) ছিলেন তাঁরা। লোকের ছিল এই বিশ্বাস যে, মন্ত্রোচ্চারণ ও অনুষ্ঠানাদি দ্বারা বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারেন এঁরা, ভূমির উর্বরতাও বৃদ্ধি করতে পারেন। ঐন্দ্রজালিক শক্তি তাঁদের হ্রাস পায় যখন হন তাঁরা বৃদ্ধ এবং সেই সঙ্গে ভূমির উর্বরতাও নষ্ট হয়। তখন তাঁদের আত্মবলি দিতে হয় এই বিশ্বাস করে যে, তাঁদের রক্তে ভূমি সিঞ্চিত হলে মাটি আবার উর্বর হয়ে উঠবে। সামাজিক প্রয়োজনে এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গকেই বলিদান (sacrifice) প্রথার মুখবন্ধ বলা যেতে পারে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে কর্মদক্ষ নূতন নেতার প্রয়োজন হয়েছিল, যে নেতা হবেন সমাজপতি, শুধু একজন বৈদ্য বা যাদুকর মাত্র নয়। সেই কর্মঠ দক্ষ সমাজপতিকেই করতে হবে নূতন অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। সমাজের মর্যাদা রক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য যুদ্ধবিগ্রহে নেতার পদটিও অধিকার করতে হবে তাঁকেই। এরূপ অবস্থায় একজন প্রতিপত্তিশালী, পরাক্রান্ত নেতার আত্মবলিদান গোষ্ঠীর শক্তিকে দুর্বল করে দিতে বাধ্য। তা ছাড়া, সমাজপতি যদি স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিতে অসম্মত হন তবে কার সাধ্য তাঁকে জোর করে বলিদান দেবে? সমাজপতি ও নৃপতির মধ্যে ব্যবধান এক ধাপ মাত্র, উভয়ই সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রান্ত। সভ্য জগতে নৃপতির প্রতিষ্ঠা (monarchy) কেমন করে হয়েছিল এখানেই আমরা তার সূত্রের সন্ধান পাই। সমাজপতির আত্মবলিদান যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন বলিদানের

একটা বিকল্প ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। নররক্ত না হলে ঊষর ভূমি আবার উর্বর হয়ে উঠবে কেমন করে? কোন-কোন জাতির মধ্যে তখন যুদ্ধে বন্দীদের দেবতার কাছে বলি দেওয়া হত। এই বীভৎস নরমেধযজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল প্রগতির অভিযাত্রী মানব যখন সভ্যতার পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। প্রকৃত অসভ্য বর্বর জাতির মধ্যে এরকম প্রথা বড় দেখা যায় না। সেমেটিক জাতি ও আজটেকদের ধর্মনিষ্ঠ, উন্নত ধরনের সভ্যতাকে আশ্রয় করে এককালে এই প্রথা বেশ জাঁকালোভাবেই পৃথিবীর বুকে চড়ে বসেছিল।

তিনটি অতি প্রাচীন সভ্যতার অর্থাৎ মিশর, ইরাক ও সিন্ধু সভ্যতার ধাত্রীভূমি যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, তার চতুঃসীমার বাইরে যেন ভ্রূকুটি করেই অবস্থান করছিল বিশাল মরুপ্রান্তরের রুক্ষ যাযাবর জীবন। যেখানে জলের নিয়ত সরবরাহ নেই সেখানকার মানুষ কোন একটি স্থানে স্থিতিশীল হতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যখন জল শুকিয়ে যায় তখন সে স্থান ছেড়ে তাদের শীতের দেশের নিকটবর্তী জায়গায় যেতে হয় যেখানে আছে বরফ-গলা জলের প্রচুর সরবরাহ। মরু অঞ্চলে তৃণ যখন তাপদগ্ধ হয়, সেইসব জলসিক্ত স্থানের ভূখণ্ডগুলি তখন দূর্বা-শ্যামল হয়ে ওঠে। এমনিভাবে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন যে দেশটি পশুচারণের পক্ষে উপযোগী, এবং জল সরবরাহ যেখানে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ, মরুভূমির যাযাবর জাতিরাও তখন ডেরাডাণ্ডা তুলে পালিত পশু সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। যাযাবর জাতিদের আবাসভূমি ছিল উত্তরে ইউরেশিয়ার দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর (steppes), পূর্বে মধ্য ইরানের ঊষর ভূমি, দক্ষিণে আরবের মরুভূমি, পশ্চিমে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের রুক্ষ কঠিন অনুর্বর ভূখণ্ড। এ ছাড়া ছিল ইউরোপের বন-জঙ্গল যেখানে কতগুলি নর্ডিক জাতির মানুষ শিকারী বা পশুপালকের অনুন্নত নিম্নস্তরের জীবন যাপন করত। খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের পূর্বে এই নর্ডিক জাতিগুলির উন্নত সভ্যতার সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় ঘটে নি। পূর্ব এশিয়ার মরুপ্রান্তরে হূন প্রভৃতি মোঙ্গল জাতিরা সম্ভবত তখন অশ্বপালন শিখতে শুরু করেছিল এবং চতুর্দিকে ব্যাপকভাবেই ঘোরা-ফেরা আরম্ভ করে দিয়েছিল। মাঝে রাশিয়ার জলাভূমিগুলি ও এখনকার চেয়েও অধিকতর দীর্ঘ ও প্রশস্ত ক্যাসপিয়ান

সাগর থাকার দরুন পশ্চিমে ইউরোপ পর্যন্ত গিয়ে তারা নর্ডিক জাতিগুলির নাগাল পেয়েছিল বলে মনে হয় না। কয়েক হাজার বছর পরে এইসব মোঙ্গল জাতির আক্রমণ থেকে কি ইউরোপ, কি এশিয়া কোন দেশই রক্ষা পায় নি।

ইউরেশিয়ার প্রান্তর থেকে মধ্য ইউরোপ পর্যন্ত যেসব যাযাবর জাতি অনির্দিষ্টভাবে বনে-কান্তারে ঘুরে বেড়াত তারা ছিল সব আর্যভাষা-ভাষী। জাতি হিসাবে তারা বিভিন্ন, কিন্তু তারা সকলেই ছিল ভ্রাম্যমাণ। ভ্রাম্যমাণদের এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির সংযোগ স্বাভাবিক। এই পরস্পর সংযোগের ফলেই সম্ভবত এইসব জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির গঠন অনেকটা এক রূপ ধারণ করেছিল। যে ভাষায় তারা কথা বলত সেই ভাষা থেকেই সংস্কৃত, জ়েণ্ড, গ্রীক, ল্যাটিন এবং নানাবিধ কেলটিক, টিউটনিক ও স্লাভোনিক ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। আর্যরা সকলেই ছিল প্রকৃতির উপাসক, প্রকৃতির মধ্যে শক্তির কল্পনা করে তারই উপাসনা করত। এদের কোন দেবমন্দির ছিল না, যেমন ছিল স্থিতিবান সভ্য জাতির দেশে। কোন-রকম সুগঠিত পৌরোহিত্য প্রথারও আবির্ভাব হয় নি এদের মধ্যে। তাদের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত নিচু ছিল বটে, কিন্তু এদের মধ্যে অনেক জাতি ছিল যাদের সংস্কৃতি বিলক্ষণ উন্নত ধরনের। কৃষকদের চেয়ে এরা ছিল বেশি কর্মঠ, পরিশ্রমী, আত্মনির্ভরশীল এবং সেইজন্যই এদের বন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবন অধিকতর পূর্ণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।

মোঙ্গল ও আর্যভাষা-ভাষী জাতিগুলি ছাড়া, আর এক শ্রেণীর যাযাবর জাতি ঘুরে বেড়াত আরবের সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি থেকে আরম্ভ করে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত এবং মধ্য পারস্যের কোন-কোন স্থানে। বিভিন্ন জাতির মানুষ হলেও, এরা সকলেই সেমেটিক ভাষা-ভাষী, এবং এদের সংস্কৃতিও ছিল একই ধরনের। অনেকটা আজকের বেদুইনদের মতই এদের জীবন ছিল বলে কল্পনা করা যায়। এদের সেমেটিক ভাষা থেকেই হয়েছে আসিরীয়, ব্যাবিলোনীয়, ফিনিসীয়, হিব্রু ও আরবী ভাষার উৎপত্তি। বৈদিক সংস্কৃতকে যেমন অন্যান্য আর্যভাষার মূল বলে ধরা যেতে পারে, আরবীও তেমনি সেমেটিক ভাষার আদি-রূপের নিকটতম।

আর্য ও সেমেটিক ভাষা-সমষ্টি ছাড়া আর একটি ভাষার প্রচলন ছিল

কতগুলি ককেসীয় জাতির মধ্যে। এই ভাষাকে হেমেটিক (Hametic) ভাষা বলা হয়। প্রাচীন মিশরীয়দের ছিল এই ভাষা। বাইবেলের নোয়া (Noah) কাহিনীতে দেখা যায়, নোয়ার দুই পুত্র সেম্ (Shem) ও হ্যাম (Ham), এই দুজনের নাম থেকেই সেমেটিক ও হেমেটিক ভাষা দুটির উৎপত্তি। ভাষা দুটির মধ্যে হেমেটিক ভাষার প্রচলন অপেক্ষাকৃত অল্প—উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার কতিপয় মিশ্র জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে সেমেটিক ভাষা আজও আরব জাতিদের মধ্যে প্রচলিত, এবং ইহুদিরা এই ভাষাকে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

যাযাবর জাতিরা উপত্যকাভূমির সভ্যতাকে দেখত ঘোরতর ঈর্ষার চোখে। এটা খুবই স্বাভাবিক। উপত্যকাবাসীদের স্থিতিবান, কর্মব্যস্ত, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন, ধনসম্পদ ও আহার্য বস্তুও প্রচুর। যাযাবর জাতিরা স্থিতিবান ব্যক্তিদের কৃত্রিম আচার-বিচার জাঁকজমক ঘৃণা করত, আবার নিজেদের ভ্রাম্যমাণ জীবনের অনিশ্চয়তা, খাদ্যাভাব ও দৈন্য-দুর্দশার কথা মনে করে প্রতিবেশীদের প্রচুর ধনরত্ন ও সঞ্চিত খাদ্যশস্যের ওপর লোভ না করে পারত না। তাই সুযোগসুবিধা পেলেই এই বর্বর জাতিরা স্থিতিবান সভ্যতার ওপর হানা দিত এক ঝাঁক পঙ্গপালের মত। উপত্যকাবাসীদের ধন ও খাদ্যশস্য লুঠতরাজ করে চলে যেত তারা, কখনও বা সে দেশেই থেকে গিয়ে নিজেদের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করত। তখন তাদের সংস্কৃতি যেত স্থানীয় সভ্যতার সঙ্গে মিশে, এবং তারই ফলে অপরিবর্তনীয় প্রাচীন সভ্যতা ভেঙে গিয়ে তারই ধ্বংসস্তূপের ওপর একটি নূতন উন্নততর সভ্যতার জয়স্তম্ভ সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াত। সভ্যতার এই অবস্থাটি মানবের ইতিহাসে বারবার দেখা দিয়েছে। এইরূপ অবস্থা থেকেই জন্ম হয়েছে ভারতীয় আর্য-সভ্যতা, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা, পারসীক সভ্যতা। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার ইহুদি সভ্যতা, আরব ও ইরাকে ঐসলামিক (Saracenic) সভ্যতার অভ্যুত্থানের কারণও তাই।

ধাতুর আবিষ্কার ও বর্ণ-লিখনের (alphabet-writing) উদ্ভাবন তাম্র-ব্রঞ্জ যুগে যে যুগান্তকর বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, মানবজাতির দীর্ঘ ইতিহাসে সেরকমের বিপ্লব বিজ্ঞান-যুগের পূর্বে আর কখনো দেখা যায় না। বিজ্ঞান-যুগ শুরু হয়েছে মাত্র ৩০০ বছর পূর্বে। যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তখন আরম্ভ

হয়েছিল, এখনও তার অবসান ঘটে নি। আজকের আণবিক যুগের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে সভ্য মানব যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, সেগুলির পরিণাম চিন্তা করে স্থিরবুদ্ধি ভাবুকের মনে যান্ত্রিক প্রগতি সম্বন্ধে নানান সংশয় জেগে ওঠা স্বাভাবিক। যন্ত্র-যুগের প্রারম্ভে প্রত্যেকটি আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষের মন উল্লাসে ভরে উঠত। এখন কিন্তু প্রত্যেকটি আবিষ্কার আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। ধীরে ধীরে একটা ব্যর্থতা এসে পড়ছে, ব্যর্থতার ভারে মন পড়ছে আড়ষ্ট হয়ে। কোথায় চলেছে মানুষ? প্রগতির পরিণতি কোথায়? এমনি সব পরিপ্রশ্ন জেগেছে, যার উত্তর জানবার জন্য মানুষ আজ হাঁপিয়ে উঠেছে। মানুষের প্রগতি আদৌ সম্ভব কি না, এবং সম্ভব যদি হয় তবে সেই প্রগতির স্বরূপ বা প্রকৃতি কি রকমের, এসব আলোচনা এখানে না-ই বা করলাম। শুধু এইটুকু বলেই শেষ করব যে, তাম্র-ব্রঞ্জ যুগের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রারম্ভে তদানীন্তন মনীষী মানবও আজকের মানুষের মতই অনুভব করেছিল যে, প্রগতির পথে জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে নূতন-নূতন আবিষ্কার যেমন হয়েছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরাম-বিরাম যেমন বর্ধিত হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণে—চাই কি, তার চেয়েও বেশি—বেড়ে গেছে জীবনের আপদ-বিপদ দুঃখ-গ্লানি। সকল দুঃখ-দৈন্যের মূল কারণ জ্ঞান-বৃদ্ধি—এই দর্শন-তত্ত্ব থেকেই বাইবেলের হিব্রু মহাপুরুষ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণের আখ্যায়িকাটি রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট পুরুষ ও নারী আদম ঈভ স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিল নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণের দরুন। গ্রীক মাইথলজিতেও অনুরূপ একটি উপাখ্যান আছে, তার নাম—'প্যাণ্ডোরার বাক্স'। মানুষের উত্তরোত্তর জ্ঞান-বৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে দেবাদিদেব জেউস প্যাণ্ডোরা নাম্নী একটি সুন্দরী রমণীকে পাঠিয়েছিলেন ঈর্ষা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কলহ প্রভৃতি ঝুড়িভর্তি মন্দ বস্তু মনুষ্যসমাজে ছড়িয়ে দেবার জন্য। সভ্যতার যুগ-সন্ধিক্ষণে যে মানুষের মনে আশঙ্কার ছায়া পড়ে, এই আখ্যায়িকা দুটিতে সেই চিরন্তন ভাবই চমৎকার ফুটে উঠেছে।

প্রথম খণ্ড

সুমের ও আক্কাড

॥ এক ॥

সিনারের মহাপ্লাবন ও প্রত্নতত্ত্ব

ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ড গ্রীকদের কাছে 'মেসোপটেমিয়া' নামে পরিচিত ছিল। মেসোপটেমিয়া এখন ইরাক দেশের অন্তর্গত। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে যে অববাহিকা-ভূমি পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহাসিক নাম 'সুমের দেশ'। এই সুমের দেশই বাইবেলের 'সিনার' (Shinar)। এই দেশের উত্তরে ব্যাবিলন নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী ছিল। কালক্রমে সেই ক্ষুদ্র পল্লী পরিবর্ধিত হয়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ব্যাবিলন রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আরও উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে আসুর নামে যে পল্লীটি ছিল, সেই পল্লী থেকেই সে দেশের নাম হয়েছিল 'আসিরিয়া'। ব্যাবিলনের মত আসিরিয়াও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য ও বিপুল সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছিল। সুমের, ব্যাবিলন, আসিরিয়া—এই তিনটি প্রদেশের নগর-রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনীই প্রাচীন ইরাকের ইতিহাস। এই কাহিনী শুধু কতগুলি ঘটনার বা যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবৃতি মাত্র নয়। এখানে আমরা পাই উপত্যকাভূমির সংস্কৃতির পরিচয়, যে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল মানব-সভ্যতার উষাক্ষণে, যার বিবৃদ্ধি ঘটেছে নানান জাতির সংমিশ্রণে। সুমের দেশের নগরে নগরে সভ্যতার যে দীপ্তি ফুটে উঠেছিল সুদূর অতীতে, সেই রশ্মি-সম্পাতে প্রোজ্জ্বল হয়েছিল ব্যাবিলন ও আসিরিয়া—এবং তখনই সম্ভব হয়েছিল এই দুই দেশের সেমেটিক উপজাতিগণ কর্তৃক সাম্রাজ্য গঠন। সুমেরীয় নগরগুলির উত্তরে ছিল আক্কাড। প্রথমে এই আক্কাডকে কেন্দ্র করে 'সুমের ও আক্কাড' সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তারপর ব্যাবিলনের উত্থানের সঙ্গে সমগ্র মেসোপটেমিয়া, সুমের ও আক্কাড, এমন কি আসিরিয়া পর্যন্ত ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন দুই নদীর অববাহিকা ও তার উত্তর অংশের নামকরণ হল, 'ব্যাবিলোনিয়া'—যে নামে এ দেশটি ছিল দীর্ঘকাল পরিচিত। কালক্রমে ভাগ্যবিপর্যয়ের দরুন ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল, তখন তারই ধ্বংসস্তূপের ওপর আসিরিয়া প্রোথিত করেছিল তার বিজয়-নিশান। আবার আসিরিয়াও মহাকালের গর্ভে বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল, পারসীক মিডিস

(Medes)-দের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে। এইরূপে যে তিনটি সভ্যতার পর-পর আবির্ভাব হয়েছিল, সেগুলি বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারক বা বাহক নয়— একই সংস্কৃতির তিনটি পর্যায়ের ক্রমবিকাশ মাত্র। প্রসঙ্গত আমরা দেখতে পাব, এখানকার প্রাচীন সংস্কৃতি কিরূপে পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে, এবং কিরূপে তারই প্রতিক্রিয়া প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের ঐতিহ্য ও ধর্মচিন্তা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় প্রভাবের ভূরি ভূরি প্রমাণ বাইবেলের পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যায়।

বাইবেলের 'জেনেসিস' (Genesis) গ্রন্থে একটি মহাপ্লাবনের বর্ণনা আছে : "চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি ধরে বারিবর্ষণ হয়েছিল পৃথিবীর ওপর। ......জলে সমাচ্ছন্ন হয়েছিল পৃথিবী। আকাশের তলে উচ্চ টিলাগুলি জলমগ্ন হয়েছিল। সেই জল মাটির ওপর পনের হাত ঊর্ধ্বে উঠেছিল, পর্বতরাজি প্লাবিত হয়েছিল। পৃথিবীর সকল জীব ধ্বংস পেয়েছিল, পশু পক্ষী সরীসৃপ মানব সবই......কেবলমাত্র নোয়া (Noah)-ই জীবিত ছিলেন, আর বেঁচে ছিল তারা যারা ছিল তাঁর বজরায়। এক শ' পঞ্চাশ দিন ধরে পৃথিবীর ওপর প্লাবনের জল অবস্থান করেছিল।" এখানে মনে রাখা দরকার যে ইহুদিদের মান্ধাতা আব্রাহামের আদি নিবাস ছিল ব্যাবিলোনিয়ার উর নগরে— যাকে বলা হয়েছে বাইবেলে Ur of the Chaldees। সুমের দেশ থেকেই ইহুদিদের পূর্বপুরুষেরা প্যালেস্টাইনে এসেছিল সেখানকার প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে, এবং বাইবেলের প্লাবনের বর্ণনা একটি প্রাচীন সুমেরীয় কাহিনীরই প্রতিধ্বনি। পলিমাটির জমাট স্তর থেকে সুমের দেশের সৃষ্টি, সর্বত্রই জলাভূমি, নলখাগড়ায় ভর্তি, মাঝে মাঝে বালুর চর। এই নদী উপত্যকার উভয় পার্শ্বে উচ্চ ভূমির ঊষর মরুপ্রান্তর—মধ্যস্থলে শাখাবহুল নদীর আঁকাবাঁকা জলস্রোত তটভূমিকে সিক্ত প্লাবিত বনাকীর্ণ করে মন্থর গতিতে সাগরে গিয়ে পড়েছে। সেই সুপ্রাচীন কালে দুই নদীর সংগম ঘটে নি, সাট-এল-আরবের ভূখণ্ডও তখন সৃষ্টি হয় নি। ধূসর মরুভূমির প্রান্তদেশে এই শ্যামাঞ্চল ছিল বাইবেলের স্বর্গ-উদ্যানেরই মত মনোরম। বস্তুত ইউফ্রেটিস নদী 'স্বর্গনদী চতুষ্টয়ে'র অন্যতম বলেই বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। এ দেশ প্লাবনের দেশ। একটি

প্রলয়ংকর মহাপ্লাবনের প্রবাদ এখানকার পুরাণ-কথায় অর্থাৎ গিলগামেশ উপাখ্যানের একাদশ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছিল। কথিকাটি এইরূপ : বাত্যা-দেবতা এনলিল ক্রুদ্ধ হয়ে পৃথিবী ধ্বংস করেছিলেন বন্যার জলপ্লাবন ছুটিয়ে দিয়ে। এই মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস পেয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন উৎনাপিসতিম নামে এক সাধু ব্যক্তি যথাসময়ে একটি নৌকা নির্মাণ করে। প্রলয়ের প্রাক্কালে পত্নী সহ সেই নৌকায় গিয়ে উঠেছিলেন তিনি—সঙ্গে নিয়েছিলেন পশু-পক্ষী জীব-জন্তুর এক-একটি জোড়া। স্পষ্ট দেখা যায়, এই উৎনাপিসতিমই বাইবেলের নোয়া, তার নৌকাই নোয়ার সেই সুপ্রসিদ্ধ বজরা (Noah's Ark)।

সুমের দেশের এই মহাপ্লাবনের বিবরণ সমন্বিত একটি প্রাচীন মৃৎ-চাকতি (clay tablet) আবিষ্কৃত হয়েছে। চাকতিটিতে রাজন্যবর্গের রাজ্য-শাসন-কাল লেখা রয়েছে ধারাবাহিকভাবে। বর্ণনায় অলীক কল্পনার অভাব নেই। বলা হয়েছে, "মহাপ্লাবনের পূর্বে ব্যাবিলোনিয়ায় দশটি রাজার আবির্ভাব হয়েছিল, তাদের মধ্যে যিনি ন্যূনতম কাল শাসন করেন তিনি রাজত্ব করেন ১৮,৬০০ বছর, আর যিনি দীর্ঘতম কাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি শাসন করেন ৪৩,২০০ বৎসর।"* ইতিহাসের সেই পারম্পর্য হঠাৎ ভেঙে গেল মহাপ্লাবনের আগমনে—তখন রাজাদের শাসন-বিবরণ বন্ধ করে লেখা হল, "তারপর প্লাবনের আগমন হল, প্লাবনের পর রাজার রাজ্য-শাসন নেমে এল স্বর্গ থেকে।" চাকতি-লিখনে বর্ণিত এই প্লাবনই যে বাইবেল-বর্ণিত মহাপ্লাবন ('the Deluge') তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মেসোপটেমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যে আবিষ্কার করা হয়েছে। নিম্ন মেসোপটেমিয়ায় বন্যা একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন একটি প্রচণ্ড মহাপ্লাবনের নিদর্শন ভূগর্ভে পাওয়া গেছে, যার তুলনা কোন সাধারণ বন্যার সঙ্গে করা চলে না। মাটির নিচে ৮ ফুট পুরু একটি পলিমাটির স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, যা অসাধারণ রকমের কোন প্রলয়ংকর মহাপ্লাবনেরই সাক্ষ্য দেয়। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, পলি-স্তরটির নিচের ও উপরের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতির একটি পূর্ণচ্ছেদ দেখা যায় :

* *History of the Persian Empire* by A. T. Olmstead—p. 2

প্রাক্-প্লাবনকালের সংস্কৃতি জলমগ্ন হয়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস পেয়েছে, এবং প্লাবনোত্তর কালে সেখানে আবির্ভাব হয়েছে একটি নূতন সংস্কৃতির। "A whole civilization which existed before is lacking and seems to have been submerged by waters" প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর লিওনার্ড উলি এই উক্তিটি করে প্রসঙ্গক্রমে আরও বলেছেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা যে বন্যার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি, সেই বন্যাই হল সুমেরীয় প্রবাদকথার ও ইতিহাসের বন্যা, আবার বাইবেলেরও প্লাবন সেই বন্যা—যে বন্যাকে অবলম্বন করে নোয়ার আখ্যায়িকা রচিত হয়েছিল।

প্লাবন প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীকে গ্রাস করে নি, তার ধ্বংসেরও একটা সীমা ছিল। সত্য বটে, বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলির সমস্ত সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পলি-স্তরের নিচে পড়ে আছে নব-প্রস্তরযুগের গ্রাম্য সংস্কৃতির নিদর্শন, হাতে-গড়া চিত্রিত হাঁড়িকুড়ি, প্রস্তরাস্ত্র—ধাতুদ্রব্যের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি সেখানে। কিন্তু সেই পলি-স্তরের ঠিক উপরিভাগেই আমরা ধাতু-যুগের সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ দেখতে পাই। সৌভাগ্যক্রমে প্লাবিত ভূখণ্ডের কোন কোন স্থানে দুটি সভ্যতার মধ্যে এরকমের পূর্ণচ্ছেদ দেখা যায় না। এমন কতগুলি টিলার মত উঁচু স্থান ছিল যা প্লাবনেও জলমগ্ন হয় নি, অথচ সেসব স্থান প্লাবিত ভূখণ্ডেরই অন্তর্গত। এখানে সংস্কৃতির পূর্বাপর পারম্পর্য ভঙ্গ হয় নি। নব-প্রস্তরযুগ ধীরে ধীরে কিরূপে ধাতুযুগে রূপান্তরিত হল তার ধারাবাহিক ইতিহাসই রয়েছে এখানকার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সংরক্ষিত। এইরকমের স্তর থেকে আমরা জানতে পারি, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের নিম্নভাগে সুমের দেশে প্রস্তরযুগের গ্রামগুলি থেকেই এরেক, এরিদু, লাগাস, উর, লারসা প্রভৃতি ঐতিহাসিক নগরের উৎপত্তি হয়েছিল। এইসব স্থানের গ্রামগুলিই নগরে পরিণত হয়েছিল।

আগন্তুক জাতি

এখানকার গ্রামগুলির ক্রম-পরিণতি নিতান্ত বাধাহীনভাবে ঘটে নি। নব-প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে লিখনের সূত্রপাত পর্যন্ত একটির পর একটি আগন্তুক জাতি নূতন ঐতিহ্য, নূতন সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে এসেছিল, এরকম নিদর্শন যথেষ্ট আছে সুমের দেশে। আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তারা গড়ে

মহাপ্লাবনের আখ্যায়িকা—আসিরিয়ার একটি মৃৎ-চাকতির উপর লিখিত

প্লেট ১
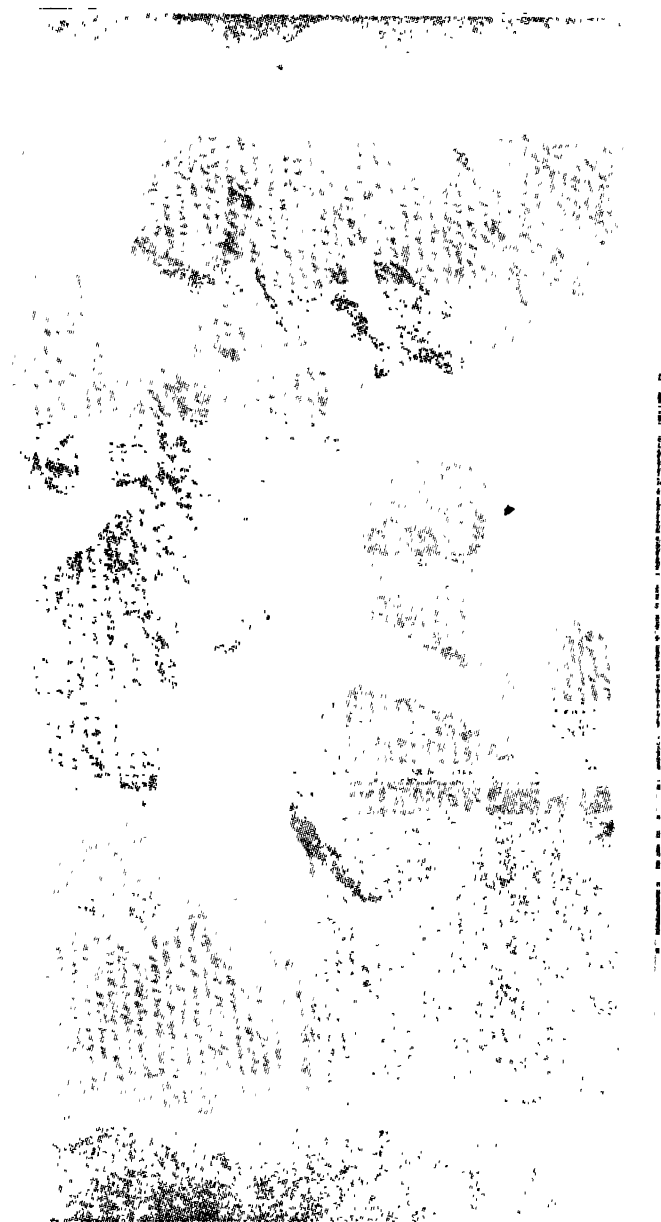
(ক) 'শকুনি-স্তম্ভে'র একটি অংশ—সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য-পুরোভাগে লাগাসের (সিরপুরলা-র) পটেশী এয়ানাটুমের ভাস্কর্যে খোদিত প্রতিমূর্তি (লুভার মিউজিয়াম)

খ) 'শকুনি-স্তম্ভে'র মার একটি অংশ—দ্ধান্তে মৃতের সমাধি-ানের দৃশ্য ভাস্কর্যে খাদিত
(লুভার মিউজিয়াম)
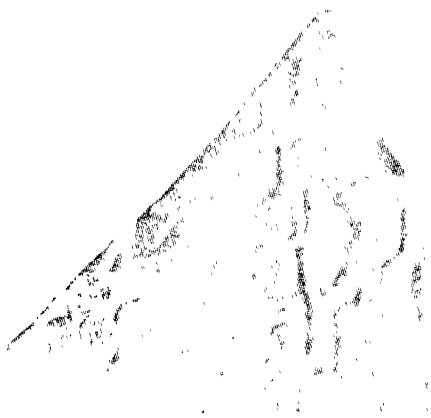
তুলেছিল একটি নূতন সমাজ, নূতন সংস্কৃতি—যে সংস্কৃতিকে আমরা আদিযুগের সুমেরীয় সংস্কৃতি বলে অভিহিত করে থাকি। কিন্তু কোন সে মেধাবী জাতি যারা গড়ে তুলেছিল এই সুমহান সংস্কৃতিকে, কোথা থেকে এসেছিল তারা, তাদের আদি নিবাসই বা কোথায়, এসব বিষয়ে সুধীমণ্ডলীর মধ্যে নানান মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। বড় দুটি নদীর মোহানায় তারা এসে বাসা বেঁধেছিল, তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল সাগর-থেকে-ফেরা বেরোসাস (Berossus of Oannes) ও অন্যান্য ধীবরদের কাহিনী, যারা এনেছিল সে দেশে ধর্ম ও সংস্কৃতি বহন করে, শুধু এই বৃত্তান্তটি থেকে কেউ কেউ এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে নূতন আগন্তুকেরা এসেছিল জলপথে নৌকাযোগে, কিন্তু এই অনুমান নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ নয়। সুমের দেশের নিম্নভাগের জলাভূমির নাম ছিল 'সাগরিকা' ('Sea Country'), কাহিনীটিতে সম্ভবত এ অঞ্চলে আগমনের কথাই বলা হয়েছে। সুমেরীয়রা যে প্রাচ্যের কোন পর্বত-গৃহ ছেড়ে এখানে এসেছিল, এই মতবাদের সমর্থনে কেউ বা 'জিগ্‌গুরাট' (Ziggurut) বা 'পর্বতাকৃতি মন্দির'-সমূহের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। কিন্তু এই পর্বতাকৃতি মন্দিরগুলি সম্ভবত গুডিয়া ও উরের নৃপতিগণের শাসনকালের পূর্বে নির্মিত হয় নি। সে যাই হোক, এই সংস্কৃতির পুরোধা-গণের আগমন হয়েছিল পূর্বদেশীয় পাহাড় অঞ্চল থেকে গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে, সম্ভবত ৪০০০-৩৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দের মধ্যে, এই সিদ্ধান্তই এখন করা হয়েছে।* ভারতের সিন্ধু-সভ্যতারও উদ্ভব হয়েছিল ওই সময়েরই কাছা-কাছি সময়ে, হয়তো বা তার কয়েক শতাব্দ পূর্বে। সুতরাং একথা মনে ওঠা

---

* ঐতিহাসিক লিওনার্ড কিং বলেন, "The age of Sumerian civilization can be traced in Babylonia back to the middle of the fourth millennium B. C....It is not suggested that this date marks the beginning of Sumerian culture, for, as we have noted, it is probable that the race was already possessed of a high standard of civilization on their arrival in Babylonia. The invention of cuneiform writing, which was one of their noteworthy achievements had already taken place, for the characters in the earliest inscriptions have lost their pictorial forms." (*History of Sumer and Akkad*—p. 65)

স্বাভাবিক যে সিন্ধু-সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল যে জাতি, সেই জাতিরই একটি শাখা সুমের দেশে গিয়ে নূতন সংস্কৃতির প্রবর্তন করেছিল। বস্তুত সিন্ধু দেশের মাহেঞ্জোদারো ও পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক পরিবীক্ষণের ফলে মিশরে পিরামিড-সৃষ্টির সমসাময়িক কালের (খৃঃ পূঃ ৩০০০) সিন্ধু-সভ্যতার যে বিস্ময়কর উন্নত রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাই থেকে অনেক মনীষী এই সিদ্ধান্তের দিকেই ঝোঁক দিয়েছেন যে, ভারতের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতাই সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার অগ্রজ, জগৎ-সভ্যতার পথপ্রদর্শক। এ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি বটে, তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের উক্তি উপরোক্ত মতবাদকেই সমর্থন করে। ঐতিহাসিক হল বলেন, সুমেরীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উলি মনে করেন, সুমেরীয় ও হরপ্পা সংস্কৃতি, উভয় সভ্যতাই বেলুচিস্থানের কোন প্রাচীনতর সংস্কৃতির বংশধর। ব্যাবিলোনিয়ায় প্রাক্-সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি প্রসঙ্গে অধ্যাপক গর্ডন চাইল্ড্ এই অর্থপূর্ণ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন : "Were then the innovations and discoveries that characterise proto-Sumerian civilization not native developments on Babylonian soil, but the results of Indian inspiration ? If so, had the Sumerians themselves come from Indus, or at least from regions in its immediate influence ? These fascinating questions can not yet be answered." অর্থাৎ প্রাক্-সুমেরীয় সভ্যতায় নবধারার প্রবর্তন ও আবিষ্কারসমূহ দেখে কি এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ব্যাবিলোনীয় মাটি থেকে সুমেরীয় সভ্যতা গজিয়ে ওঠে নি, সেখানে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল ভারতীয় অনুপ্রেরণার ফলেই ? তাই যদি হয়, তবে কি সুমেরীয়রা সিন্ধুতীর অথবা সিন্ধু-প্রভাবিত কোন স্থান থেকে এসেছিল ? এইসব হৃদয়গ্রাহী প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখনও সম্ভব নয়।

সুমেরীয় ও সেমাইট : সুমের ও সিন্ধুর সিলমোহর

সুমেরীয়রা আরব বা হিব্রুদের মত 'সেমাইট' জাতির মানুষ ছিল না। তারা যে ভাষা ব্যবহার করত তার মধ্যে সেমেটিক শব্দের প্রয়োগ দীর্ঘ

কয়েক শতাব্দ পর্যন্ত একেবারেই পাওয়া যায় না, যা থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে সেমাইটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিল তারা অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে।* গোড়া থেকে সুমেরীয় লিখনকে চিত্ররূপ-বর্জিত দেখা যায়, সুমের ও সিন্ধুবাসীদের লিখনপ্রণালী ছিল একই ধরনের। উভয় দেশে আবিষ্কৃত সিলমোহরগুলিও (seals) একই রকমের। ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাবিলোনিয়ায় যে অপরিচিত ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুমেরের উত্তর দিকে অবস্থিত আক্কাড দেশের কোন মন্দিরে প্রাপ্ত একটি মৃৎপাত্রের ওপর ভারতের ধর্মাচরণ বিষয়ক চিত্রাঙ্কন থেকে। এই কালের সুমেরীয় সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন, সুমেরীয়দের সংযোগ মিশরের সঙ্গে তেমন দেখা যায় না, আদান-প্রদানের সংস্রব প্রধানত ছিল সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উভয় দেশের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগের নিদর্শন আক্কাডীয় যুগ, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৩০০ অব্দের পূর্ব পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। হরপ্পার কয়েকটি সিল-মোহর পাওয়া গেছে সুমের দেশে, যা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আক্কাডীয়দের রাজ্যকালে সে দেশে হরপ্পা থেকে ব্যবসায়ীরা এসে সুমেরীয় শহরগুলিতে কারবার—সম্ভবত তুলাজাত দ্রব্যের বাণিজ্য—বেশ ভাল করেই জমিয়ে বসেছিল।† এরূপ বাণিজ্য চলেছিল কতকাল তা ঠিক

---

* এই প্রসঙ্গে লিওনার্ড কিং বলেছেন, "As a matter of fact, no Semitism occurs in any text from Ur-Nina's period to that of Lugal-zaggasi with the single exception of a Semetic loan-word on the Cone of Entemena." (*History of Sumer and Akkad*, p. 52)

† সাম্প্রতিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান সুমের দেশে সিন্ধুর আর সিন্ধু উপত্যকায় সুমেরের বহু-সংখ্যক সিলমোহর আবিষ্কার করেছে। প্রসঙ্গটির গুরুত্ব আলোচনা করে ১৯৬০ সনের ডিসেম্বর মাসের Statesman পত্রিকার একটি সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছে : "Contemporary Sumerian literature speaks of a land of Dilmun to the east of Sumer, with the characteristic of a great trading community, sending merchandise by boat...A number of Indus Valley seals have been found on Sumerian and Elamite sites in West Asia, whence evidently came seals, beads, tools and other objects found at Mohenjodaro and elsewhere. That there was an exchange of trade is thus well-established."

বলা যায় না। মোটামুটি বলতে গেলে, খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের পর উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের কোন চিহ্নই আবিষ্কৃত হয় নি।

ভাষার পার্থক্য ছাড়াও সেমেটিক জাতি ও সুমেরীয়দের মধ্যে বিশেষ কতগুলি আকৃতির প্রভেদলক্ষণ বিদ্যমান, এমন কি তারা বিভিন্ন রকমের বেশভূষা পরিধান করত। পুরনো কালের পাথরে-খোদাই মূর্তিগুলি দেখলে প্রথমেই চোখে পড়ে সুমেরীয়দের দাড়ি-গোঁফ-চাঁচা মাকুন্দার মত মুখ, অনেক ক্ষেত্রে মুণ্ডিত মস্তক। আদিকালের প্রস্তরমূর্তিগুলির তেরছা চোখ লক্ষ্য করে কোন কোন পণ্ডিত এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সুমেরীয়রা ছিল মোঙ্গল জাতীয় মানুষ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি একেবারেই যুক্তিসংগত নয়, কেননা পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞানের অভাবের দরুনই চোখ তেরছাভাবে খোদিত হয়েছে, ওটাকে ভাস্কর্যশৈলীর ত্রুটি বলেই ধরতে হয়।* সেমেটিকদের ছিল গরুড়ের মত নাক, আর সুমেরীয়দের নাক উন্নত হলেও সেরকম সুপুষ্ট বা চোখা ছিল না। সেমাইটরা যে দীর্ঘ বিলম্বিত দাড়ি রাখত তা বেশ বোঝা যায় নারাম-সিন বা হাম্মুরাবির উৎকীর্ণ পাথরমূর্তি দেখে, উভয়েই তাঁরা ছিলেন সেমেটিক জাতীয়। পরবর্তী কালের সেমেটিকগণ তাদের যাযাবর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর অনুকরণে উপরকার ওষ্ঠাধরের ওপর গোঁফ জোড়াকে পাতলা করে ছাঁটত বা কামাত, কিন্তু তরঙ্গিত শ্মশ্রুর স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধিকে বন্ধ করত না। সুমেরীয়রা পরত 'পেটিকোট' বা ঘাগরার মত পোশাক, ঊর্ধ্বাঙ্গে স্কন্ধের ওপর উত্তরীয়ও দেখা যায়, এইসব বস্ত্র ছিল পশমের। সেমেটিকরা কটিবাস (loin cloth) কোমরে জড়িয়ে রাখত, সেটি হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঝুলত যেমন দেখা যায় নারাম-সিন-এর প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিতে। আক্কাডেই প্রথমে সেমেটিকদের আরব মরু অঞ্চল হতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তারপর থেকে সুমেরীয় ও সেমেটিক জাতিদ্বয়কে দীর্ঘকাল সহাবস্থান করতে দেখা যায়, কিন্তু এখানকার সভ্যতার ইতিহাস-মঞ্চে সুমেরীয়দেরই প্রথম আবির্ভাব

* "The obliquely set eyes of the figures in the earlier reliefs, due mainly to an ignorance of perspective characteristic of all primitive art, first suggested the theory that the Sumerians were of Mongol type... but this is too improbable to need detailed refutation."—*History of Sumer and Akkad* by L. King, p. 54

হয়েছিল এবং ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতির ভিত্তি-পত্তন ও বিবর্ধন যে তারাই করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মিশরীয় সভ্যতা ও সুমের

সিন্ধু উপত্যকা, অর্থাৎ মাহেঞ্জোদারো-হরপ্পা ও সুমের দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক লক্ষণসমূহের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মনীষীগণ সিদ্ধান্ত করেছেন, উভয় সংস্কৃতি একই ক্ষেত্র থেকে সমুদ্ভূত, সুমেরীয় সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতারই স্বগোত্রীয়, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে : সিন্ধু দেশের মত মিশরের সঙ্গেও কি সুমের দেশের তেমনি কোন নাড়ীর যোগাযোগ ছিল, না ও দুটি দেশ পরস্পর সম্পর্কশূন্য, দু দেশেই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে? অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়ে গেছে এই বিষয়টি নিয়ে। একটি মতবাদ এই যে প্রাক্-বংশকালে মিশর সেমেটিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল, এবং তারাই সেখানে সুমেরীয় সভ্যতার বীজ বপন করেছিল, যা থেকে হল মিশরীয় সভ্যতার জন্ম। এ কথা সত্য যে আদিকালের মিশরীয় ভাষায় কিছু-কিছু সেমেটিক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, তা ছাড়া সুমের দেশের চোঙা সিলমোহর (cylinder seals), গদা-মুণ্ড (mace-heads) এবং খাঁজ-কাটা দেয়ালের সঙ্গে ওই জাতীয় মিশরীয় জিনিসের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মিশরে গৃহনির্মাণে কাঁচা ইঁটের ব্যবহার, উভয় দেশে একই রকমের সেচনপ্রণালী, মিশরের ওপর সুমেরীয় সংস্কৃতির প্রভাব ইঙ্গিত করে। মিশরের হায়রোগ্লাই-ফিক বা চিত্রলেখার মূলে রয়েছে নাকি সুমেরীয় কিউনিফরম বা কীলকাক্ষর, আর সুমেরীয় পোশাক-পরা একটি মূর্তি-খোদাই ছুরির হাতল পাওয়া গেছে মিশর দেশে, এমনি সব যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা হয়েছে যে মিশরে সুমেরীয় সভ্যতাকেই আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তিগুলি আদৌ বিচারসহ নয়, কেননা মিশরে সুমেরীয় বা সেমেটিক সংস্কৃতির যেসব তথাকথিত নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলিকে ব্যবসাক্ষেত্রে সুমের দেশীয় লোকজনের আগমনের ও আদান-প্রদানের সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করাই সংগত। এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক ডক্টর রাইসনার ও নৃতাত্ত্বিক ডক্টর ইলিয়ট স্মিথের আবিষ্কারসমূহ এই সত্যই প্রমাণিত করেছে যে মিশর দেশে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল সেমেটিক বা সুমেরীয় প্রভাবে নয়, সে

সভ্যতা মিশরের নিজস্ব, সেখানকার সাংস্কৃতিক ধারাপরম্পরার স্বাভাবিক পরিণতি।

পূর্বাঞ্চল থেকে নব আগন্তুকরা এসেই সর্বপ্রথম সুমের দেশে ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করে। তাম্রযুগের প্রারম্ভ তখন থেকেই, তার পূর্বে তত্রত্য অধিবাসীরা নব-প্রস্তরযুগীয় সমাজেই বসবাস করত। নব-প্রস্তরযুগের (Neolithic Age) সমাজ ছিল স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য কৃষি-সমাজ। এ দেশের জনপদগুলি তখন নলখাগড়ার বেড়া-দেওয়া কতিপয় পর্ণকুটিরের সমষ্টি মাত্র, পরে সেগুলি মাটির ঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল। এরূপ জনপদের নিদর্শন উর-এর সমীপবর্তী অল-উবেইদ নামক স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। গৃহের মেঝে মাটির, তার ওপর গর্ত-করা পাথরে (stone sockets) বসানো কাঠের দরজাটি স্বচ্ছন্দে খোলা আর বন্ধ করা চলত। উরে কতগুলি সুন্দররূপে চিত্রিত হাতে-গড়া মৃৎপাত্র (pottery) উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি সবই নব-প্রস্তরযুগের। আরও কতগুলি পালিশ-করা প্রস্তরনির্মিত খুন্তি, কুঠার প্রভৃতি প্রহরণাদি এবং পোড়া মাটির কাস্তে পাওয়া গেছে, যা থেকে সেই প্রাক্-প্লাবন নব-প্রস্তরযুগের সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। তখন কৃষিকার্য শিখেছে মানুষ, শস্য উৎপাদন করে সে, সংগ্রহও করে, নৌ-নির্মাণ করে, মাছ ধরে। চর্মবাস ছেড়ে তারা তখন তাঁতে বোনা বস্ত্র পরিধান করে, ঝিনুক ও স্বচ্ছ পাথরের হরেক রকমের অলংকারও প্রস্তুত করে। এই আদিবাসীরা যে কোন জাতির মানুষ ছিল তা আমরা জানি না, হয়তো বা তারা ছিল উত্তরাঞ্চলের আক্কাড্বাসীদেরই জ্ঞাতি কোন সেমেটিক জাতি, তাদের কোন ইতিহাস বা কাহিনী আমাদের জানা নেই। কিন্তু তারা যে সভ্যতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল তার প্রমাণ আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকেই ব্যাবিলোনিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্য শুরু হয়েছিল, তখন বিস্মরণীর তলে চাপা-পড়া প্রাচীন ইতিহাসকেও ভুঁই ফুঁড়ে উঠে পড়তে দেখা গেল। সশরীরী জীবন্ত ইতিহাস নয়, ইতিহাসের কঙ্কাল, যার অস্থিটুকরোগুলি জোড়া দিয়ে প্রত্নতত্ত্বের সুধীবৃন্দ বিগত বিস্মৃত কালের নানান কাহিনী সুসম্বদ্ধভাবে রচনা করে জগৎকে উপহার দান করেছেন। মানুষ তখন দেখল, প্রাক্-প্লাবনকালের সেই আঁধার রজনীর শেষে

ইতিহাসের স্বল্পালোকিত উষাক্ষণ, সুমেরীয়দের প্রতিষ্ঠিত নগর, যেমন সেগুলি একটির পর একটি উদ্ধার করা হল। সাট এন-নীল, সাট এল-কার প্রভৃতি ইউফ্রেটিস নদীর শুষ্ক শাখাগুলির কাছে আবু হাব্‌বা, টেল্‌ ইব্রাহিম, এল-ওহেমির ও নিফ্‌ফার নামক স্থানে ছিল মাটির ঢিবি (mounds), সেই ঢিবিগুলিকে খনন করে সেখানে যথাক্রমে প্রাচীন কালের প্রধান নগর সিপ্‌পার, কুথা, কিশ ও নিপ্‌পার আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও কতগুলি স্থান খোঁড়াখুঁড়ির ফল এই : আবু হাতাবে পাওয়া গেছে কিসুর্‌রা নগর, ফারায় সুরুপ্‌পাক, ওয়ারকায় এরেক, জোখায় উম্মা, সেনখেরায় লারসা। তা ছাড়া ইউফ্রেটিস নদীতীরে ব্যাবিলন ও উর নগরদ্বয়েরও সন্ধান পাওয়া গেছে।

ব্যাবিলোনিয়ায় প্রত্নতত্ত্বের কাজ প্রথম আরম্ভ করেন বসরার বৃটিশ কনসাল মিঃ জে. ই. টেলর ১৮৫৪ সালে। তিনিই ছিলেন এখানকার প্রত্নতত্ত্বের পুরোধা যদিও প্রত্নতত্ত্ব তখনো বিজ্ঞানের দাবি নিয়ে হাজির হয় নি। প্রত্নতত্ত্বের কাজ ছিল তখন শুধু প্রাচীন স্থানসমূহ খোঁড়াখুঁড়ি করে পুরনো জিনিস সংগ্রহ করা, যাদুঘরের 'শো-কেসে' সেগুলিকে গুছিয়ে সাজিয়ে রাখবার জন্য। বলা বাহুল্য, এরূপ রাহাজানি বা লুণ্ঠন বৈজ্ঞানিক প্রত্নতত্ত্বের ওপর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছে অনেক ক্ষেত্রে। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমত খোঁড়া-খুঁড়ি করে অনেক মূল্যবান নিদর্শন নষ্ট করেছেন টেলর, তবু বলতে হয় কতগুলি শিলালিপি উদ্ধার করে সেগুলির লিখিত বিবরণ থেকে বাইবেলের মান্ধাতা আব্রাহামের মাতৃভূমি 'ক্যালডিসদের উর'-নগর আবিষ্কার করবার কৃতিত্ব তাঁরই। ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে টেল্‌লো নামক স্থানটি খনন করেন ডি. সারজেক ও গ্যাস্টন ক্রস। এই খনন-কার্যের ফলে ধ্বংস-স্তূপের তলে লাগাস বা সিরপুরলা নামক প্রাচীন নগরটি আবিষ্কৃত হয়, এবং এখান থেকেই সুমেরীয় ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, দুই নদী উপত্যকার সাট এল-কার অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যে কিসুর্‌রা, সুরুপ্‌পাক, এরেক লারসা প্রভৃতি আবিষ্কৃত অর্থাৎ সেই প্রাচীন সুমেরীয় নগরগুলির স্থান-নির্দেশ অথবা ভিত্তিমূল আবরণমুক্ত করা হয়েছিল। উত্তর অঞ্চলে অনুরূপ খনন-কার্য চলেছিল ব্যাবিলন ও নিপ্‌পারে। খনন-কার্যের বিবরণ না দিয়ে এই প্রসঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকের নাম করা যেতে পারে, যাদের

অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলশ্রুতিরূপেই প্রাচীন কালের ব্যাবিলোনিয়ার একটি ধারাবাহিক সুসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের নাম, কলডিওয়ে (Koldewey), রেস্‌সাম (Rassam), পেরি স্কেইল (Pere Scheil) ও ওয়ালিস বাজ (Wallis Budge)। যেমন ব্যাবিলোনিয়ায়, তেমনি আসিরিয়ার আস্সুর ও নিনেভে নগর ও পারস্যের সুসা নগরেও খনন-কার্য চলেছিল, এবং সেইসব স্থানে যে তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কেবল আসিরিয়া ও ইলাম দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়নে সাহায্য করে নি, পরন্তু ব্যাবিলোনিয়ার সঙ্গে উক্ত রাজ্য দুটির সম্বন্ধকেও পরিস্ফুট করেছে।

মেসোপটেমিয়ায় অধুনাতন আর এক দফা খনন-কার্য শুরু হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৮ সনে। তখন ক্যাম্পবেল টমসন নামে জনৈক সামরিক বার্তা বিভাগের অফিসার এরিদু নগর ও উরের সমীপবর্তী স্থান খনন করেন। তাঁর এই কাজটি চালিয়ে যান ডাঃ এইচ. আর. হল। উর, এরিদু, অল-উবেইড খনন করেন তিনি। পরিশেষে ১৯২২ সনে স্যর লিওনার্ড উলির অধিনায়কত্বে আমেরিকান ও বৃটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি যৌথ অভিযান খনন-কার্য আরম্ভ করে উর নগরে এবং তার ফলে সুমের দেশের প্রাচীন সভ্যতা বিষয়ক অনেক নূতন তথ্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছে।

॥ দুই ॥

মৃৎখণ্ডে লিখন : বাহিস্তান পাহাড়

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারিগরি শিল্পের নানারূপ নিদর্শন যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি কতগুলি মাটির চাকতি (clay tablets) পাওয়া গেছে, যার লিখন থেকে সুমের দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ধর্ম ও সমাজ, সাহিত্য ও নীতি প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। পাতলা ইঁটের মত কাদামাটির চাকতি এগুলি, চোখা শলাকা দিয়ে লেখা হত চাকতির ওপর। চাকতি শুকিয়ে গেলে সেই লিখনগুলি ইঁটের ওপর শিলালিপির মতই স্থায়ী হয়ে যেত। পূর্বাঞ্চলের সুমেরীয়গণের আগমনের সময় থেকেই লেখার সঙ্গে তাদের পরিচয়ের কথা জানা যায়। পরে দেখতে পাব আমরা, দেশ শাসন করত পূজারীর দল দেবতার সেবাইতভাবে। আদিকাল থেকেই লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এখানে দেব-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের হিসাবনিকাশের জন্য। মন্দিরের সম্পত্তি থেকে শস্য, আর প্রজাদের কাছে খাজনা বাবদ অনেক দ্রব্যই পাওয়া যেত, সেগুলিকে গুদামজাত করা হত আর সেই সঙ্গে ব্যয়ের ব্যবস্থা করারও প্রয়োজন হয়েছিল। আয়-ব্যয়ের একটি রীতিমত হিসাব রাখতে হলে কোন প্রকার সংকেত-প্রণালীর (system of symbols) উদ্ভাবন দরকার, যা দেখে সমাজের সকলেই তার অর্থ বুঝতে পারবে। প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবসায়ীরা একরকম সিলমোহর (seals) ব্যবহার করত—প্রথম দিকে হয়তো বা সেগুলি রক্ষা-কবচের কাজ করত, অর্থাৎ মাদুলির মত সৌভাগ্য নিয়ে আসবে মালিকের কাছে, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। কালক্রমে এইসব সিলমোহরের ছাপ-মারা জিনিস মালিকের পরিচয় দিত কতগুলি সর্বসাধারণের বোধগম্য সংকেতচিহ্ন দ্বারা। এই প্রয়োজন থেকে যেরকম লেখন প্রথম দেখা দিয়েছিল, তা কতগুলি চিত্র-রেখা (pictogram) মাত্র। অর্থাৎ, একটি মাছ এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হত, 'মাছ'—গর্দভ এঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হত, 'গর্দভ'। কিন্তু 'মাছ' বা 'গর্দভ'কে বুঝিয়ে দিতে হলে ফটোগ্রাফের মত নিখুঁত একটি চিত্রের দরকার হয় না। তাই পরের যুগে লিখনটি অবিকল ছবির আকার ধারণ করত না, খোঁচ-খোঁচভাবে

কয়েকটি দাগ কেটে কতকটা ইঙ্গিতে-আভাসেই ছবি আঁকা হত। পরিশেষে, সুমেরীয় লিখনের তৃতীয় পর্যায়ে কতগুলি সাংকেতিক চিহ্নই অর্থের ব্যঞ্জনা করত। এই চিহ্নগুলির সঙ্গে বিষয়বস্তুর আকারগত কোন সাদৃশ্যই নেই, কতগুলি হিজিবিজি খোঁচ-খোঁচ আকারের চিহ্ন যা দেখে সকলেই একই মানে করে নিতে পারে। এই লেখাকে বলা হয় cuneiform (Lat. cuneus=wedge), অর্থাৎ বাণমুখো বা কীলকাক্ষর লিখন-প্রণালী। চিত্র-লিপি থেকে এই লেখাগুলি ক্রমে ধ্বনি-ব্যঞ্জক (phonetic) হয়ে উঠেছিল। চিত্রলিপি বা hieroglyphic দিয়ে গাধা ঘোড়া সূর্য তারা প্রভৃতি জীবজন্তু বা স্থূল পদার্থকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় বটে, কিন্তু তত্ত্ব-চিন্তা ও ধারণাকে (abstract thoughts and concepts) প্রকাশ করবার সামর্থ্য তার অল্পই, সেজন্য মিশর ও চীনে, যে দেশ দুটিতে চিত্রলিপি প্রচলিত ছিল, সেখানে ছবিগুলির সঙ্গে কতিপয় বিশেষ চিহ্ন জুড়ে দেওয়া হত নানারূপ মানসিক ভাবকে ব্যক্ত করবার জন্য। হায়রোগ্লাইফিক্স্ বা চিত্রলিপি সম্বন্ধে আলোচনা আমরা এই প্রসঙ্গে করব না। এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে সুমেরীয়দের 'কীলক' চিহ্নগুলি (symbols) যখন ধ্বনির ব্যঞ্জনা করতে শুরু করল, লেখা চিত্ররূপ ছেড়ে শব্দরূপে গিয়ে দাঁড়াল তখনই—এবং এই শব্দার্থব্যঞ্জক লিখন-প্রণালীর উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যে সুমেরীয়দের সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভাষাই তাদের ধ্বনিব্যঞ্জক লেখনের অনেকটা সুবিধা করে দিয়েছিল। ধ্বনি-সমষ্টি, যাকে বলা হয় syllable—তাদের ভাষা ছিল সেই ধ্বনি-সমষ্টিরই সংযোগ, সুতরাং কোন একটি ধ্বনি-সমষ্টিকে ব্যঞ্জনা করতে দরকার হত একটি মাত্র বিশিষ্ট সংকেতচিহ্নের। যেমন, 'কর্' 'বন্' এমনি এক একটি ধ্বনি-সমষ্টিকে বিশিষ্ট কোন ধ্বনিব্যঞ্জক সংকেতচিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। সুমেরীয় ভাষায় তিন শ' পঞ্চাশটি সংকেতচিহ্ন ছিল বলে প্রকাশ। 'ক' 'র' 'ব' 'ন' এরকম পৃথক অক্ষরের বর্ণমালা তখনো রচিত হয় নি। ক্যানানবাসী সেমেটিকরা ও ফিনিসীয়রা ধ্বনি-সমষ্টিকে খণ্ডিত করে বর্ণমালার (alphabet) সৃষ্টি করেছিল।

মাটির চাকতির ওপর লেখা আছে রাজাদের রাজত্বকালের স্মরণীয় ঘটনাবলী, যুদ্ধবিগ্রহ, মন্দির-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। অনেক ক্ষেত্রেই চাকতিগুলিকে

লোকচক্ষুর অন্তরালে মন্দিরের ভিতের তলে প্রোথিত করে রাখা হয়েছে হয়তো বা এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষের চক্ষে না পড়লেও রাজার মহিমা বা কীর্তি, যা রয়েছে মৃৎখণ্ডের ওপর খোদাই করা, তা কখনো দেবতার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারবে না। এই প্রকার ব্যবস্থার অন্য একটি অর্থও করা হয়েছে। রাজারা জানতেন, যতই পরাক্রান্ত হোক, রাজ্যের পতন একদিন আছেই। সে-সময় নগর ধ্বংস পাবে এবং দৃশ্যমান কোন পদার্থই নির্মম ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে না। মন্দিরও ভেঙে পড়বে, কিন্তু মন্দিরের তলে সযত্নে প্রোথিত এই মূল্যবান লিপি-লেখনটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভাবীকালের উত্তরবংশীয়দের কাছে রাজন্যবর্গের অক্ষয় কীর্তির কাহিনী চিরজাগরিত করে রাখবে।

শিলালিপির পাঠোদ্ধার : স্যর হেনরি রলিনসন

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত, মন্দিরের ও পরিবারের হিসাবপত্র, ব্যবসায়ের চুক্তি, জমির ইজারা, এমন কত কি লিপিবদ্ধ রয়েছে চাকতিগুলির উপর। মাটির চাকতির ওপর লিখন ছাড়াও, আমরা দেখতে পাই প্রস্তরখণ্ডে বা গদা-মুণ্ডে (mace-head) উৎকীর্ণ লিপি। এগুলি প্রায় সবই দেবতার স্তব-স্তুতি। ইতিহাসের আলোচনায় আমরা চাকতি-লিপি ও শিলালিপির উল্লেখ করব—বস্তুত এইসব লিপি থেকেই ইতিহাস গড়ে তুলেছেন মনীষীরা। কিন্তু কালক্রমে, মিশরী ভাষার মত, সুমেরীয় ভাষাও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, লিখনও আর প্রচলিত ছিল না। বহু শতাব্দ ধরে কি মিশরীয়, কি সুমেরীয় বা ব্যাবিলোনীয়—এইসব ভাষার লিখন পাঠ করা সম্ভব হয় নি। তখন হিরোডোটাস্ ডিওডোরাস প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকদের অসম্পূর্ণ বিবরণ ছাড়া এখানকার ইতিহাস রচনার আর কোন উপাদান ছিল না। মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দের কয়েকজন ইউরোপীয় মনীষী মিশরে প্রাপ্ত 'রোজেটা পাথর' (Rosetta Stone) থেকে মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন যেমন, তেমনি আবার পারস্য সম্রাট দারায়ুসের 'বাহিস্তান পাহাড়' (Bahistan Rock)-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কারের ফলে সুমেরীয়, ব্যাবিলোনীয় বা আসিরীয় লিখনের পাঠোদ্ধারও সম্ভব হয়েছিল। এই শিলালিপির আবিষ্কর্তা জনৈক ইংরেজ

কর্মচারী—নাম, স্যর হেনরি রলিনসন। ইরানের জনবিরল মালভূমির রাজপথে ক্যারাভ্যান যায় সারিবদ্ধভাবে, তারই পাশে পাহারারত দৈত্যের মত একটি ধূম্র পাহাড় দণ্ডায়মান। তুঙ্গ শৃঙ্গে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়টি, মাটি থেকে ৩০০ ফিট উর্ধ্বে অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে খোদিত করা হয়েছিল এই শিলালিপি, তা বোঝা যায় এই থেকে যে, ২৫ ফুট উচ্চ এবং ৫০ ফুট চওড়া এই লিপিলিখন। এই দুরারোহ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন রলিনসন ১৮৩৭ সালে, এবং জীবন বিপন্ন করেই তিনি শিলালিপির অবিকল একটি কপি প্রস্তুত করেছিলেন। অপরিসীম অধ্যবসায় বলে ও কৌশল প্রয়োগে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন রলিনসন। সম্রাট দারায়ুস তাঁর জীবনের ইতিহাস এবং যুদ্ধ-বিজয় কাহিনী স্বয়ং বর্ণনা করেছিলেন তিনটি ভাষার তিনটি লিপিলিখনে। ভাষা তিনটি—পারসীক, ব্যাবিলোনীয় ও স্থানীয় সুসান (Susan)। ব্যাবিলোনীয় ভাষা লিখিত হয়েছে 'কিউনিফরম' বা 'বাণমুখো' (কীলকাক্ষর) লেখার ভঙ্গিতে। 'বাহিস্তান পাহাড়ে'র এই লিখনের পাঠোদ্ধার করা হয়েছিল বলেই পণ্ডিতগণ ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় ভাষার মর্মোদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়েছেন। অতি প্রাচীন সুমেরীয় শিলালিপি, যেমন 'শকুনিস্তম্ভ' (Stele of the Vultures), মনিসটুসুর ওবেলিস্ক থেকে শুরু করে আসুরবানিপালের বিরাট গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত অগণিত চাকতি লিখন, অথবা হাম্মুরাবির সুবৃহৎ আইন-লিপি সবই পাঠ করা এখন বিশেষজ্ঞদের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠেছে। ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় ভাষাসমূহে যাঁরা ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠেছেন, সেই বিশেষজ্ঞদের বলা হয়—'আসি-রিয়লজিস্ট' (Assyriologist)।

বিস্মৃতির সলিলসমাধি থেকে উদ্ধার করে মিশর ও ইরাকের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির মনোহর চিত্রগুলিকে আধুনিক জগতের সমক্ষে একটি বর্ণোজ্জ্বল নাট্যমঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যেখানে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখাগুলিও সুপরিস্ফুট, এরূপ কৃতিত্বের দাবি যথার্থই করতে পারে দুইটি বিজ্ঞান, ইজিপ্টোলজি ও আসিরিয়লজি। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমত পাঠোদ্ধার করে সমগ্র নিকট ও মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় মেলে ধরা হয়েছে। কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিখুঁতভাবে পাঠোদ্ধার করা হয়েছে ব্যাবিলোনীয়

'কিউনিফরম' লিখনের, তা এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় : টাইগ্রিস নদীর তীরে কিলে-শেরঘাট নামক স্থানে প্রাচীন আসুর নগরের ভগ্নস্তূপ থেকে কিউনিফরম-লিখন-যুক্ত দুইটি চোঙা (cylinder) আবিষ্কৃত হয়। 'আসিরিয়লজিস্ট'-রা পৃথকভাবে লিখনগুলির কিরূপ পাঠোদ্ধার করেন তাই পরীক্ষা করবার জন্য বৃটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ লিখনের চারটি লিথোগ্রাফ প্রতিলিপি প্রস্তুত করে চারজন প্রখ্যাত পণ্ডিত স্যর হেনরি রলিনসন, ফক্স ট্যালবট, ডাঃ হিনকস ও জে. ওপর্ট-কে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যেকে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে পাঠোদ্ধারের ফল লিপিবদ্ধ করে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন। দেখা গেল, সকলেরই ফল প্রায় একরূপ—এবং তাই থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হল যে, যে প্রণালীর অনুসরণ করা হয়েছে পাঠোদ্ধার করতে তা বহুলাংশে ত্রুটিশূন্য। যে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি অবশিষ্ট ছিল, পরবর্তী কালে তাও অপসারিত করা হয়েছে।

॥ তিন ॥

নগররাজ্যের কাহিনী

ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের পলিমাটি দিয়ে গড়া অববাহিকা অঞ্চলের সমতল-ভূমিই প্রাচীন কালের সুমের দেশ, তার উত্তর-পূর্ব অর্ধাংশে আক্কাড প্রদেশ অবস্থিত। সমগ্র ভূখণ্ডের যুক্ত নাম সুমের-আক্কাড। এ দেশের সঙ্গে নদী দুটির উত্তরাংশের উচ্চ ভূখণ্ডের বিষম প্রকৃতিগত বৈষম্য বিদ্যমান সেই আদি-কাল থেকেই। এই উত্তর প্রদেশকেই গ্রীকরা নাম দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া ও আসিরিয়া, রুক্ষ কঠিন দেশ, তার তুলনা চলে সিরিয়ার মরু অঞ্চলের অনুর্বর বালুময় ভূমির সঙ্গে। এখানে নদীতীরের শস্যক্ষেত্রগুলির অনতিদূরে পাথর-কাঁকর-ভরা জমিতে বর্ষণশেষে জন্মায় তৃণগুল্ম যা শুধু পশুরই খাদ্য, সেসব জমির সার্থক ব্যবহার চারণভূমি রূপে। পক্ষান্তরে সুমের-আক্কাড ছিল অববাহিকার নদী-নালা, খানা-খন্দর জলাভূমি, আধুনিক গাঙ্গেয় বাংলার মত। খরস্রোতা নদী টাইগ্রিস, টরাস পর্বতমালা থেকে নেমে এসে উচ্চ খাড়া দুটি পাড়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত ছুটেছে সাগরসংগমে (মনে রাখা দরকার ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের সংগম-স্থলটি তখনো জেগে ওঠে নি)। ইউফ্রেটিস কিন্তু মন্দগতিতে চলেছে সমতটের ওপর দিয়ে, বর্ষার জলে তার দুকূল ভেসে যায়, ভূমি হয় উর্বরা। নদীর পাড়ের নিচে জল থাকে দীর্ঘকাল, সেই জলে জমির সেচ হয়। পক্ষান্তরে টাইগ্রিসের জলধারা ক্ষণিকের অতিথি রূপেই দেখা দেয়, যেন রাজ-অতিথি, প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে ফেঁপে ফুলে তার আবির্ভাব, দু দিন পর যখন চলে যায়, এতটুকু রসকষও তখন অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে প্রস্তরযুগের গ্রামগুলি ছিল ইউফ্রেটিসের তীরে, যদিও সে নদীটি টাইগ্রিসের চেয়ে অনেক বেশি চঞ্চলা, গতিমুখের পরিবর্তন হয়েছে তার অনেক বেশি বার। পরবর্তী কালে সুমের-আক্কাডের ওপিস ছাড়া সবগুলি নগরই গড়ে উঠেছিল এই ইউফ্রেটিস নদীর তটভূমির ওপর।

পূর্বদেশ থেকে আগন্তুকদের আগমনের পর প্রস্তরযুগের গ্রামগুলির স্থলে সুমের দেশের নগরসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম দিকে নগর ছিল কতগুলি কুঁড়েঘরের সমষ্টি, নলখাগড়ার বেড়া-দেওয়া কুঁড়ে, ক্রমে মাটির দেয়াল-যুক্ত বা রৌদ্রে-শুকানো ইঁটের গৃহনির্মাণ করা হয়েছিল। নগর-প্রতিষ্ঠা এবং সেই

নগরের বিবর্ধনকালের প্রতিটি ধাপের সঙ্গে পৌর মন্দিরের দেবতা ছিলেন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই আদিকালের শহরগুলির নাম লাগাস বা সিরপুরলা, উম্মা, উর, এরিডু, লারসা। এই শহরগুলির উত্তর দিকে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠাশালী নগর ছিল, যেমন কিশ, ব্যাবিলন, ইসিন, নিপ্‌পার। খনন-কার্যের দ্বারা প্রত্যেকটি শহরের পূর্বাপর ইতিবৃত্ত অল্পবিস্তর জানা গেছে। নগরগুলি ছিল প্রাকার-বেষ্টিত, নগর ও সংলগ্ন ভূখণ্ড নিয়ে একটি নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বতন্ত্র, গ্রীক পৌররাষ্ট্রের মতই স্ব স্ব প্রধান। ক্ষমতা লাভ বা আধিপত্য স্থাপনের জন্য এই রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ফলে, কখনো কোন রাজ্যকে যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা কিংবা অন্য উপায়ে পরাক্রান্ত হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব করতে দেখা যেত। আবার চাকা ঘুরত, যে ছিল নিচে সে ওপরে উঠত, আর উপরেরটি নিচে নামত। নগরগুলির এইসব উত্থানপতনের কাহিনীই সুমের দেশের ইতিহাস। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যের আক্রমণ উত্থানপতনের, বিশেষত পতনের একমাত্র কারণ নয়। সম-সংস্কৃতিবিশিষ্ট অভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদের এই কুমড়োর ফালির মত 'অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বর দেশ' ("The Fertile Crescent") পশ্চিমে সিরিয়া থেকে পূর্বে পার্বত্য অঞ্চলের ইলাম পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্বর সেমাইট জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। পারস্যের উত্তর ভাগে সেমাইটদের বাসভূমি ইলাম দেশ বেশ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, এবং মাঝে মাঝে এখানকার দুর্ধর্ষ পর্বতবাসীরা সুমের দেশের ওপর হানা দিত। আবার উত্তরাঞ্চলের আক্কাড প্রদেশ ও ব্যাবিলন নগরেও তেমনি সেমাইট জাতির চাপ বহির্দিক থেকে ক্রমাগত এসে পড়ছিল, এবং তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। প্রথমে আক্কাডে তার পর ব্যাবিলনে সেমেটিকরা তাদের প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

লাগাস উম্মা কিশ

প্রাচীন সুমেরের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে লাগাস সর্বপ্রধান হয়ে উঠেছিল। সৌভাগ্যক্রমে এখানে কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ ও শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে, তাই থেকে অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি—যুদ্ধবিগ্রহ, সামরিক অভিযান, সন্ধি, রাষ্ট্রের উত্থানপতন প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা, আর ধর্মকর্ম সংক্রান্ত

নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিষয়। এখানকার প্রাচীনতম লিপি-লেখনের কাল ৩৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ বলে ধরা হয়েছে। লিখনে তখন চিত্রলিপির ধাঁচ
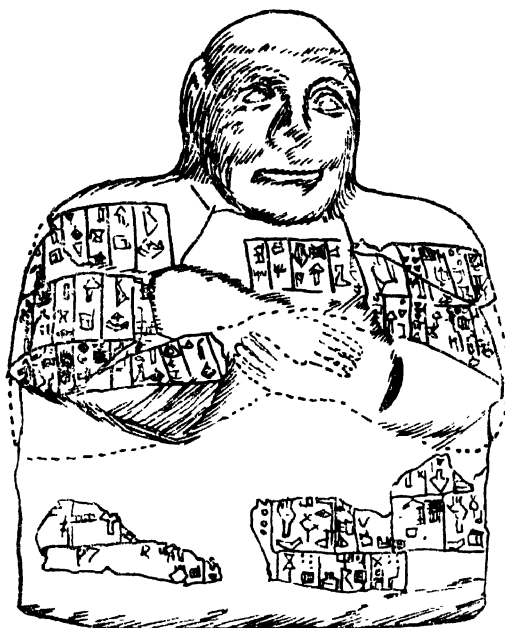
উম্মা নগরের উচ্চ কর্মচারী লুপাদ—শিলা-মূর্তির গাত্রে কিউনিফরম হরফে লাগাস (সিরপুরলা) নগরে জমি খরিদের বিবরণ লেখা

নেই, শব্দার্থের ব্যঞ্জনা শুরু হয়েছে। সুমেরীয় সংস্কৃতির সূত্রপাত নিশ্চয়ই এই সময়ের কয়েক শতাব্দী পূর্বে। ইতিহাসের সেই আবছায়া-ঘেরা প্রদোষে লাগাস শহরটিকে দেখা যায় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নয়, উত্তরাঞ্চলের কিশ নগরের অধীন রাজ্য হিসাবে। কিশের রাজা মেসিলিম ছিলেন অত্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত, হয়তো বা সমগ্র সুমের দেশের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলেন। প্রতিবেশী নগর-রাজ্য উম্মার সঙ্গে লাগাসের দীর্ঘকাল ধরে শত্রুতা চলে আসছিল। এই দুটি নগররাজ্যের মধ্যে চৌহদ্দি নিয়ে বিরোধ বাধে। তখন কিশের অধিপতি মেসিলিম মধ্যস্থ হয়ে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে একটি আপস-মীমাংসা করে দিয়েছিলেন, এবং সেই মীমাংসামত সন্ধির একটি লিপি-লেখন প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই তো গেল সন্ধির একটি সরল ও

স্বাভাবিক বিবরণ। কিন্তু সন্ধি-লেখনের মধ্যে আছে একটুখানি বিস্ময়কর বিশেষত্ব। সন্ধি হয়েছিল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে নয়, রাষ্ট্রপতিদ্বয়ের মধ্যেও নয়—সন্ধির পক্ষদ্বয় ছিলেন নগর দুটির প্রধান দুই দেবতা। সন্ধি প্রণয়নের জন্য যে দেব-সভার অধিবেশন হয়েছিল, তার সভাপতিত্ব করেছিলেন 'সমগ্র দেশের রাজা' দেবাদিদেব এনলিল। তাঁরই নির্দেশে লাগাসের নগর-দেবতা নিনগিরস্থ ও উম্মার নগর-দেবতা একত্র মিলিত হয়ে রাজ্য দুটির সীমানা নির্ধারণ করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কিশের অধিপতিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মীমাংসার কাজে অগ্রসর হন নি—তিনি তাঁর ইষ্টদেবী 'কাদি'-র প্রতিনিধিরূপে মধ্যস্থতার দ্বারা দুই পক্ষের বিরোধের অবসান করেছিলেন।

সুমের দেশের নগর-রাষ্ট্রের রূপ পূর্বোক্ত সন্ধি-লেখনে বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হয়েছে। রাজ্য ছিল 'ধর্ম-রাষ্ট্র' (theocratic state)। নগরের প্রকৃত অধিপতি ছিলেন নগর-দেবতা, শাসকও ছিলেন তিনিই। অবশ্য একজন মানব-নৃপতি বা পূজারী-শাসক রাষ্ট্রের ভার নিয়ে দেশ শাসনে নিযুক্ত থাকতেন। সুমেরীয়রা তাঁকে বলত 'পটেশী' (patesi) বা 'প্রজা-চাষী' (tenant farmer)। রাজা, পটেশী সকলেই ছিলেন নগর-দেবতার মন্ত্রী বা প্রতিনিধি, দেবতার অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করছেন তাঁরা, এই দাবি করতেন। নগর ছিল নগর-দেবতার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কর্মচারীরা বড় ছোট সকলেই এই দেবতার বেতনভোগী ভৃত্য। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তিনি, বিচার, সংযোগ-রক্ষা, কৃষি, যুদ্ধ, অর্থ সকল বিভাগের কার্য পটেশী পরিচালনা করেন দেবতার পক্ষে। কর্মচারীদের মাধ্যমে দেবতা স্বয়ং নিজের নামে প্রজাদের জমি বিলি করেন, ইজারা দিয়ে থাকেন। খাজনার শস্য আদায় করে গুদাম-জাত করে রাখা হয় তাঁরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে। যুদ্ধ বাধে দেবতার সঙ্গে দেবতার। নগরবাসীরা স্ব-স্ব দেবতার পক্ষে যোদ্ধা রূপে লড়াই করে।

রাজ-চক্রবর্তীরূপে লাগাসের ওপর প্রভুত্ব করতেন কিশের অধিপতি মেসিলিম। প্রমাণস্বরূপ যে গদা-মুণ্ডটি (mace-head) আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে লাগাসের পটেশী ছিলেন তখন লুগাল-সাগ্-এনগুর। এই পটেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন বৃত্তান্তই জানা যায় নি। গদা-মুণ্ডটি অতি বৃহৎ আকারের প্রস্তরখণ্ড, উৎকীর্ণ ছয়টি সিংহমূর্তি একটি আর একটির

পশ্চাদ্ধাবন করে পিছনের পা কামড়ে ধরেছে। এটি শিলালিপি। লাগাসে নিনগিরসু-দেবের মন্দির সংস্কার করে শিলালিপিটি সেখানে স্থাপন করেছিলেন মেসিলিম। সেকালের শিলালিপির একটি বিশেষ নমুনা এটি, সংক্ষেপে লেখা রয়েছে : 'নিনগিরসু-মন্দির নির্মাতা কিশের নৃপতি মেসিলিম এই গদা-মুণ্ডটি এখানে স্থাপন করেছেন নিনগিরসুর প্রীত্যর্থে, তখন লুগাল-সাগ্-এনগুর ছিলেন লাগাসের পটেশী'। একটি প্রস্তরপাত্রে খোদিত লিখন থেকে উতুগ নামে কিশের একজন পটেশীর কথা জানা যায়। সম্ভবত ইনি মেসিলিমের পূর্ববর্তী কোন শাসক, নিপ্পার নগর জয় করে লিখন-যুক্ত পাত্রটি দেবাদিদেব এনলিলের মন্দিরে রেখেছিলেন। এই পটেশীর আমল থেকেই কিশ পরাক্রান্ত রাজ্য হয়ে উঠেছিল, এবং আদিযুগের কিশের প্রভুত্ব মেসিলিমের মৃত্যুর পরও কিছুকাল টিঁকে ছিল। তারপর লাগাসের অভ্যুত্থানের সঙ্গে কিশেরও ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিয়েছিল।

কিশ নগররাষ্ট্রের অধিপতি মেসিলিম কর্তৃক লাগাসের দেবতা নিনগিরসুকে উৎসর্গীকৃত গদামুণ্ডে উৎকীর্ণ চিত্র—(উপরে) লাগাসের প্রতীক-চিহ্ন

লাগাস রাজ্যের শাসক উর-নিনা-কেই কিশের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত স্বাধীন রাজা রূপে দেখতে পাই আমরা। বিশেষ কোন যুদ্ধোদ্যমের পরিচয় পাওয়া যায় না এই রাজার, কোন সূত্রে তিনি সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন তা-ও জানা নেই। তবে তিনি যে রাজ্যের স্বাধীনতা অর্জন, অন্তত রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটি প্রখ্যাত শাসক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্মরণীয় তিনি। শান্তিকামী নৃপতি বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। যুদ্ধ না করলেও, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অবহেলা করেন নি তিনি, লাগাস নগরের একটি প্রাচীর-বেষ্টনী নির্মাণ করেছিলেন। এই বিজ্ঞ দূরদর্শী রাজার সুবিবেচনার ফলে বিরোধশূন্য শান্তির মধ্যে পৌর-রাষ্ট্রের

সমৃদ্ধি ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এবং সেই শক্তির প্রভাবেই তাঁর পৌত্র এয়ানাটুম আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন। উর-নিনা

লাগাসের অধিপতি উর-নিনা, পুত্র চতুষ্টয় ও পাত্রবাহক
অনিত—ধাতব অলংকারে খোদিত চিত্র

নামটি লাগাসের দেবতা নিনার নাম অনুসারে হয়েছে। তাঁর রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি বলে ধরা হয়।

শৌর্য-বীর্য-খ্যাতি-প্রতিপত্তির সুউচ্চ শিখরে উঠেছিল লাগাস এয়ানাটুম-এর রাজত্বকালে। উম্মার সঙ্গে লাগাসের যে সন্ধির কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই সন্ধির চুক্তি ভঙ্গ করল উম্মা লাগাসের ভূমি বলপূর্বক দখল করে। এরূপ ক্ষেত্রে উত্তেজনাবশে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু এয়ানাটুম তা করলেন না। বিপুল ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে অস্ত্র নির্মাণ, উপকরণ সংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন তিনি। তারপর নিনগিরসুর মন্দিরে গিয়ে দেবতার কাছে তিনি তাঁর অভিযোগ পেশ করলেন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। তখন তাঁর ঘটল দিব্য-দর্শন—স্বপ্নে নিনগিরসুর আবির্ভাব হল। অভয় দান করে দেবতা বললেন, 'বৎস, যুদ্ধে জয়লাভ করবে তুমি, সূর্য দেবতা বাব্‌বর তোমার দক্ষিণ পাশে অবস্থান করে সাহায্য করবেন।' নগর-দেবতার আদেশ পেয়ে মহা উৎসাহে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করলেন এয়ানাটুম উম্মার বিরুদ্ধে। সংগ্রাম বাধল—সে এক বিপুল সংগ্রাম। পরিশেষে লাগাস

জয়লাভ করল সম্পূর্ণভাবে। যুদ্ধের বিরাট হত্যাকাণ্ডে উম্মার তিন হাজার ছয় শ সৈন্য নিহত হয়েছিল বলে বর্ণনায় লেখা আছে—কেউ বা অঙ্কটিকে ছত্রিশ হাজার বলে পড়ে থাকেন। সংখ্যা যা-ই হোক, পর্বতপ্রমাণ ক্ষতি ভোগ করতে হয়েছিল উম্মাকে। এয়ানাটুম স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে 'সর্ব-ধ্বংসী ঝটিকার মত' ("like an evil storm") শত্রুর নগরে প্রবেশ করেছিলেন।

'শকুনি-স্তম্ভ' : এয়ানাটুম

উম্মার সঙ্গে লাগাসের পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং এই চরম পরিণতির কথা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভে—স্তম্ভটির নাম 'শকুনি স্তম্ভ' ("Stele of the Vultures")। যুদ্ধ জয়ের কীর্তিকে চিরকাল রক্ষা করবার

জালবান নিনগিরসু-দেব লাগাসের শত্রুদের বেড়া জালে ধ'রে গদাঘাত করেছেন—'শকুনি-স্তম্ভে'-র একাংশে খোদিত

জন্য এই স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন এয়ানাটুম। যুদ্ধের দৃশ্যগুলিও এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ। উপরিভাগে কতগুলি গৃধ্র নিহত শত্রুদের দেহ ঠুকরে খাবার প্রতীক্ষায় আছে—সেইজন্যই স্তম্ভের নামকরণ হয়েছে 'শকুনি-স্তম্ভ'। উৎকীর্ণ

এই ইটকখণ্ডের উপর লাগাসের পটেশী এয়ানাটুমের বংশ-তালিকা, যুদ্ধজয় ও কূপ-খননের বিবরণ লিপিবদ্ধ

লাগাসের পটেশী গুডিয়ার আসনে উপবিষ্ট প্রতিমূর্তি

(লুভার মিউজিয়াম)

দৃশ্যাবলী থেকে সৈন্যদের রণসজ্জা, ব্যূহ রচনা, আক্রমণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। একটি দৃশ্যে দেখা যায়, সারিবদ্ধভাবে যোদ্ধারা অগ্রসর হচ্ছে শত্রু-সেনা পদদলিত করে, আর রাজা চলেছেন সকলের পুরোভাগে। বর্মাবৃত সৈন্যদল, হাতে ঢাল ও বর্শা, ভল্ল বা কুঠার। ধনুর্বাণের ব্যবহার দেখা যায় না। আর একটি দৃশ্য : রাজা রথারূঢ়—গর্দভচালিত রথ—হস্তে দীর্ঘ ভল্ল ও গদা। রথের চূড়ায় লাগাসের প্রতীক-লাঞ্ছিত ধ্বজা। লাগাসের প্রতীকচিহ্ন—বিস্তৃত-পক্ষ ঈগল ও সিংহ। দেব-দেবীর উৎকীর্ণ মূর্তিও দেখা যায়—নিনগিরসু ও তাঁর পত্নী বাউ। তা ছাড়া আছেন রণচণ্ডী নিন্নি দেবী—ইনিই পরবর্তী কালের ব্যাবিলোনিয়ার ও আসিরিয়ার ইস্তার। যুদ্ধক্ষেত্রে এই দেবী নিনগিরসুকে শত্রুদলনে সাহায্য করেন। কিরূপে শত্রু নিধন করেছিলেন নিনগিরসু তারও একটি চিত্র আছে : শালপ্রাংশু মহাভুজ বিশাল নিনগিরসু বেড়া-জাল বিস্তার করে শত্রুদের ধরছেন মাছের মত, আর গদা-ঘাতে তাদের মস্তক চূর্ণ করছেন। চিত্রটির বিষয়বস্তু নিয়েই পরবর্তী কালের হিব্রুদের ধর্মগ্রন্থে জেলের জাল ও ব্যাধের পাশকে অবলম্বন করে কথাচ্ছলে অনেক রূপকের সৃষ্টি করা হয়েছিল।* স্তম্ভের লিপি-লেখনে রয়েছে, উম্মার পটেশী যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন উম্মার নগর-দেবতারই আদেশে—পূর্বের মত এবারও যুদ্ধ হয়েছিল দেবতার সঙ্গে দেবতার।

পরাজিত শত্রুর সঙ্গে সন্ধির শর্তগুলিও লেখা রয়েছে শকুনি-স্তম্ভের ওপর। দুই রাজ্যের মধ্যে একটি গভীর পরিখা খনন করে সীমানা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের একটি দৃশ্য সুমেরীয়দের সমাধি-প্রথার ওপর প্রচুর রশ্মিপাত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহগুলিকে একটির ওপর আর একটি সাজিয়ে রাখা হয়েছে আড়াআড়িভাবে—অর্থাৎ একটির

* শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 'জাল' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় :

য একো জালবান্ ঈশতে ঈশনিভিঃ
সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনিভিঃ।

এখানে 'জালবান্' শব্দের অর্থ 'মায়াবী'। শ্লোকের অর্থ, যে অদ্বিতীয় মায়াবী নিজ শক্তিসমূহ দ্বারা নিয়মিত করেন ইত্যাদি। হিব্রুদের ধর্মগ্রন্থে যেমন এখানেও ব্যাধের পাশকে অবলম্বন করে রূপকচ্ছলে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এরূপ মনে করা অসংগত নয়। এই প্রসঙ্গে 'পশুপতি' (পশু-পাশ-পতি) কল্পনার বিষয়ও উল্লেখযোগ্য।

মাথা যেদিকে সেদিকে রয়েছে আর একটির পদ, এইরূপে স্তূপাকারে রক্ষিত। দুইজন ব্যক্তি ঝুড়ি-ভরা মাটি মাথায় বয়ে আনছে সেই স্তূপটিকে চাপা দেবে বলে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহকারে সমাধির বিধান দেখা যায়। যূপকাষ্ঠে বদ্ধাবস্থায় আছে একটি বৃষ—মেষ বলি দেওয়া হয়েছে। তালবৃন্তযুক্ত মঙ্গল-ঘটে পূত বারি ঢেলে অর্ঘ্য দান করছে এক নগ্ন ব্যক্তি।

শকুনি-স্তম্ভের আর একটি দৃশ্যে বন্দী অবস্থায় কিশের রাজাকে দেখানো হয়েছে। শিলালিপির এক স্থানে বলা হয়েছে যে লাগাসের ওপর উম্মার আক্রমণ চলেছিল কিশের প্ররোচনায়। লাগাসের বর্ধমান শক্তি ও সমৃদ্ধি দেখে কিশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, এবং সেইজন্যই প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে লাগাসকে দুর্বল করবার চেষ্টা করেছিল। এয়ানাটুম উম্মাকে পরাজিত করে কিশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে কিশের পরাজয় ঘটে সত্য, কিন্তু বন্দীর যে মূর্তিটি দেখা যায়, সেটি কিশ-রাজের না হয়ে বদ্ধ দশায় কিশের প্রতীক-চিহ্নও হতে পারে। অন্য আর একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে: "লাগাসের পটেশী এয়ানাটুম নিন্‌নি-দেবীর অনুগ্রহে কিশ-রাজ্য লাভ করেছিলেন।" কথাটি থেকে মনে হয়, তিনি শুধু কিশকে পরাজিত করেই ক্ষান্ত হন নি, উত্তর রাজ্যের ওপর আধিপত্যও বিস্তার করেছিলেন। উত্তরাঞ্চলের আর একটি নগর ওপিস, সেই নগররাজ্যটিও অধিকার করেছিলেন তিনি। এয়ানাটুম উৎফুল্ল হয়ে বলছেন: "ইলাম দেশের মাথা ভেঙে দিয়েছেন এয়ানাটুম। বিতাড়িত হয়ে ইলাম স্বদেশে ফিরে গেছে। কিশের মাথা ভেঙে গেছে, আর ওপিসের রাজা বিতাড়িত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে।" এখানে বলা হয়েছে, ওপিসের রাজাই আক্রমণকারী—সম্ভবত লাগাসকে উম্মা ও কিশের সঙ্গে যুদ্ধে বিব্রত দেখেই ওপিসের এই আক্রমণ। এয়ানাটুমের যাবতীয় যুদ্ধের মধ্যে ইলামের পরাজয়কেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চিরাগত অভ্যাসমত ইলামই ছিল হানাদার, শিলালিপিতে সেই কথাই বলা হয়েছে। এরেক, উর, এরিদু প্রভৃতি সুমেরীয় নগর জয়েরও উল্লেখ রয়েছে।

পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন এয়ানাটুম। কিন্তু তাঁর কীর্তির গৌরব কেবল যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর যুদ্ধকাল দীর্ঘব্যাপী হয় নি, অল্প দিনের মধ্যেই শত্রু দমন করে গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করতে

পেরেছিলেন তিনি। যুদ্ধজয়ের ফলে অপরিমিত ঐশ্বর্য লাভ হয়েছিল, অনেক শস্যাদিও তিনি করায়ত্ত করেছিলেন। মন্দিরসমূহের শোভা-সৌন্দর্য বর্ধন করলেন সেগুলির সংস্কার করে, নগর-রক্ষার ব্যবস্থা করলেন দুর্গের প্রাকার-বেষ্টনী নির্মাণ করে। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ পূর্তকার্য, কৃষির জন্য নূতন খাল—যা তিনি নিনগিরসুকে উৎসর্গ করেছিলেন—আর একটি বৃহৎ জলাশয়। প্রয়োজনমত সেই জল ব্যবহার হত ভূমি সেচনের জন্য। জল সরবরাহের যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করেছিলেন এই প্রতিভাবান কর্মবীর নৃপতি, সেই জলসেচ প্রণালী আজও চলছে পৃথিবীতে, পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

এনান্নাটুম : এনটেমেনা

এয়ানাটুমের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা প্রথম এনান্নাটুম সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লাগাসের বংশানুক্রমিক শত্রু ছিল ইলাম ও উম্মা। এয়ানাটুম উম্মাকে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না করে করদ রাজ্য রূপে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। উম্মার সঙ্গে তিনি যে সন্ধি করেছিলেন তার একটি শর্ত ছিল এই যে উম্মা কদাচ লাগাস আক্রমণ করবে না। এয়ানা-টুমের মৃত্যুর পর সন্ধিপত্রের এই শর্তটি ভঙ্গ করলেন উম্মার পটেশী উরলুম্মা লাগাসকে আক্রমণ করে। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু লুণ্ঠন নয়, সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার। এনান্নাটুম যুদ্ধযাত্রা করলেন এবং অচিরে শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। যুদ্ধে এবারও উম্মার পরাজয় ঘটেছিল। কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও উম্মার পটেশী উরলুম্মা লাগাসকে বিব্রত করতে ছাড়েন নি।

এনান্নাটুমের রাজত্বের অবসানে লাগাসের সিংহাসন অধিকার করেন এনটেমেনা। রাজ্যলাভের পর তাঁর সর্বপ্রথম কাজই হল উম্মাকে দমন, যেহেতু উম্মা কর্তৃক লাগাসের ভূমি অধিকার তখনও চলছিল। প্রত্যন্ত দেশে উরলুম্মার অগ্রগতি রোধ করবার জন্য সসৈন্য অগ্রসর হলেন এনটেমেনা, এবং তখন বাধল একটি তুমুল যুদ্ধ। সমরে সর্বতোভাবে জয়লাভ করলেন এনটেমেনা, পরাজিত সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে উম্মা নগর অধিকার করলেন, এবং সেখানে উরলুম্মাকে বন্দী করে নিহত করলেন। যুদ্ধে তাঁরও যে প্রভূত লোকক্ষয় হয়েছিল, তার সাক্ষ্য পাঁচটি সমাধিস্তূপ—সেই স্তূপগুলির তলে

স্বপক্ষীয় সৈন্যেরা প্রোথিত হয়েছিল, আর শত্রুসৈন্যের মৃতদেহ শকুনি-গৃধিনীর খোরাক রূপে যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়ে ছিল।
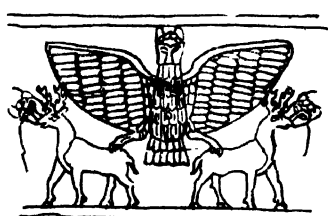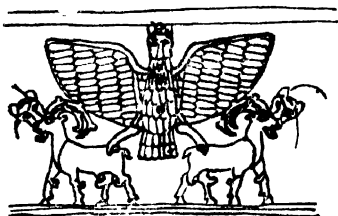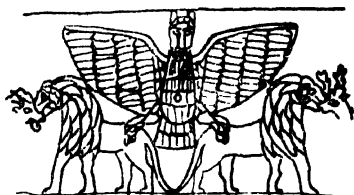
এনটেমেনার রৌপ্যপাত্রে খোদাই-করা চিত্র—(উপরে) লাগাসের প্রতীক-চিহ্ন—(নীচে) সিংহের পরিবর্তে প্রতীক-চিত্রে ইবেক্‌স্ ও হরিণ বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়

এনটেমেনা উম্মাকে এবার আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং সেখানকার পটেশী-পদে একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে বহাল করলেন, তাঁর নাম হুহু। এই নূতন পটেশীর কাজ হয়েছিল রাজার জন্য শস্য সংগ্রহ করে যথাকালে লাগাসে প্রেরণ করা। মেসিলিম ও এয়ানাটুমের মত, এনটেমেনাও তাঁর কীর্তিকাহিনী একটি স্তম্ভে খোদিত করেছেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বিবরণটি আপন বিজয়ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। লাগাস ও উম্মার মধ্যে মেসিলিমের আমল থেকে যে বিবাদ-বিসংবাদ চলে আসছিল তার পূর্বাপর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। স্মৃতিস্তম্ভটি (stele) এখন আর নেই, কিন্তু স্তম্ভের ওপর লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণের নকল ছিল কয়েকটি মৃৎখণ্ডে খোদাই করা, সেই চাকতিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে গৃহের ভিত্তিমূলে। চাকতিগুলিকে ভূগর্ভে প্রোথিত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন এনটেমেনা। বিবরণে দেখা যায়, তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বাহুবলে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

'ত্রাস-সঞ্চারী পাহাড়' : উরুকাগিনার সংস্কার বিধান

লাগাসে উরনিনার বংশের রাজত্ব শেষ হল এনটেমেনার পর ঠিক কোন সময় তা বলা যায় না। এনটেমেনার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় এনান্নাটুম-এর কালে চিরশত্রু ইলামের হানা আবার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। একদা এয়ানাটুম ইলামকে 'ত্রাস-সঞ্চারী পর্বত' বলে অভিহিত করেছিলেন ("the mountain that strikes terror")। সেই ভয়ংকর পার্বত্যদেশের দুর্মদ ঝঞ্ঝাশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এয়ানাটুম, কিন্তু উত্তরকালের লাগাসের আর তেমন সামর্থ্য ছিল না—কেননা অন্তর্বিরোধ আর বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে দেশ নির্বীর্য হয়ে পড়েছিল। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে লাগাসের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শেষ নৃপতি ছিলেন উরুকাগিনা, দ্বিতীয় এনান্নাটুম ও উরুকাগিনার রাজত্বের মধ্যবর্তী কালে তিনজন পটেশীর নাম পাওয়া যায়, তাঁরা এনেতারজি, এনলিতারজি ও

লাগাসের প্রতীক-চিহ্নের সঙ্গে পৌরাণিক বীরেন্দ্রবৃন্দ ও জীবজন্তুর চিত্র—
লাগাসের পটেশী লুগল আণ্ডার সিল মোহরে উৎকীর্ণ

লুগল আণ্ডা। এই তিনজনের শাসনকাল ছিল সংক্ষিপ্ত, সম্ভবত উরু-কাগিনা শেষোক্ত শাসকেরই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। উরুকাগিনা উর-নিনার বংশধর নন, কিরূপে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তা জানা যায় নি। কোন শিলালিপিতে তাঁর পিতার নামের উল্লেখ নেই। সিংহাসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বয়ং নিনগিরসু-দেব—শিলালিপির এই ভাষা থেকে

অনুমান করা যায় যে নিজের বাহুশক্তিবলেই প্রভুত্ব লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন উরুকাগিনা। বিপ্লবের কথা সে যুগের সুমেরের ইতিহাসেও আছে, কিশের একজন রাজা বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তেমনি হয়তো কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহের ফলেই উরুকাগিনা রাজপদের অধিকারী হয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই এই নৃপতির প্রধান কাজ হয়েছিল পূর্তকার্য, দেবমন্দির নির্মাণ এবং সর্বোপরি সমাজ-শাসন সংক্রান্ত বিধানগুলির আমূল সংস্কার। তিনটি লিখিত বিবরণ আবিষ্কৃত হয়েছে এই সংস্কারগুলির, যা থেকে জানা যায়, সমাজব্যবস্থার কিরূপ বিরাট পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি। পূর্বকালে দেশের অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ ছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শিলালিপির এক খণ্ডাংশে, সুদূর অতীত যুগ থেকে লাগাস রাজ্যে যেসব অত্যাচার-অবিচার চলে এসেছিল প্রজাপুঞ্জের ওপর তার একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। অন্য একটি খণ্ডে সংস্কার দ্বারা দেশের কিরূপ উন্নতিসাধন করেছেন উরুকাগিনা তারও একটি বর্ণনা আছে। এই দুইটি চিত্রে পুরনো ও নূতন সমাজব্যবস্থা যেরূপ নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত, তা থেকে আমরা সুমের দেশের সে সময়কার অর্থ-নৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে জানতে পারি। সুমেরীয় সভ্যতার মনোরম বাহ্য রূপের অন্তস্তলে যে কতখানি নগ্ন বীভৎসতা, শ্রেণী-বিভেদমূলক নির্যাতন আত্মগোপন করেছিল, এই প্রজাদরদী সমদৃষ্টিসম্পন্ন নিরপেক্ষ রাজার সে কথা অজানা ছিল না। ব্যাপক সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি, এবং তারই ফলে অর্থগৃধ্নু পূজারীদের জুলুমবাজি আর কর্মচারীদের অত্যাচার থেকে কৃষক, পশুপালক, ধীবর ও মাঝিরা উদ্ধার পেয়েছিল। দুর্নীতি দমন করেছিলেন তিনি অসাধু কর্মচারীদের বরখাস্ত করে, ব্যয় সংকোচ করেছিলেন তাদের সংখ্যা হ্রাস করে। পুরোহিতদের অন্যায় অর্থ দাবির পথ রোধ করেছিলেন তিনি, সমাধিকালে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফিস্ বেঁধে দিয়ে।* দুষ্টের

---

* "The priests themselves were deprived of many of their privileges, and their scale of fees was revised. Burial fees in particular were singled out for revision for they had become extortionate ; they were now cut down by more than half. In the case of ordinary burial when a corpse was laid in the grave, it had been the custom for the presiding

দমন আর শিষ্টের পালনই ছিল তাঁর মহাব্রত। পরাক্রান্ত ধনী প্রতিবেশী যেন দরিদ্রের ওপর অত্যাচার করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। দস্যুতা ও চৌর্য প্রভৃতি দুষ্কর্মের অভাব ছিল না তখন, দুর্বৃত্তদের জ্বালায় গৃহস্থের ঘরে হৃষ্টপুষ্ট মেষ, পুকুরে মাছ রাখবার উপায় ছিল না, কঠোর শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করে সমাজে তিনি শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। বিবাহবিচ্ছেদ প্রথাকে দুর্নীতিমুক্ত করেছিলেন, এবং পতিপরিত্যক্তা নারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ লাভের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

উরুকাগিনার বর্ণিত অনেক বিধানই পরবর্তী কালের হাম্মুরাবি প্রণীত আইন-গ্রন্থে (Code of Hammurabi) পাওয়া যায়। হাম্মুরাবি পূর্বাচরিত সুমেরীয় প্রথা ও আইনগুলিকেই বিধিবদ্ধ করেছিলেন। তেমনি উরুকাগিনাও হয়তো বা প্রাচীনতর কালের অবলুপ্ত বিধানগুলিকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন মাত্র। হাম্মুরাবি সূর্যদেবতার নিকট থেকে তাঁর আইন-গ্রন্থ পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন, আর উরুকাগিনা বলেছেন, নিনগিরসুর আদেশে তিনি সংস্কার-কার্যে ব্রতী হয়েছেন। হাম্মুরাবির মতই তিনি দাবি করেছেন যে তিনি দুর্বলের বান্ধব, স্বাধীনতার প্রবর্তক—লাগাসকে তিনি দুষ্কৃতিকারীর লুণ্ঠন হত্যা থেকে রক্ষা করেছেন। এয়ানাটুম ও এনটেমেনার মত তিনিও নগরের জল সরবরাহের উন্নতিসাধন করেছেন, পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেছেন এবং 'জলধির মত গভীর' জলাশয় খনন করেছেন।

উরুকাগিনার বিবরণ থেকে তাঁর রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা যায় না। তিনি সম্ভবত রাজ্য বিস্তার প্রচেষ্টা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ সংস্কার-কার্যে অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি দরিদ্র জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণসাধন করে তাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু

---

priest to demand as a fee for himself seven urns of wine or strong drink, four hundred and twenty loaves of bread, one hundred and twenty measures of corn, a garment, a kid, a bed and a seat. This formidable list of perquisites was now reduced to three urns of wine, eighty loaves of bread, a bed and a kid, while the fee of his assistant was cut down from sixty to thirty measures of corn."—*History of Sumer and Akkad* by L. W. King, p. 181-182

সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে অপরিমিত আগ্রহ সহকারে তিনি যে সমাজহিত ব্রতের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই অকালবোধনই তাঁর পতনের কারণ হয়ে উঠেছিল। দুর্নীতি দমন করে প্রতিপত্তিশালী ধনী শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করেছিলেন তিনি, এবং যেসব কর্মচারীর ওপর ছিল সেনাবাহিনী গঠনের ভার, তারাও তাঁর বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠল। ফলে, যুদ্ধ যখন আবার বাধল উম্মার সঙ্গে, উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করতে পারেন নি তিনি, এবং সেইজন্যই সম্ভবত তাঁর সাংঘাতিক পরাজয় আর উম্মার বিপুল জয়লাভ ঘটেছিল।

লাগাসের পতন : লুগল-জাগ্‌গিশি

লাগাস আক্রমণ করেছিলেন উম্মার পটেশী, লুগল-জাগগিশি। নগরটিকে তিনি ব্যাপকভাবেই বিধ্বস্ত করেছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় একটি শিলালিপির লেখনে। শিলালিপিখানা কোন রাজা বা রাজ-পুরোহিতের লিখিত নয়। এমন একজন সাধারণ লোকের লেখা সেটি, যার মনে আক্রমণকারীর নির্মম ধ্বংসকার্য প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। মন্দির-দাহ, রুপো মণিরত্ন শস্য লুণ্ঠন এবং অজস্র রক্তপাতের বর্ণনা দিয়ে লেখনটি বলছে, "লাগাস ধ্বংস করে নগর-দেবতা নিন্‌গিরসুর কাছে উম্মার অধিবাসীরা অপরাধী হয়েছে। যে শক্তি আজ তারা পেয়েছে, সে শক্তি তাদের থাকবে না। উরুকাগিনার কোন দোষ নেই। কিন্তু উম্মার পটেশী লুগল-জাগ্‌গিশি যে মহাপাপ করেছে, সেই মহাপাপের ভার যেন তার ইষ্টদেবী নিদবাকে বহন করতে হয়।" এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, নৃপতির কৃতকর্মের অপরাধ পড়েছে নগর-দেবতার স্কন্ধে এবং ফলভোগও করতে হবে তাকেই।

লুগল-জাগ্‌গিশি এরেক, লারসা ও উর, দক্ষিণ সুমেরের এই নগরগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। নিজেকে তিনি 'এরেকের (সুমের দেশের) রাজা' বলেই অভিহিত করেছেন। পটেশী বা পূজারী থেকে তিনি হয়েছিলেন রাজা। একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে, "এরেক নগরকে আনন্দোজ্জ্বল করে তুলেছেন তিনি ; ষণ্ডের মত উরকে উচ্চে তুলে ধরেছেন ; সূর্যদেবতার প্রিয় স্থান লারসাকে আনন্দবারি সিঞ্চনে সিক্ত করে

দিয়েছেন; দেবতার প্রিয় উম্মাকে পরম শক্তির সু-উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" লাগাসের পতনের পর সমগ্র দক্ষিণ সুমের নিয়ে একটি রাষ্ট্র-সমাহার (confederation) গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন এই নৃপতি। এরূপ রাষ্ট্র-সমাহার গঠনের প্রচেষ্টা পূর্বেও দেখা গেছে, একটি নগররাষ্ট্র যখন অন্যটির ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। সুমেরীয় নগরগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করে উম্মা থেকে রাজধানী এরেক নগরে স্থানান্তরিত করেছিলেন লুগল-জাগ্‌গিশি। একটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে: "তিনি নিম্নাঞ্চলের সমুদ্র (Lower Sea) থেকে ঊর্ধ্বাঞ্চলের সাগর (Upper Sea) পর্যন্ত সোজা পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।" 'নিম্নাঞ্চলের সমুদ্র' পারস্যোপসাগর নিশ্চয়ই, 'ঊর্ধ্বাঞ্চলের সমুদ্র' সম্ভবত 'উরুমিয়া' বা 'ভ্যান' হ্রদ। শেষোক্ত সমুদ্রের ব্যাখ্যা কোন কোন পণ্ডিত 'ভূমধ্যসাগর' বলেই করেছেন। কিন্তু আক্‌কাডীয় সম্রাট সারগনের পূর্বে ভূমধ্যসাগর অবধি বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ নেই। লুগল-জাগ্‌গিশির রাজ্য সুমের দেশেই ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। উত্তরাঞ্চলের আক্‌কাড প্রদেশে তাঁর আধিপত্য ছিল কিরূপ, তা সঠিক বলা যায় না।

রাজ্য-সমষ্টির রাজন্যবর্গ নিপ্‌পার নগরে এনলিল-দেবের মন্দিরে যে প্রস্তর-পাত্র প্রভৃতি উৎসর্গ করতেন, সেগুলির লিখন থেকে আমরা সুমের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কোন কোন রাজার নাম জানতে পেরেছি। 'এরেকের রাজা' বলে বর্ণিত একজনের নাম লুগল-কিগুব-নিদুদু, আর একজন 'উরের রাজা', নাম লুগল-কিসালসি। উভয়েই লুগল-জাগ্‌গিশির পরবর্তী কালের রাজা। 'সুমেররাজ' নামে অভিহিত এনসাগকুসন্না নামে জনৈক নৃপতির একটি শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে নিপ্‌পারে, তার ওপর লেখা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কথাগুলি পাঠ করা যায়: "এনসাগকুসন্না দুষ্ট কিশ (wicked Kish) থেকে লুণ্ঠিত ধন এনে দেবেন এননিল-দেবকে।" স্পষ্টই দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের কিশ নগরের সঙ্গে দক্ষিণস্থ রাষ্ট্রসমূহের বিরোধ আবার আরম্ভ হয়েছিল, এবং কিশের বিরুদ্ধে লাগাসের রাজা এয়ানাটুম পূর্বে যেমন অভিযান করেছিলেন, তেমনি অভিযান এখনো চলেছিল। এই সুমেরীয় রাজা কিশ ও ওপিস নগরদ্বয় লুণ্ঠন করে বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে এসেছিলেন, তার কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে।

দক্ষিণাঞ্চলে যেমন একটি রাষ্ট্র-সমাহার গঠিত হয়েছিল সুমের দেশে, উত্তর প্রদেশেও তেমনি কিশকে কেন্দ্র করে আর একটি রাষ্ট্র-গোষ্ঠী দানা বেঁধে উঠেছিল বলেই মনে হয়। এই দুটি রাজ্যসমষ্টির মধ্যে বিবাদ এবং যুদ্ধবিগ্রহ নিরন্তর চলছিল, যদিও তা গৃহযুদ্ধেরই নামান্তর। ইতিমধ্যে উত্তর-ভূমির নানান্ অঞ্চলে যাযাবর সেমেটিক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আরবের মরুদেশ থেকে, যেমন তারও পূর্বে ক্যানান (প্যালেস্টাইন) ও সিরিয়ায় এসে আদি-বাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সেমাইটরা। আক্কাডে সেমেটিক রাজ্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সারগন, কিন্তু সেই নূতন রাজ্যের আবির্ভাবের সূচনা দেখা দিয়েছিল কিছু আগে থেকেই। উত্তরকালে কিশের রাজারা ছিলেন সেমেটিক জাতীয়, তাদের শিলালিপি থেকেই সে কথা প্রতিপন্ন হয়। তা ছাড়া, একালে এখানকার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, সারগন যেমন নিজেকে দেবতার অবতার বলে প্রচার করেছিলেন, রাজাকে দেবতা জ্ঞানের সেই ভাবধারার সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি এখনই দেখা যায়। একটি শিলালিপিতে এই কথাগুলি লেখা আছে: "উরুমুস আমার দেবতা।" উরুমুস ছিলেন কিশের রাজা। শিলালিপিটি লিখিত হয়েছে তাঁরই জীবন-কালে, আর সেই সময়েই দেবতারূপে পূজিত হয়েছেন তিনি। নিপ্‌পারে এনলিল-দেবকে উৎসর্গীকৃত প্রস্তরপাত্রে খোদিত লিখন থেকে জানা যায় যে, এই নৃপতির পরাক্রম সুমের ও আক্কাড দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু "ইলাম ও বরাখসু দেশও জয় করেছিলেন তিনি।" সম্ভবত কথাটা অতিশয়োক্তি— দেশ দুটিতে অভিযান চালিয়েছিলেন মাত্র, স্থায়ীভাবে দেশ অধিকার করেন নি। তথাপি তাঁর বিপুল বাহুশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এই থেকে যে উপদ্রবকারী হানাদার ইলামীদের তিনি সুমেরীয় নগরগুলি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। কথিত আছে, রাজপ্রাসাদে বিদ্রোহের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কিন্তু তাঁর নাম উত্তরকালের ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় সাহিত্যে রক্ষিত হয়েছে, এ কথা বিবেচনা করলে প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর রাজত্বের গুরুত্বের বিষয় উপলব্ধি হয়।

মনিসটুস্সুর ওবেলিস্ক

কিশের আর একজন প্রধান রাজা মনিসটুসু। দেব-মন্দিরে উৎসর্গীকৃত প্রস্তরভাণ্ডে সামান্য একটু লিখন ছাড়াও, সুসা নগরে তাঁর একটি ওবেলিস্ক

(Obelisk) পাওয়া গেছে। মনিসটুস্থর এই সুবিখ্যাত ওবেলিস্কটি ঐতিহাসিক ঘটনাপরম্পরার ওপর যত না হোক, সেকালের রাজনৈতিক ও ভূমিস্বত্ব বিষয়ক ব্যবস্থাদির ওপর প্রচুর আলোকপাত করে। এই স্তম্ভটি সুসায় স্থানান্তরিত করেছিলেন পরবর্তী কালে শত্রুক-নাখ-খুনতে নামক জনৈক ইলামী নৃপতি, এবং সেটিকে সেখানে আবিষ্কার করেছেন প্রত্ন-তাত্ত্বিক দা' মরগ্যান ১৮৯৭-৯৮ সনে। ওবেলিস্কের ওপর লিখনগুলি ব্যাবি-লোনীয় সেমেটিক ধাঁচের, উনসত্তর স্তম্ভব্যাপী লিখন চতুষ্কোণ ওবেলিস্কের চার ধারে। কিশ ও উত্তর ব্যাবি-লোনিয়ার অন্যান্য তিনটি নগরে রাজা মনিসটুস্থ কর্তৃক ভূমি ক্রয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দেখা যায় ভূমি তখন আদিম গোষ্ঠী-সম্পত্তির পর্যায় থেকে মালিকী স্বত্বের ধাপে উঠতে শুরু করেছে।* এই স্বত্বের ক্রমবিবর্তন এবং ওবেলিস্কে ভূমি ক্রয়ের বিবরণ শেষ পরিচ্ছেদে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। এখানে আমরা রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ আর একটি বিষয়ের কথা বলব। ভূমি ক্রয় করে রাজা যেসব ব্যক্তিকে জমি বিলি করেছিলেন, তারা সকলেই 'আক্কাডের সন্তান' বলে বর্ণিত হয়েছে। উত্তর ব্যাবিলোনিয়ার বিভিন্ন নগরে 'আক্কাডের সন্তান'দের বসতির ব্যবস্থা করে সম্ভবত তিনি তাদের সংহত শক্তিকে মূল
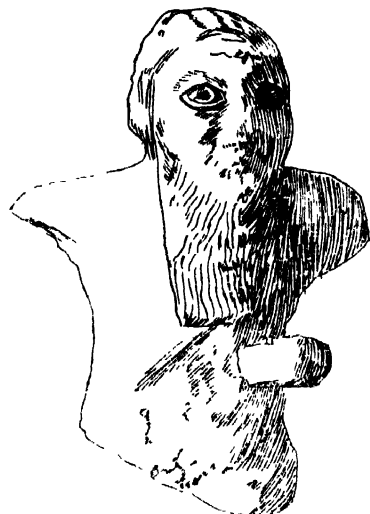
কিশ নগর-রাষ্ট্রের অধিপতি মনিসটুস্থর প্রস্তরমূর্তি—সুসায় প্রাপ্ত

* সমাজ বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে শিকার ও বন্য ফলমূল সংগ্রহ মানুষের জীবিকার উপায় ছিল। এই খাদ্য সংগ্রহের পর্যায়ে (food-gathering stage) মানুষের না ছিল শ্রেণী, না ছিল বিত্ত, গোষ্ঠী-সমাজে ছিল একরকম আদিম সাম্যবাদের (primitive communism) প্রচলন। তারপর কৃষি শিক্ষার পর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ের খাদ্যোৎপাদন (food production) শুরু হল, তখন দেখা দিল মালিকী স্বত্ব, কর্মবিভাগ, শ্রেণী-বিভাগ। ব্যক্তিস্বত্ব, কারিগরি, ব্যবসায় প্রভৃতির উদ্ভব প্রসঙ্গ এই গ্রন্থের অবতরণিকায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতেই চেয়েছিলেন। আক্কাডীয়দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অভিজাতবংশীয়, এবং তাঁরা স্বজাতীয় শ্রমিকদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন। রাজার ভূমি ক্রয়ের ফলে ৮৭ জন পরিদর্শক সহ ১৫৬৪ জন স্থানীয় শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছিল। রাজা তাদের প্রত্যেকেরই উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আক্কাডীয়দের দূরাঞ্চলে প্রেরণ, ভূমিদান ও বেকার-সমস্যা সৃজন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমস্যার মীমাংসা—এই বিষয়গুলি বিবেচনা করলে সন্দেহের বড় অবকাশ থাকে না যে, ব্যবস্থাগুলির মূলে রয়েছে একটি গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, এবং তা হচ্ছে আক্কাডের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দেশান্তরে প্রেরণ।

কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক, আক্কাড জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, এবং সে দেশ পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্রাট সারগনের রাজত্বকালে। আমরা এখন সম্রাটের বিস্ময়কর অভ্যুত্থান প্রসঙ্গ এবং রাজত্বের শেষ পরিণতির বিষয় আলোচনা করব।

॥ চার ॥

সম্রাট সারগন ও আক্‌কাডীয় নৃপতিগণ

সুমের দেশের উত্তরে আক্‌কাড অবস্থিত। একদা সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলেরই মহাত্রাস হয়ে উঠেছিল এই প্রদেশটি। পূর্বে বলা হয়েছে আক্‌কাডীয়দের সংহতি-শক্তি হরণ করবার জন্যই তাদের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছিলেন রাজা মনিসটুস্‌সু, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নির্বীর্য হয়ে পড়ে নি। যাযাবর জাতির বংশধর, বহু যুগ ধরে এ অঞ্চলে বসবাস করে তারা স্থিতিবান বাসিন্দায় পরিণত হয়েছিল। যাযাবর জাতির তেজ ও শক্তি প্রাচীন সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে তারই মধ্যে শিকড় গেড়েছিল, এবং সেইজন্যই তাদের রীতিনীতি অভ্যাস প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। যাযাবর শক্তিশালী হলেও, আসলে তার যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষা নেই—সে জানে শুধু হানা দিয়ে বিব্রত করতে। পক্ষান্তরে সুমেরীয় বাহিনীর ছিল রণশিক্ষা, সারিবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজের অভ্যাস। দীর্ঘকাল ধরে আরবের মরু অঞ্চল থেকে সেমেটিক জাতীয় যাযাবরদের অনুপ্রবেশ চলে আসছিল যেমন, সুমেরীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষও তাদের ঘটেছিল তেমনি। সেইসব খণ্ডযুদ্ধে সেমেটিকরা কোন দিন জয়লাভ করতে পারে নি, কেননা সুসম্বদ্ধ প্রণালীমত যুদ্ধ করবার শিক্ষা তাদের ছিল না। কিন্তু তারা ছিল আয়ুধবিদ্যায় পারদর্শী, আর সুমেরীয়দের ধনুর্বাণ ছিল না, তারা যুদ্ধ করত ঢাল বর্শা হাতে সারিবদ্ধভাবে। তীর-ধনু হস্তে দূর থেকে যুদ্ধ করত সেমেটিকরা, এবং এইটেই হয়েছিল তাদের পরিণামে জয়লাভের মুখ্য কারণ।*

খৃঃ পূঃ ২৬৫০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে নিরন্তর গৃহযুদ্ধের ফলে পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলির শক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, সেই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হয়েছিল আক্‌কাড দেশে একজন সেমেটিক যুদ্ধনেতার, তিনিই মহাবীর সার-গনি-সারি বা সারগন। সুমেরের দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ

* সুমেরীয় নৃপতি ডুঙ্গি-র পূর্বে তীরধনুর ব্যবহার শুধু সেমাইটরাই করত, এই প্রচলিত মতবাদ নির্ভুল নয় বলেই এখন প্রতিপন্ন হয়েছে (Sir Percy Syke's *History of Persia* p. 69)।

নিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু তার পূর্বে আপন সেনাবাহিনীকে নূতন পদ্ধতিমত শিক্ষা দান করে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিলেন। বর্শাধারী সুমেরীয় সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করতে পূর্বে কখনো পারে নি সেমেটিকরা, সারগনের সুশিক্ষিত ক্ষিপ্র তীরন্দাজ সেনার আক্রমণে সেই অপরাজেয় বাহিনীও ছত্রছন্ন হয়ে পড়েছিল। একে একে সমগ্র দেশের নগররাষ্ট্রগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, সারগন শক্তিকেন্দ্র কিশ থেকে আক্কাডে স্থানান্তরিত করলেন। তিনি ইলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, যুদ্ধে জয়ী হয়ে সুসা নগর অধিকার করেছিলেন, এরূপ নিদর্শন আছে সত্য, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল 'পশ্চিম দেশ'-এর দিকে, এবং প্রধানত তাঁর অভিযানগুলি পরিচালিত হয়েছিল সেই অভিমুখে। সম্ভবত সিরিয়ায় তখন আমুরু-দের বসবাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, এবং কয়েক শতাব্দ পরে আমরা দেখতে পাব এই আমুরু-রাই ব্যাবিলন অধিকার করে বসেছে। এক হিসাবে আমুরু-রা আক্কাডীয়দের স্বজাতি, উভয় জাতিই সেমেটিক, উভয়েরই আগমন আরব্য মরু-অঞ্চল থেকে। সারগন সিরিয়া জয় করে পশ্চিম দিকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। ভূমধ্যসাগরে তাঁর কোন নৌ-বাহিনী ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নি, যদিও প্রবাদ আছে, তিনি নাকি সাইপ্রাস দ্বীপেরও অধিস্বামী ছিলেন।

জগতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ-প্রদর্শক সারগন, সম্রাট বা রাজচক্রবর্তীর গৌরবময় পদের অধিকারী তাঁর পূর্বে বিশ্বজগতে আর কেউ হন নি। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি বীরবৃন্দের যশোগাথা লোকের মুখে ফিরে বেড়িয়েছে কত কাল, তেমনি সারগনেরও যশোগৌরবের মহিমা কীর্তিত হয়েছিল নানান্ কথিকায়, সেগুলি 'সারগন প্রবাদ-কাহিনী' (Legends of Sargon) নামে পরিচিত। এই সম্রাটের কোন কুল-গৌরব নেই, প্রবাদ এই যে তিনি একজন উদ্যানরক্ষকের পালিত পুত্র, তাঁর মাতা ছিলেন কোন মন্দিরের দেবদাসী। 'সারগন লিজেণ্ড'-এর যে কাহিনীটিতে সম্রাটের জন্ম-বৃত্তান্তের কথা বলা হয়েছে, তা এই : "আক্কাডের শক্তিশালী নৃপতি আমি সারগন ; আমার মাতা ছিলেন দরিদ্রা রমণী ; পিতাকে কখনো জানি নি। আমার পিতৃব্য ছিলেন পর্বতবাসী···দরিদ্রা মাতা আমাকে গোপনে জন্মদান করেছিলেন ; তারপর আমাকে একটি নলখাগড়ার ঝুড়িতে ভরে ঝুড়ির মুখ

বন্ধ করে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। ঝুড়ি চলল ভাসতে ভাসতে, সেই ঝুড়ি তুলে নিয়ে আমায় উদ্ধার করলেন আক্কি নামে একজন উদ্যানপাল। সেই মহানুভব উদ্যানপালই আমায় লালন-পালন করলেন, উদ্যানরক্ষার কাজে শিক্ষাদান করলেন। মালীর কর্ম করে ইসতার-দেবীর সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, তিনিই আমায় রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন।" দেখা যায় এটি পরবর্তী কালের রচনা, তাই সুমেরীয় দেবদেবীর পরিবর্তে ব্যাবিলনের ও আসিরিয়ার ইসতারকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়, ইহুদি জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা মোজেসের জীবন-কথা বাইবেলে যেমনটি লেখা রয়েছে তার সঙ্গে এই কাহিনীর আশ্চর্য রকমের সাদৃশ্য। জন্মের পর মোজেসকে তাঁর মাতা নলখাগড়ার ঝুড়িতে ('basket of reeds') ভরে নীল নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, মোজেসের এই জন্মবৃত্তান্তটি সহস্রাধিক বছরেরও আগেকার সম্রাট সারগন সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে লিখিত হয়েছিল, এরূপ মনে করা অসংগত নয়। অনেকে মনে করেন, বাইবেলে বর্ণিত রাজা নিমরড (Nimrod) যাঁকে বলা হয়েছে, 'প্রভুর অনুগৃহীত মহাপরাক্রান্ত শিকারী' ("mighty hunter of the Lord"), তিনিই সম্রাট সারগন।

জনশ্রুতি যা বলে এসেছে আর শিলালিপি যা লিখে রেখেছে, এই উভয় দিক থেকেই প্রমাণিত হয় যে, শুধু যশ বা কীর্তির মোহবশেই সারগন দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। যশোগৌরব ছাড়া দিগ্বিজয়ের একটি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। সারগনের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করা হয়েছিল যে বিদেশে বণিকেরা তেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা পায় না, পরন্তু তাদের ওপর নানারূপ উৎপীড়ন করা হয়।* দেখা

* "In the twenty-seventh century B.C. Sargon of Agade made a military expedition across the Taurus into Cappadocia, in response to an appeal from the Assyrian traders who had settled in the country and had fallen out with the local ruler. Clay tablets, impressed with business documents in cuneiform which have been found in Cappadocia by Western archaeologists, prove that these Assyrian settlements north-west of Taurus survived and flourished, and that like Assyria itself, they were included in the domain of the Empire of Sumer and Akkad." (A. G. Toynbee's *Study of History,* Vol. I. p. 110)

যায় বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জাতি-সমূহের নব আবিষ্কার নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই জগতের প্রথম সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। সারগনের এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি বিফল হয় নি। লেবাননের বন-সম্পদ, টরাস পর্বতের 'রুপোর ঢিবি' (mountain of silver), ওমানের তামার খনি, সবই তিনি অচিরে অধিকার করেছিলেন। বিস্তর লুণ্ঠিত ধন দেশে এনেছিলেন তিনি ও তাঁর বংশধরেরা। সেই ধনের কিয়দংশ ব্যয় করা হত অধীনস্থ নগররাজ্যগুলিকে বাহুবলে রক্ষার জন্য। পক্ষান্তরে, এই লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থের একটি সার্থকতাও যে দেখা যায় না, তা নয়। বিজেতা দলের সকল যোদ্ধবৃন্দ লুণ্ঠিত অর্থের অংশ লাভ করত, তাই যে বিপুল ধন-রত্ন ছিল পরাভূত দেশসমূহের কোষাগারে বদ্ধ, সেই অর্থ এখন ব্যাপকভাবে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ দান করল। এইভাবে, মধ্যম শ্রেণী ও ব্যবসায়ীর দল প্রভূত উপকৃত হয়েছিল। নূতন অর্থনীতি ভূমিকে ক্রয়বিক্রয়ের সামগ্রী করে তুলেছিল—মুদ্রা দিয়ে নয়, মুদ্রার ব্যবহার তখনো শুরু হয় নি। রৌপ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়েই ক্রয়বিক্রয় চলত। ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলির স্বাতন্ত্র্যই ছিল জাতির সংহতি ও সহযোগিতার পক্ষে একটি প্রকাণ্ড অন্তরায়, সেই ব্যবধান অপসারিত করে সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সারগন। এ কথা সত্য ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারণের জন্য দুর্মদ দাপট নিয়েই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম—কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মানবসভ্যতার অগ্রসরের পথে একটি বিশেষ কালে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, এবং সেই প্রয়োজন শেষ হয়েছে বলেই আমরা আজ তার উদ্গত নাভিশ্বাস চোখের ওপর দেখতে পাই।

আক্কাডের সেমিটিকগণ যাযাবর প্রকৃতি পরিত্যাগ করে স্থিতিবান হয়ে ইষ্টকনির্মিত গৃহে বসবাস আরম্ভ করেছিল। সুমেরীয়দের কিউনিফরম বা বাণমুখো লিখন-প্রণালী অভ্যাস করে নিরক্ষরতা দূর করেছিল তারা। নানা প্রকার কারিগরি ও শিল্পের কাজ শিখে নিতেও তাদের বিলম্ব হয় নি। সভ্য রাজ্যের প্রশাসন সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তাদের, এখন তারা সুমেরীয়দের কাছ থেকে রাষ্ট্র-পরিচালনা-কার্য শিক্ষা করল। এই সময়ের পাথরে উৎকীর্ণ মূর্তিসমূহে মুণ্ডিতমস্তক শ্মশ্রুগুম্ফহীন সুমেরীয়দের

দেখা যায় দীর্ঘকেশ বিলম্বিত-শ্মশ্রু সেমেটিক শাসকগণকে সাহায্য করতে—বেশ বোঝা যায় শাসন ব্যাপারে ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের প্রচেষ্টায় শাসকদের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছে সুমেরীয়রা। পুরাতন ও নূতন জাতির সমবেত উদ্যোগে তখন সংস্কৃতির পূর্ণতর বিকাশ ঘটেছিল—যা ছিল স্থির ও উদ্যমহীন তাই হয়েছিল গতিশীল ও সজীব। আক্কাডীয় শিল্পে সংস্কৃতির এই নব পরিণতি বিশেষভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ সে যুগের চোঙাকৃতি সিলমোহর (cylindrical seals)-এর ওপর অপরূপ কারুকার্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এরূপ উৎকৃষ্ট ধরনের কারু-শিল্প ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায় নি। সমগ্র দেশ একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত হয়েছিল বলে শাসনতন্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনের মান এতখানি উন্নত হয়ে উঠেছিল সারগনের আমলে যে নগরের সঙ্গে নগরের সংযোগ রক্ষার জন্য রাজপথ নির্মাণ করা প্রয়োজন হয়েছিল, এবং সেই পথ দিয়ে নিয়মিতভাবে পত্রবাহকেরা রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের মৃৎখণ্ডে লিখিত চিঠি নিয়ে যাতায়াত করত। এইরূপে জগতের সর্বপ্রথম ডাক-বহনের ব্যবস্থা করেছিলেন সারগন। মিশরে তখন পিরামিড নির্মাণের যুগ চলছিল। মিশরাধিপতি ফারাও (Pharaoh)-দের বাণিজ্যতরী ভূমধ্যসাগরের বন্দরে-বন্দরে দেখা যেত। আমরা বেশ অনুমান করতে পারি, সেই বাণিজ্যতরী মারফত ফারাওদের সঙ্গে সারগনের পত্র ব্যবহার চলত। সাম্রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ব্যবসা বিষয়ক লিখন-চাকতির (commercial tablets) ওপর হিসাবনিকাশের অঙ্ক থেকে জানা যায়, দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রচুর। আর চাকতির লিখনে দেখা যায়, সাধারণ পণ্যের মত বিভিন্ন দূর দেশ থেকে ক্রীতদাস আমদানি করে রাজ্যমধ্যে বিক্রি করা হত।

যে ব্যক্তি জাতিকে উন্নতির সোপানে তুলে দিয়েছে, দেশবাসীর হাতে এমন পুরুষসিংহের লাঞ্ছনা-নির্যাতন ভোগের দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নয়। জগতের ইতিহাসে সারগনই বোধ করি সর্বপ্রথম কর্মবীর যার জীবনে এমনি তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। তাঁর শেষ জীবন রহস্যপূর্ণ। সারগনের বংশধর নারাম-সিন তাঁর নামের উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি কোন লিপি-লিখনে। জন-

শ্রুতির প্রতিধ্বনি করে একটি চাকতি-লিখনে বলা হয়েছে, "রাজপ্রাসাদের আয়তন বৃদ্ধির দরকার হয়েছিল বলে অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিদের তিনি (সারগন) বসতবাড়ি থেকে উৎখাত করেছিলেন। এইসব উদ্বাস্তুরাই তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল।" আরও জানা যায় যে, 'রাজপ্রাসাদের পুত্রদের' (the sons of his palace), অর্থাৎ আত্মীয়পরিজনবর্গকে প্রাসাদের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূমি দান করেছিলেন তিনি। সম্ভবত শুধু এই পরিজন-ভরণ নীতিই অভিজাতবর্গের ব্যাপক উচ্ছেদের কারণ ছিল না। ইতিপূর্বে কিশ-রাজ মনিসটুস্থ যেমন আক্কাডীয়দের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, সারগনও তেমনি কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বিরুদ্ধপক্ষীয় অভিজাত সম্প্রদায়কে দেশ থেকে নির্বাসিত করেছিলেন বলে মনে হয়। পরবর্তী কালে আসিরিয়ার সম্রাটেরা যে নির্বাসন নীতির অনুসরণ নির্মমভাবে করেছিলেন, সমগ্র ইহুদি জাতিকে প্যালেস্টাইন থেকে বহিষ্কৃত করে, কিশ ও আক্কাডই সেই কঠোর নীতির আদিগুরু। ক্ষণকালের জন্য সফল হলেও, স্থায়ীভাবে এই নীতি অনুসরণের বিপদ আছে। প্রধূমিত অসন্তোষ যে বিদ্রোহ প্রজ্বলিত করেছিল, বৃদ্ধ বয়সে সারগন সেই দাবানলে দগ্ধ হয়েছিলেন। জনৈক লেখক লিপি-লেখনে বলেছেন, "সারগনের পাপকার্যের জন্য দেবতা মারডুক ক্রুদ্ধ হয়ে দুর্ভিক্ষ দ্বারা প্রজাদের ধ্বংস করেছিলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রজাবৃন্দ সারগনকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম দান করে নি।"

নূতন একটি চিন্তাধারার প্রবর্তক ছিলেন সারগন—দেবতার গুণ ও অধিকার দাবি করেছিলেন। সুমের দেশে রাজ্য সংগঠনের আদিযুগে শাসকেরা নিজেদের রাজা নামে অভিহিত করতেন না। তাঁরা ছিলেন 'পটেশী', অর্থাৎ দেবতার ইজারাদার প্রজা ('tenant farmer')। এই নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র দু এক ক্ষেত্রে ঘটেছিল। সারগন নিজেকে শুধু 'রাজা' নামে অভিহিত করেই ক্ষান্ত হন নি, দেবতার অবতার—'আক্কাডের দেবতা' (god of Akkad)—বলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উত্তর-বংশীয়রাও রাজাকে সেই উচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন। রাজার ওপর দেবত্ব আরোপের এই বিধানটির যথোচিত ব্যবহার বা অপব্যবহার করতে পরবর্তী কালের উর বংশীয় নৃপতিরাও কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নি।
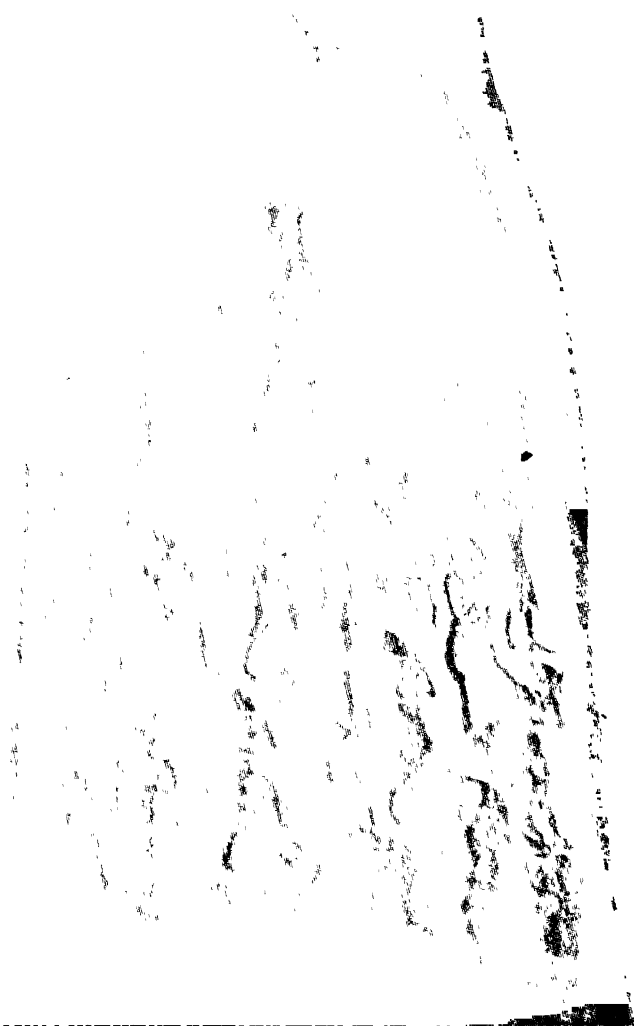
নারাম-সিনের প্রস্তর-স্তম্ভ—যুদ্ধ-জয়ী আক্কাড-রাজ ও তাঁর অনুগামীগণ শত্রু-নিধন কার্যে রত

(ক) উরের মোজাইক পতাকা

(খ)
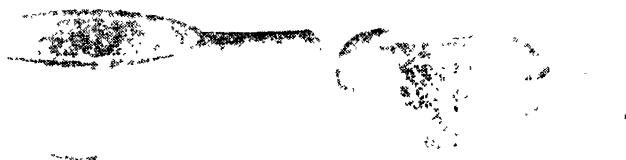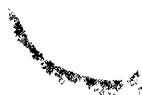
(গ)

(খ) ও (গ) সমাধিগর্ভে প্রাপ্ত রানী শুব-আদের স্বর্ণপাত্র

নারাম-সিন-এর স্তম্ভ

সারগনের পরবর্তী রাজা নারাম-সিন। সারগনের পুত্র বলেই কথিত হয়েছেন তিনি, যদিও তাঁর শিলালিপিগুলিতে পিতার নামের উল্লেখমাত্রও নেই। পিতার মতই দিগ্বিজয়ী বীরের খ্যাতি তিনি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর 'চতুর্দিঙ্‌মণ্ডলের অধীশ্বর' (king of the four quarters of the world) বলে নিজেকে প্রচার করেছেন, যা থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল কিরূপ, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি 'মগন' দেশ জয় করেছিলেন, কিন্তু এটি কোন দেশ তা নির্ধারিত হয় নি। ইলাম যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, সেই বিদ্রোহ তিনি দৃঢ় হস্তে চূর্ণ করেছিলেন, এবং সুসার শাসনভার একজন সুযোগ্য ইলামী কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। এই শাসকের নাম পুজুর ইনসুশিনক, আক্কাডীয় বংশের পতনের পর ইনি ইলামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। নারাম-সিন তাঁর বিজয়কাহিনী স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন একটি স্মৃতিস্তম্ভে (Stele of Naram-Sin)। স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রতিকৃতিগুলি শ্রেষ্ঠ ব্যাবিলোনীয় ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন। দিগ্বিজয়ী চলেছেন পার্বত্য দেশে শত্রু ধ্বংস করতে—দীর্ঘাকৃতি রাজা পর্বতশিখরে দণ্ডায়মান, মাথায় শৃঙ্গযুক্ত শিরোভূষণ, হস্তে কুঠার ধনুর্বাণ। ধ্বজাধারী সৈন্যদল তার পিছু-পিছু পাহাড়ে উঠছে। শত্রুরা পলায়নপর, কেউ বা প্রাণ ভিক্ষা করছে। শরবিদ্ধ ভূপাতিত শত্রুসৈন্য রাজার সমুখে, একজনের বক্ষে পদস্থাপন করেছেন তিনি। গগনস্পর্শী পর্বতশৃঙ্গের উপরিভাগে নক্ষত্রের ঝিকিমিকি দেখা যায়।

এই স্মৃতিস্তম্ভটি আবিষ্কৃত হয়েছে পারস্যের সুসা নগরে। নারাম-সিন-এর বিবরণ ছাড়াও স্তম্ভে ইলামী রাজা শত্রুক-নাখ্-খুনতের খোদিত শিলালিপি দেখা যায়। মনিসটুসুর ওবেলিস্কের সঙ্গে এই স্তম্ভটিও ইলামে বহন করে এনেছিলেন শত্রুক-নাখ্-খুনতে, ব্যাবিলনে ক্যাসাইটদের রাজত্বকালে। শিলা-লিপির বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাজ্যশাসন ব্যাপারে নারাম-সিন তাঁর পিতার পদ্ধতিকেই গ্রহণ করেছিলেন—শাসন কেন্দ্রীভূত ছিল তাঁর নিজেরই হাতে, পত্রবাহকের ব্যবস্থাও পূর্ববৎ রাখা হয়েছিল। মন্দিরনির্মাণ-কার্যে তাঁর ছিল যথেষ্ট উৎসাহ। নিপ্পারে এনলিলের মন্দির, সিপ্পারে সামাসের মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তিনি। টাইগ্রিস নদীর উত্তরাঞ্চলে

দিয়ারবেকর নামক স্থানে নারাম-সিনের একটি বিজয়-স্তম্ভ (Dierbekr Stele) আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি এখন ইস্তাম্বুলের মিউজিয়ামে রক্ষিত। এই

দিয়ারবেকর প্রস্তর-ফলকে খোদিত আক্কাড-রাজ নারাম-সিন-এর প্রতিমূর্তি—ইস্তাম্বুলের মিউজিয়মে রক্ষিত

প্রস্তর-ফলকে রাজার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রয়েছে, কিন্তু যে অংশে ছিল শিলালিপি তা ভেঙে গিয়েছে। দেখা যায়, এই দূর দেশেও নারাম-সিন তাঁর রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নারাম-সিন-এর উত্তরাধিকারীদের বিষয় আমরা বিশেষ অবগত নই। তাঁর পুত্র বিন-গনি-সারি-র নাম একটি সিলমোহরে পাওয়া গেছে, কিন্তু আর কোন তথ্যই আবিষ্কৃত হয় নি। সম্ভবত প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট পৌর-রাষ্ট্রগুলির বিদ্রোহের ফলেই আক্কাডীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছিল। এই সময়কার সুমেরীয় ইতিহাসের কুহেলী-আবরণ যখন মুক্ত হল তখন দেখা গেল,

লাগাসের পুনর্জাগরণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি, নূতন শিল্প-সৃষ্টি এবং নব-প্রতিষ্ঠিত উর-রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির মহিমাময় পথে জয়যাত্রা। লাগাস ও উর সম্বন্ধে আলোচনা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে করব।

পূর্বে বলা হয়েছে, আক্কাডীয় যুগে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের ফলে শিল্প-জগতে নবসৃষ্টির উন্মেষ হয়েছিল। সুমেরীয় ভাস্কর্য আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল শৈলী-নিয়মের গ্রন্থি (conventions) দিয়ে। এখন সেই আঁটসাঁট ভাব কেটে গিয়ে শিল্পের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল। নারাম-সিন-এর স্মৃতি-ফলকে (stele) মূর্তিগুলির রেখার ব্যঞ্জনা যেমনধারা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তেমনটি পূর্ববর্তী যুগের 'শকুনি-স্তম্ভ' বা অন্য কোন ভাস্কর্যে দেখা যায় না, মূর্তির এমন ভঙ্গিমা ও রূপসজ্জা যার তুলনা পূর্বকার শিল্পে নেই। সারগনের লেখক (scribe) ইব্‌নি-সারু-র চোঙা-সিলমোহরে 'উপবিষ্ট-বীরবৃন্দ-ও-জলপানরত-বৃষে'র মূর্তি খোদিত রয়েছে—খোদাই-শিল্পের বিস্ময়কর উৎকর্ষের একটি চমকপ্রদ নিদর্শন এই সিলমোহর।

॥ পাঁচ ॥

'সুমের ও আক্কাড রাজ্য'

আমরা দেখেছি, যুগ-যুগান্তের ক্রম-পরিণতির ফলে প্রধান গ্রামগুলি নগর-রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবার পর, রাষ্ট্রগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ যুদ্ধবিগ্রহ বেধে গিয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে একের ওপর অন্যের প্রাধান্য স্থাপনের পালাও শুরু হয়েছিল। প্রাধান্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল কখনো উত্তরাঞ্চলের কিশ নগর, কখনো বা দক্ষিণ দেশের সুমেরীয় নগরসমূহের হস্তে। পরিশেষে বিবদমান পক্ষগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আক্কাডের সেমিটিকগণ সারগনের অধিনায়কত্বে একটি সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কিশ রাজ্য ও আক্কাডীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন মূলগত প্রকৃতির প্রভেদ ছিল না, তারতম্য যা কিছু শুধু আয়তনের। দক্ষিণাঞ্চলের লাগাস, উর প্রভৃতি নগরগুলি সারগনের বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন অব্যাহতই ছিল। আক্কাডীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে নগরসমূহের স্বাধীনতার ওপর যা কিছু বাধাবন্ধ আরোপিত ছিল সবই অন্তর্হিত হল, কিন্তু সেখানে পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি আর ঘটে নি। প্রাক-সাম্রাজ্য যুগের প্রাচীন আদর্শকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টার ত্রুটি হয়েছে, এমন নয়—প্রাচীনপন্থীর রক্ষণশীল উগ্র মনোভাব তখনো ছিল আজকের মতই বিদ্যমান—কিন্তু যে নবশক্তির অনুপ্রেরণা আক্কাডীয়দের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে জেগে উঠেছিল, সুমেরকেও উদ্বেল করে তুলেছিল সেই নবীন উদ্দীপনার তরঙ্গাভিঘাত, এবং সেই কারণেই সংকীর্ণ বদ্ধ দুষ্ট প্রাচীন পরিমণ্ডলের পুনরুৎপাদন আর সম্ভব হয় নি। তাই নবজাগরিত সুমের রাষ্ট্র উর-কে দেখা যায় সম্রাট সারগনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হতে। আর দেখা যায়, লাগাসের শিল্প-প্রতিভা পুরনো বাঁধনগুলিকে ছিঁড়ে ফেলে নব উদ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছে, নারাম-সিন-এর ভাস্কর্যের সূক্ষ্ম রূপরেখার সৃজন-কৌশলকে আয়ত্ত করে।

নারাম-সিন-এর মৃত্যু ও উর বংশের অভ্যুত্থানের মধ্যে ব্যবধান কত বৎসর, তা ঠিক বলা না গেলেও এখন একরকম নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে আক্কাডীয় বংশের পতনের সঙ্গেই এরেকে একটি রাজবংশ অল্পকালের

জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং ইলামের শাসনকর্তা পুজুর ইনসুশিনক স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর পারস্যের পার্বত্য অঞ্চলের লুলুবি ও গুটি উপজাতিদের উপর্যুপরি আক্রমণ ঘটেছিল, এমন কি উত্তর ও দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়ায় গুটিদের আধিপত্যও স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু এই সময়কার কয়েকজন রাজার নাম ছাড়া কোন বিবরণই পাওয়া যায় নি। গুটিরা ছিল বর্বর জাতীয় সেমাইট, তাদের শেষ রাজা তুরিকান এরেকের অধিপতি উতুখেগান কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। এইরূপে শুরু হয়েছিল সেমেটিকদের বিরুদ্ধে সুমেরীয় প্রতিক্রিয়া এবং তারই ফলে অচিরেই প্রাচীন রাষ্ট্রগুলির পুনর্জাগরণ, বিশেষত তৃতীয় বংশীদের রাজত্বকালে উর রাজ্যের পরম সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

আমরা এখানে প্রসঙ্গত তিনটি সুমের রাজ্যের কাহিনী বর্ণনা করব। সেই তিনটি রাজ্য : (ক) উত্তরকালের লাগাস, (খ) উর, (গ) নিসিন বা ইসিন ও লারসা।

(ক) উত্তরকালের লাগাস : গুডিয়া

ইতিপূর্বে লাগাসের উত্থান-পতনের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উরুকাগিনাই ছিলেন শেষ নৃপতি—তাঁর পর আর কেউ লাগাসের রাজদণ্ড ধারণ করে নি। শাসকেরা ছিলেন 'পটেশী'। তেমনি কয়েকটি পটেশীর সাক্ষাৎ পাই আমরা এই সময়ের মধ্যে—সংখ্যায় তারা বারোজন, অনেকেই অখ্যাতনামা। আক্কাডের রাজশক্তি তখন শিথিল হয়ে পড়েছিল বলে লাগাসের পটেশীরা সম্রাটের অধীন ছিল নামমাত্র। তথাপি নিজেদের তারা 'রাজা' না বলে 'পটেশী' নামেই অভিহিত করেছেন। উরের রাজ্যবিস্তারের প্রাক্কালে লাগাসের শাসনকর্তা ছিলেন গুডিয়া। এই প্রখ্যাত পটেশীর খ্যাতি দিগ্বিজয়ী বীরের বাহু-বিক্রমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অতুলনীয় কীর্তি অর্জন করেছিলেন তিনি শান্ত পরিমণ্ডলে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা আর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের পরিকল্পিত শিল্প-রূপের উৎকর্ষ সাধন করে। অনেক দেবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন তিনি এবং সেইসব মন্দিরের নির্মাণ-কাহিনী কি শিলাখণ্ডে কি মাটির চাকতি বা চোঙা (cylinder)-র ওপর লিপিবদ্ধ করে প্রথামত সেগুলি ভিত্তিমূলে প্রোথিত করে রেখেছিলেন।

মন্দিরের ভিত্তিমূল থেকে এই শিলালিপিগুলিকে উদ্ধার করে গুডিয়া সম্বন্ধে নানান্ তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। শিলালিপিগুলির ভাষার লালিত্য ও বর্ণনার বৈচিত্র্যকে অভিনবই বলতে হয়। একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কোথাও গুডিয়ার পিতার নামের উল্লেখমাত্র নেই, কোন অখ্যাত কুলে, হয়তো বা দুষ্কুলেই তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর শাসনকালে লাগাস যেমন প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিল, এত সমৃদ্ধি পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। পুরাকালে লাগাসের নৃপতিরা প্রতিবেশী রাজ্য জয় করে লুণ্ঠিত সম্পদ দিয়ে রাজধানীর শ্রীবৃদ্ধি করতেন। ইলামের আনসান প্রদেশে গুডিয়া একবার যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর কোন দ্বিতীয় অভিযানের প্রমাণ নেই। সুতরাং স্বতই প্রশ্ন ওঠে, লাগাসের বিপুল সমৃদ্ধি কোথা থেকে আহরণ করলেন গুডিয়া, কিরূপে? এ-নিন্নু মন্দির নির্মাণ-কার্যে কাষ্ঠ, প্রস্তর, তাম্র, স্বর্ণ প্রভৃতি নানান দ্রব্য ব্যবহার করেছিলেন নানান স্থান থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে, তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন একটি শিলালিপিতে। সিরিয়ার উপকূলবর্তী স্থানসমূহ ও আরবের পাহাড় অঞ্চল থেকে আমদানি করা হয়েছিল কাষ্ঠ ও পাথর, ইলামের খনি থেকে তাম্র। নির্মাণ-কার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল সুসা নগরের কারিগরদের। দূরদেশ থেকে কাঠ, পাথর, তাম্র, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি বহন করে নিয়ে আসা যাতে সহজসাধ্য হয় সেজন্য তিনি দুরধিগম্য পার্বত্য অঞ্চলে পথ নির্মাণ করেছিলেন, জলপথে দ্রব্যসম্ভার বহনের জন্য জলযানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—এইসব বিবরণ লেখা রয়েছে একটি চোঙার ওপর।

গুডিয়ার শিলালিপিগুলিতে দূরদেশে অবস্থিত নানান স্থানের কথা আছে, কিন্তু সুমের ও আক্কাডের নগরগুলির কোন উল্লেখ নেই, এমন কি প্রতিবেশী নগর উর, এরেক, লারসারও নয়। এই ব্যাপার থেকে অনুমান করা হয়েছে, ঐসব নগরের ওপর গুডিয়ার কোন আধিপত্য ছিল না, এবং বিদেশ থেকে যে ধনরত্ন আহরণ করেছিলেন তিনি, সেগুলি রাজনৈতিক প্রভুশক্তি বিস্তারের ফল নয়, বাণিজ্য-লব্ধ দ্রব্য। উত্তরে আক্কাডের সেমেটিক রাজশক্তি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, আর দক্ষিণে উরের নগর-রাষ্ট্র সবেমাত্র শক্তিমান হয়ে উঠে ভাবী 'সুমের ও আক্কাড রাজ্যে'র ভিত্তিপত্তনের উদ্যোগ করছিল মাত্র। এরূপ অবস্থায় গুডিয়া ও উর বংশের প্রতিষ্ঠাতা উর-এঙ্গুর উভয়েই একই
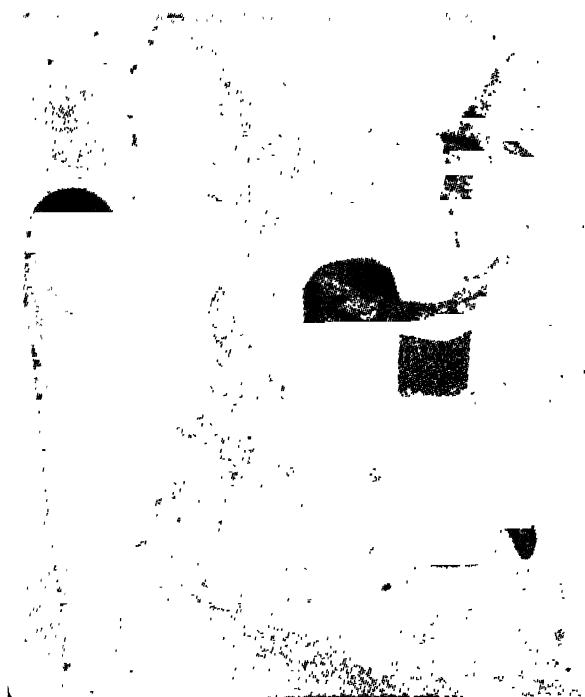
(ক) দুটি দেবতার মূর্তি
হস্তে ধৃত ব্রজ্র মুষলখ
উপর লাগাসের প
গুডিয়ার অর্ঘ্য নিবে
উৎকীর্ণ

(খ) 'কুদুরুক' বা ক্যাসাইটদের ভূমি
সীমা-চিহ্নের পাথর
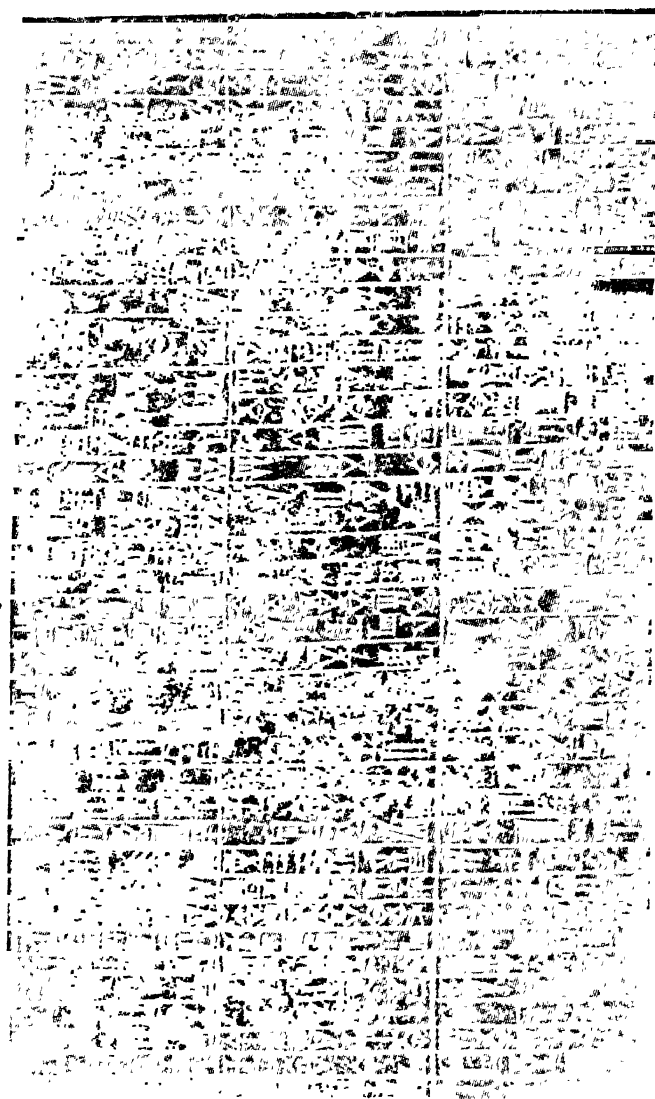
শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ 'হাম্মুরাবির কোড'-এর একাংশ—৬,৭,৮ স্তম্ভের প্রতিলিপি

রকমের স্থাপত্যের চর্চায় কৃতিত্ব অর্জন করবার বিলক্ষণ সুযোগ লাভ করেছিলেন। দেখা যায়, লাগাস ও উর উভয় জনপদেই এই সময়ে একই রকমের ইষ্টক প্রস্তুত প্রণালী প্রবর্তিত হয়েছিল। ইট তৈরি করা হত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহকারে দেবতার উদ্দেশে বলি ও অর্ঘ্যদান করবার পর। এই দাবি করে গেছেন গুডিয়া যে, নব-রূপের সৃষ্টি করে স্থাপত্যশিল্পের এমন শ্রীবৃদ্ধি করতে তাঁর পূর্বে কোন পটেশীই সক্ষম হন নি। সম্ভবত সাততলা ধর্মমন্দির যাকে বলে 'জিগ্‌গুরাট' (Ziggurat)—নির্মাণ করেছিলেন তিনি।* মন্দিরগুলির যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন গুডিয়া, তাই থেকে আমরা তদানীন্তন সুমেরীয় ধর্মজীবনের বিশেষ পরিচয় লাভ করেছি। ধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম ও দেব-পূজাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত নাগরিকের জীবন, এবং সেই হিসাবে ধর্ম জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। গুডিয়ার রাজত্বের কোন বছরে অনাবৃষ্টির ফলে দেশে হয়েছিল অজন্মা, দুর্ভিক্ষ আকাল দেখা দিয়েছিল। দেবতার কোপ শান্তি করবার উদ্দেশ্যে গুডিয়া তখন নিনগিরসু-দেবের এ-নিনু মন্দির নির্মাণ করেন—সেই প্রসঙ্গে তাঁর স্বপ্ন-দর্শনের উল্লেখ রয়েছে একটি বিবরণীতে। স্বপ্নে দেবতার আবির্ভাব হল। নিনগিরসু-দেবের আদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা নগরীকে পরিশুদ্ধ করলেন গুডিয়া সুগন্ধি সিডার-কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করে, তারপর আরম্ভ করলেন মন্দির নির্মাণ। সেই কার্য শেষ করে নববর্ষের কোন নির্ধারিত দিবসে দ্বিতীয়বার নগর-পরিশুদ্ধি করলেন তিনি। তখন পাত্রমিত্র, পরিজন, দেবগোষ্ঠী ও যানবাহন সহ নিনগিরসু-দেব ও তাঁর পত্নী বাউ-দেবী নূতন মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

গুডিয়ার যুগে ভাস্কর্যও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। টেলো নামক স্থানে আবিষ্কৃত প্রাসাদে গুডিয়ার কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে, অনেকগুলি অতি-বৃহৎ (colossal) আকারের, জীবনের বিভিন্ন কালের

---

* "One of the most novel of his (Gudea's) reconstructions was the E-pa, the temple of the seven zones, which he erected for Ningirsu. Gudea's building probably took the form of a tower in seven stages, a true Ziggurat, which may be compared with those of Ur-Engur." (*History of Sumer and Akkad* by L. W. King—p. 264-265)

প্রতিকৃতি। একটি উপবিষ্ট মূর্তি ছাড়া অন্য সবগুলিই মস্তকহীন। উপবিষ্ট মূর্তিটির মস্তকও স্কন্ধচ্যুত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল, পরে সেটিকে দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। মূর্তিটির ফটোগ্রাফ দেখলেই বোঝা যায়, মাথার আকার দেহ অপেক্ষা বিসদৃশভাবেই বৃহৎ। মূর্তিগুলিতে শিল্পকলা সব ক্ষেত্রে সমান উৎকর্ষ লাভ করে নি। কয়েকটিতে আঁটসাঁট প্রাচীন পদ্ধতি (conventions) আড়ষ্ট ভাবের সৃষ্টি করেছে, আর কয়েকটির রূপ-ব্যঞ্জনা স্বাভাবিক ও সৌষ্ঠবপূর্ণ। এই অতি-বৃহৎ প্রস্তরমূর্তিসমূহ ভাস্করের নিপুণ দক্ষতার পরিচায়ক। প্রস্তরমূর্তি ছাড়াও, তাম্রমূর্তি, চোঙায় উৎকীর্ণ পূজার দৃশ্য, গদা-মুণ্ডে খোদাই করা সিংহমূর্তি প্রভৃতি আরও কতগুলি শিল্পদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে গুডিয়ার যুগের।

যুদ্ধবিগ্রহ ও লুণ্ঠন ব্যতিরেকে দেশ কিরূপে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, গুডিয়ার সুদীর্ঘ শাসনকালই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পূর্ণ শান্তি বিরাজ করেছিল তখন লাগাস রাজ্যে, এবং আকালের বছরটি ছাড়া প্রজাবৃন্দের অভাব-অনটন আর কখনো দেখা দেয় নি। জল সরবরাহের জন্য নূতন পূর্তকার্য ও পুরনো পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার করেছিলেন তিনি। মন্দিরে বৃষ ও মেষ বলি, আর খেজুর, মাখন, ফিগ, পিষ্টক প্রভৃতি ভোগ-নৈবেদ্যের বহর দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে লাগাস রাজ্যের রাজস্বও তখন যথেষ্ট পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রজাকে শোষণ করে মন্দিরের শ্রী-সম্পাদন করেন নি গুডিয়া। তাঁর প্রশাসনের আদর্শ ছিল আইনের মর্যাদা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সুবিচারের প্রতিষ্ঠা এবং দরিদ্রকে পুরোহিত ও রাজপুরুষের শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। মন্দিরে দেব-প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌কালে সপ্তাহ ধরে তিনি যে ব্রত-নিয়মের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাই থেকেই তাঁর মহৎ আদর্শ প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলেন, এই পবিত্র সপ্তাহে পরিচারিকা ছিল প্রভু-পত্নীর সমান, ভৃত্যের সঙ্গে প্রভু আচরণ করত মিত্রবৎ, প্রভাবশালী শক্তিমান পুরুষ দুর্বল ব্যক্তির সঙ্গে একত্র শয়ন করত, কুবাক্য উচ্চারণ করত না কেউ; নিনগিরসু ও নিনার বিধিনিষেধগুলি (laws) অনুসৃত হত; কি বিধবা, কি পিতৃমাতৃহীন অসহায় ব্যক্তি কেউ তারা ধনী কর্তৃক উৎপীড়িত হত না। আইন-কানুনের কথাপ্রসঙ্গে হতভাগ্য উরুকাগিনার সংস্কারবিধান মনে পড়ে—সম্ভবত সেই বিধানই ছিল গুডিয়ার আইন। এই আইন-

গুলির জন্যই একদিন উরুকাগিনার জীবনান্ত হয়েছিল। কিন্তু কালচক্রের বিবর্তনের সঙ্গে এককালে যা ছিল সমাজ-সংস্কার তা-ই এখন নিয়মিত আইন-কানুনে পরিণত হয়েছিল।

লাগাসের স্বর্ণযুগ ছিল গুডিয়ার শাসনকাল। এই যুগের প্রতীকরূপেই উত্তরকালে তিনি দেবতার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আক্‌কাডীয়দের মত তিনি কখনো নিজেকে দেবতার অবতার বলে দাবি করেছেন, এমন কোন প্রমাণই নেই, মৃত্যুর পর দেবতা-রূপে পূজিত হয়েছিলেন। গুডিয়ার উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র উর-নিনগিরসু। প্রথমে তিনি পটেশী ছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁকে প্রধান পুরোহিত (High Priest) বলেই অভিহিত করা হয়েছে। পটেশী বা পূজারী উর-নিনগিরসুর কোন বৃত্তান্তই আমরা অবগত নই। তবে এ কথা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, লাগাসের স্বাধীনতা আর তখন নেই। সে রাজ্য তখন উরের রাজা ডুঙ্গির করতলগত হয়েছে। উরের রাজশক্তি তখন 'সুমের ও আক্‌কাড রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং সেই রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল লাগাস নগর।

(খ) উর : উর-এঙ্গুর ও ডুঙ্গি

দক্ষিণাঞ্চলের নগর-রাষ্ট্র উরের সাক্ষাৎ মেলে খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দ থেকে, যদিও সে সময় শহরটি ছিল অপেক্ষাকৃত নগণ্য। সুমেরীয় লেখক (scribes)-গণের রচিত 'নৃপতিবৃন্দের তালিকা' (Kings' List) থেকে জানা যায় যে উরের রাজন্যবর্গের প্রথম বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মেস-আনি-পদ।* ১৯২৭-২৮ সনের ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানের আবিষ্কারসমূহ তালিকার এই তথ্যটির সমর্থন করে। খনন-কার্যে রানী সুব-আদ ও রাজা আ-বরগির সমাধিও আবিষ্কৃত হয়েছে—সম্ভবত এঁরা ছিলেন স্বামী-স্ত্রী—রাজত্বকাল উরের সেই আদিযুগেই। এ-কালের সমাধি ও সমাজ-প্রথা, শিল্প

* "In 1924 Dr. Wooley found an inscription of A-anni-padda, son of Mes-anni-padda, who appears in the tablets as the founder of the First Dynasty of Ur, the third after the flood......The date of Mes-anni-padda is variously gives as 3100 B. C. and 2620 B. C." (*The Most Ancient East* by Gordon Childe—p. 16)

প্রভৃতি বিষয়ে নানান তথ্য অবগত হয়েছি আমরা—সেসব পরে আলোচ্য। আদিযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস অল্পই জানা গেছে। তবে সুমের দেশে উর ও এরেক নগর-রাষ্ট্রদ্বয় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং দীর্ঘকাল ধরে আক্কাডীয়দের অগ্রগতিকে বাধা দিয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উরের দ্বিতীয় রাজবংশের রাজত্বকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—রাজাদের নামও আবিষ্কৃত হয় নি।

ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধি-গৌরবে মণ্ডিত উরের আবির্ভাব হয়েছিল তৃতীয় রাজ-বংশের রাজত্বকালে। এই বংশের রাজত্বকাল সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২৪০০-২৩০০—উলির মতে খৃঃ পূঃ ২০৭৯-১৯৭০। উর-এঙ্গুর ছিলেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা—তাঁর আর একটি নাম উর-নামমু। চার পুরুষ টিঁকে ছিল এই রাজবংশ। পূর্বে বলা হয়েছে, এ অঞ্চলে আক্কাডীয় নৃপতিদের প্রভুত্ব ছিল নামমাত্র, লাগাসের মত উরও ছিল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। তারপর যখন আক্কাডীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটল, উর-এঙ্গুরের অধিনায়কত্বে উর তখন বিজয়দর্পে অগ্রসর হয়ে আক্কাডের স্থান অধিকার করল। দিগ্বিজয়ী বীর, মহান শাসক ছিলেন উর-এঙ্গুর। স্যর লিওনার্ড উলি বলেন, সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন তিনি পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত, এবং মেসোপটেমিয়ার সর্বত্র তাঁর স্মৃতিচিহ্নগুলি ছড়ানো রয়েছে। এই নৃপতির রাজত্বের ইতিহাস কোন লিখিত বিবরণে প্রকাশ পায় নি, এমন কি কিরূপে তিনি সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাও অজ্ঞাত। শুধু তিনি যে নানান স্থানে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেই ভগ্ন মন্দিরাবশেষগুলির অভ্যন্তরে প্রাপ্ত বিবিধ লিখন থেকেই তাঁর বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য সংকলিত হয়েছে। জানা যায়, তিনি নিপ্পার নগরে এনলিল-দেব ও তাঁর পত্নী নিনলিল-দেবীর অধিষ্ঠানের জন্য দুইটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। নিপ্পার নগর ছিল পরম শক্তিমান দেব-সেনাপতি এনলিলের অধিষ্ঠানভূমি—সেই নিপ্পারের অধীশ্বর হয়েছিলেন বলেই 'সুমের ও আক্কাড-রাজ' পদবী গ্রহণ করেছিলেন উর-এঙ্গুর। মন্দির নির্মাণের পর একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করে চন্দ্র-দেবতা নান্নার-কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। একটি শিলালিপিতে বলেছেন উর-এঙ্গুর, সূর্য-দেবতার বিধি অনুসারে রাজ্য মধ্যে তিনি ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আঠারো বছর রাজত্ব করেছিলেন তিনি।

উর-এঙ্গুরের বিপুল রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্র ডুঙ্গি। আটান্ন বৎসর ব্যাপী সুদীর্ঘ রাজত্বকালে নানান দেশে নানান অভিযান করে আসমুদ্র-বিস্তৃত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন তিনি। সুমেরীয় জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর পিতা, ডুঙ্গিও সেই জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেমেটিকগণ কর্তৃক অধ্যুষিত ব্যাবিলন নগর ধ্বংস করেছিলেন, এবং পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তৃতির উদ্দেশ্যে ইলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। ইলাম পরাজিত হয়েছিল। পরাজিত শাসকের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের অভিপ্রায়ে ডুঙ্গি তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করেছিলেন আনসান প্রদেশের পটেশীর হস্তে। কিন্তু ইলামের অনমনীয় দুর্ধর্ষ শক্তি চূড়ান্তভাবে পরাভব মেনে নেয় নি। ইলাম বিদ্রোহ করেছিল বারবার, এবং দশ বৎসরে তিনবার সংগ্রামের পর ইলামের অধিকাংশ ভূখণ্ড আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ডুঙ্গি। তাঁর পত্রবাহকেরা উর থেকে সুসা প্রভৃতি ইলামী নগরসমূহে নিয়মিতভাবে হুকুমপত্র নিয়ে যাতায়াত করত, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই হুকুমপত্রগুলি উর-বাহিনীকে খাদ্য, পানীয়, তৈল প্রভৃতি সরবরাহের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ওপর রাজাদেশ বহন করত। ইলামের সুসা নগরকে সুমের-আক্কাড রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী করেছিলেন ডুঙ্গি।

পূর্বে বলা হয়েছে, সুমেরীয়রা কখনো ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করে নি—সারিবদ্ধ সৈন্যদল সুবৃহৎ ঢাল সামনে রেখে কুঠার ও ভল্ল হস্তে জমাট বাঁধনে অগ্রসর হত, সারগনের তীরন্দাজ সৈন্যরাই সর্বপ্রথম সেই ব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের সেমেটিকদের অনুকরণে তীরন্দাজ সৈন্যদল গঠন করেছিলেন ডুঙ্গি, এবং সেই ধনুর্ধারী সৈনিকেরাই তাঁর দিগ্বিজয়-কার্যে প্রধান সহায় হয়েছিল।* ইলাম বিজয়ের পর তিনি সেখানে আপন কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন, নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার নির্মাণ-কার্যের উপকরণাদি সংগ্রহ ও প্রেরণের ব্যবস্থা করবার জন্য। ক্রীতদাস যোগাড় করে উরে চালান দেওয়া ছিল কর্মচারীদের আর একটি প্রধান কর্তব্য। ইলামের খনিজ ও বনজ সম্পদ আহরণ করে সুমেরীয় নগরগুলির শোভা-সমৃদ্ধি বর্ধন করা হয়েছিল। এই

* ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন এবং ধনুর্ধারী সৈন্যবাহিনী গঠন সুমের দেশে সর্বপ্রথম করেছিলেন ডুঙ্গি, নতুন আবিষ্কারসমূহের আলোকে এই মতবাদ এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। 'সম্রাট সারগন ও আক্কাডীয় নৃপতিগণ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে ৫৯ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

অবাধ শোষণ যে সুমেরের সঙ্গে ইলামের সৌহার্দ্য-বন্ধন দৃঢ়ভাবে বেঁধে দেয় নি, ইলামের বারংবার বিদ্রোহই তার প্রমাণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য যা শুরু হয়েছিল আক্কাডীয় যুগে, সেই আদান-প্রদানের সম্বন্ধ অব্যাহতই ছিল। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘকাল এরূপ সংযোগের প্রভাবে সুসা নগরের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে সুমেরীয় ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। ব্যাবিলোনিয়ার সর্বত্র একই প্রকার ওজন পরিমাপ ব্যবহার করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন ডুঙ্গি। প্রতি নগরে কোন ব্যাপারের কাল-নির্ধারণ (time-reckoning) করা হত স্থানীয় ঘটনার সময় ধরে। এই পদ্ধতির পরিবর্তন করে ডুঙ্গি আদেশ দিলেন যে রাজ্যের সব স্থানে একই ঘটনার উল্লেখ করে কাল-নির্ধারণ করতে হবে, এবং উর থেকে পূর্বাহ্নে ঘোষণা করা হবে কোনটি সেই ঘটনা। রাজ্য মধ্যে একই পদ্ধতি অনুসরণের এই দুটি অনুশাসনপত্র থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রশাসনিক ব্যাপারে সার্বভৌম ও সার্বজনীন নিয়মাবলীর প্রবর্তন করে শাসন-সংস্কারেও ব্রতী হয়েছিলেন তিনি।

আক্কাডীয়দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উরের রাজারা নিজেদের দেবতা বলে প্রচার করতেন। সুমেরীয় পটেশীরা ছিল 'প্রজা-চাষী', নিজেদের তারা কখনো দেবতার মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে নি। পটেশী গুডিয়া মৃত্যুর পর দেবতার আসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু উর-এঙ্গুর ও ডুঙ্গি নিজেরাই মন্দির নির্মাণ করে সেখানে তাঁদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন এবং জীবিতাবস্থায়ই দেবতার পূজা লাভ করলেন। ডুঙ্গির বংশধরেরাও রাজভক্তিকে বদ্ধমূল করবার এমন সহজ উপায়টিকে বর্জন করেন নি। ডুঙ্গির পুত্র বুর-সিন নিজের নাম দিয়েছিলেন—'ন্যায়নিষ্ঠ দেবতা', 'দেশের সূর্যদেব'। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশে-বিদেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ হ্রাস পায় নি। বুর-সিন ও তাঁর পুত্র গিমিল-সিন-কে নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল।

উর-এঙ্গুরের বংশের রাজত্বকাল শেষ হয়েছিল ডুঙ্গির মৃত্যুর পর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই। শেষ রাজা ছিলেন ইবি-সিন, তাঁর সঙ্গেই উরের পতন ঘটেছিল। তার পূর্বে বুর-সিন ও গিমিল-সিন ইলাম ও অন্যান্য স্থানে প্রভুশক্তির দাপট অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। ইবি-সিন-এর রাজ্যচ্যুতি ঘটেছিল ইলামীদের আক্রমণে, বৃত্তান্তটির সামান্য উল্লেখ ছাড়া এই রাজা সম্বন্ধে আর কোন বিষয়ই আমরা অবগত নই। তথাপি অবস্থা বিচার

করে উরের পতনের কতিপয় কারণ নির্ধারণ করা কঠিন নয়। উর সমৃদ্ধি লাভ করেছিল ইলামকে লুণ্ঠন ও শোষণ করে, ক্রীতদাসের অক্লান্ত শ্রমের ওপর নির্ভর করেছে তার জীবন। সকল প্রকার কায়িক পরিশ্রমের কাজ ক্রীতদাসদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে উরের নাগরিকগণ বিলাস-সাগরে নিমগ্ন হয়ে সুখ-ভোগ করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে জাতির সামরিক শক্তি লোপ পায়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও শিথিল হয়। পক্ষান্তরে লুণ্ঠিত বঞ্চিত দেশসমূহে শোষণকারীর প্রতি প্রজাপুঞ্জের আক্রোশ জন্মাবারই কথা। রাজ-পূজার প্রবর্তন করে ধ্বংসের পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন উরের রাজারা, যেহেতু এই উপায়ে রাজার ওপর অসংগত প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এক শ্রেণীর চাটুকারদের। তারা যে সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিল এবং স্বার্থের খাতিরে দেশবাসীর ও জাতির অনর্থসাধনে দ্বিধা করে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রে পটেশী ও নাগরিকরাই দায়ী ছিল জনসাধারণের কল্যাণ বা অকল্যাণের জন্য। সাম্রাজ্য গঠন ও কেন্দ্রশক্তি প্রতিষ্ঠার ফলে নগরগুলির পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা এবং সেই সঙ্গে সীমারেখার ব্যবধান যেমন বিলুপ্ত হয়েছিল, তেমনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনরূপ দায়িত্বজ্ঞানও আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই কেন্দ্রশক্তি যেমন অন্তর্হিত হল, পরমুখাপেক্ষী নগরগুলিও তখন পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেল, আর ডুঙ্গির পরম গর্বের বিষয় সেই 'চতুর্দিঙ্মণ্ডল ('four quarters of the earth') বিস্তৃত' সুমের-আক্কাড রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ল।

(গ) নিসিন বা ইসিন ও লারসা

একটি বিবরণে দেখা যায়, উর বংশীয় রাজা ইবি-সিনকে ইলামের আনসান প্রদেশে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিবরণটি সমসাময়িক কালের না হলেও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর ইলাম আবার জাগ্রত হয়ে উঠেছিল এবং আক্রমণাত্মক অভিযান চালিয়ে উর রাজ্য ধ্বংস করেছিল। ইলামের এই ব্যাবিলোনিয়া অধিকার কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, সে কথা সঠিক বলবার উপায় নেই, তবে সেই অধিকার যে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, তা নিশ্চিত। কারণ উর রাজ্য ধ্বংসের অব্যবহিত পরে দেখা যায় যে, সুমেরীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্র দক্ষিণাঞ্চলের উর নগর থেকে উত্তরা-

পথের ইসিন বা নিসিন নগরে স্থানান্তরিত হয়েছে, এবং উর-বংশীয়দের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ইসিন-বংশীয়েরা।

পূর্ববর্ণিত 'রাজার তালিকা'য় নিসিন-বংশীয় রাজাদের নাম এবং তাদের রাজত্বকালের উল্লেখ আছে। এই বংশের রাজন্যবর্গ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ঐ তালিকার বাইরে আর কিছু নেই বললেই হয়, সুতরাং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই বংশের রাজত্বকাল সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২৩০০-২০৭৫। প্রথম রাজার নাম ইসবি-উরা—মোট ১৬ জন নৃপতির নাম পাওয়া যায়। তাদের কীর্তিকলাপের কোন বিবরণই হস্তগত হয় নি। এই বংশের রাজত্বকালের শেষ ভাগেই ব্যাবিলনের রাজশক্তির ভিত্তি স্থাপন করেন ব্যাবিলোনীয় প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুমু-আবুম্। সেদিন যে ক্ষুদ্র রাজশক্তি ব্যাবিলনের অবজ্ঞাত প্রান্তদেশে দেখা দিয়েছিল, সেই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মেঘখণ্ড ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ বিরাট আকার ধারণ করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাবিলন-রাজ সিন-মুবালিট ও তাঁর পুত্র স্বনামধন্য হাম্মুরাবির রাজত্বকালে। ব্যাবিলনের রাজবংশ ছিল সেমেটিক জাতীয় আমরুরু। ব্যাবিলনের ইতিহাস প্রসঙ্গে তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নিসিন রাজ্য সম্ভবত আভ্যন্তরীণ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছিল এবং সেই বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছিল লারসা। নিসিনের অধীনতা-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে কিছুকালের জন্য উরের ওপর অধিকার বিস্তার করেছিল লারসা। এই উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি ঘটেছিল লারসার রাজা গুনগুনুম-এর সময়, এবং দুই পুরুষ ধরে সুমেরীয় নগরপুঞ্জের ওপর লারসার প্রাধান্য অক্ষুন্ন ছিল। তারপর পূর্বে যেমন বহুবার ঘটেছে, সুমের দেশের চিরশত্রু ইলাম কর্তৃক আক্রান্ত হল লারসা। সিলি-আদাদ ছিলেন তখন লারসার অধিপতি, পরাজিত হয়ে সিংহাসনচ্যুত হলেন। সেই শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন পর্যায়ক্রমে ওয়ারাদ-সিন ও রিম-সিন। ইলাম-রাজ কুদুর-মাবুক-এর পুত্র তারা, ব্যাবিলনের আমরুরুদের সঙ্গে তাদের দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ চলেছিল দুর্বল নিসিন রাজ্যকে অধিকার করবার জন্য। পরিশেষে ব্যাবিলন-রাজ হাম্মুরাবি যুদ্ধে জয় লাভ করেন। এইরূপে লারসা ও নিসিনের পতনের সঙ্গেই সুমের দেশের সহস্র বৎসরের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

আমরুরু-সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে সুমেরীয়দের জাতীয় স্বাধীনতা লোপ

পেয়েছিল বটে, কিন্তু সারা ব্যাবিলোনিয়া জুড়ে, এমন কি সিরিয়া ও ক্যানানেও তাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি প্রসার লাভ করেছিল, উত্তরকালেও সেই সংস্কৃতির মহিমা কিছুমাত্র নষ্ট হয় নি। ব্যাবিলনের শিল্প, বিজ্ঞান, পুরাণ, সাহিত্য সবই যে সুমেরীয় সংস্কৃতিরই পূর্বানুবৃত্তি বা সম্প্রসারণ, আমরা তা ব্যাবিলনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাব। এখানে আমরা পরবর্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে সেই আদিযুগের সুমেরীয় ধর্ম ও সমাজের কথা কিছু বলব।

॥ ছয় ॥

ব্রহ্মাণ্ডের রাষ্ট্র-রূপ ও পৌর দেব-রাষ্ট্র

পৌররাষ্ট্রের কথা, বিশেষত নগর-দেবতার সঙ্গে শাসকের সম্বন্ধের বিষয় আগেই বলা হয়েছে। দেবতাই নগরের অধিপতি। শাসক নগর-দেবতার একজন বিশিষ্ট কর্মচারী, যেমন আছেন অন্যান্য কর্মচারী। নগরের বাইরে বিশাল জগৎ, শাসকের শাসন-দণ্ড যার নাগাল পায় না। নগর-দেবতারও শক্তিসীমার বাইরে পড়ে আছে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। অতি প্রাচীন কাল থেকেই ইরাকে সুমেরীয়দের কল্পনা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে একটি রাষ্ট্রের রূপ দিয়েছিল। অবশ্য এরূপ কল্পনার উপাদান তারা নিজেদেরই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করেছিল। ধাতুযুগের আগমনে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে গ্রামগুলি যেমন নগরে পরিণত হতে লাগল, তখন দেখা দিয়েছিল এক প্রকার 'আদিম গণতন্ত্র' (primitive democracy)। কতিপয় ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হত একটি সংসদ, আদিম গণতন্ত্রের প্রথামত দৈনন্দিন শাসন-কার্যের ভার ছিল সেইসব ব্যক্তির উপর। এই ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করত না, কিন্তু যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন বিপর্যয় ঘটত তখন সর্বময় কর্তৃত্বের ভার ও দায়িত্ব অর্পণ করা হত এমন এক ব্যক্তির ওপর, যাকে একরকম 'রাজা'ই বলা চলত। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের রাষ্ট্র-রূপ কল্পনায় ঠিক এমনিধারা একটি রাষ্ট্র-সংসদ স্থান পেয়েছিল, মানুষের নয় দেবতার, যে সংসদের শীর্ষস্থান অধিকার করতেন আকাশ-দেবতা আনু। দেব-সংসদের অন্য দুটি প্রধান দেবতা ছিলেন বাত্যা-দেবতা এনলিল ও পৃথ্বী-দেবতা এনকি। আকাশ, ঝড়বাত্যা, পৃথিবী, জল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তু বা অবস্থাকে কোন-না-কোন দেবশক্তির অভিব্যক্তি বলেই মনে করা হত। এমন বস্তু ছিল না তাদের ধারণায়, যার কোনরূপ জীবন নেই। লবণ খনিজ পদার্থ, সমুদ্রের জলেও লবণ আছে। এমন লবণকেও প্রাণবন্ত কল্পনা করে একটি স্তোত্রে বলা হয়েছে: "হে লবণ, তোমার জন্ম শুদ্ধ স্থানে, এনলিলের বিধানে তুমি হয়েছ দেবগণের খাদ্য। তোমাকে বর্জন করলে দেব মানব, রাজা প্রজা কারু খাদ্যই সুস্বাদু হয় না। আমি অমুকের পুত্র অমুক। যাদুবলে আমি হয়েছি জ্বরের হাতে বন্দী। ভেঙে দাও আমার

এই ঐন্দ্রজালিক বন্ধন, জ্বরমুক্ত কর আমাকে। তুমিই আমার সৃষ্টিকর্তা, তোমাকে প্রণাম।" এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জ্বরকে একটি দানবীয় শক্তির ক্রিয়া বা ইন্দ্রজাল বলে মনে করা হয়েছে। এও মনে করা হয়েছে যে দানবীয় অপকৌশলকে ব্যাহত করবার শক্তি লবণের আছে। প্রাকৃতিক এমন কি স্থূল পদার্থের মধ্যে ঐশী শক্তির আরোপ সভ্যতার নিম্নতম স্তর থেকে উন্নত পর্যায় পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, বৈদিক ধর্মেও তা অপরিচিত নয়। বেদে আছে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নিসর্গ-দেবতার স্তবস্তুতি মাত্র নয়, মুষল ও লাঙলকেও দেবতা জ্ঞানে স্তব করা হয়েছে। আদিম সমাজের মানুষেরা ম্যানা (mana) নামক একপ্রকার শক্তিকে দেখতে পায় বস্তুর ভেতর। সকল বস্তুকেই প্রাণবস্তু কল্পনা করা, যাকে বলা হয় animism—লবণ, মুষল, লাঙলের স্তবস্তুতি সেই আদিম অনুভূতিরই অবশেষ বা রূপান্তর, যে অনুভূতিকে সভ্য সমাজ পেয়েছিল ঐতিহ্যসূত্রে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এবং যা ব্যক্তির মনের ওপর তখনও প্রভাব বিস্তার করতে ছাড়ে নি।

জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে যে শক্তির কল্পনা করা হয়েছিল, সেই শক্তি এক-একটি স্বতন্ত্র সত্তা—কেননা, প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর ইচ্ছা অভিরুচি আছে যেমন, ব্যক্তিত্বও আছে তেমনি। কিন্তু সেই শক্তিকে বস্তুবিশেষের বাইরে অনুরূপ বস্তুগুলির মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ: যেসব নলখাগড়া নদী-উপত্যকার জলাভূমিতে স্বচ্ছন্দভাবে জন্মায় ও বৃদ্ধিলাভ করে, সেই জন্ম ও বৃদ্ধির মূলে রয়েছে একটি রহস্যশক্তি। নলখাগড়ার গুণও হরেক রকমের। রাখালের হাতে ওটি হয় একটি বাঁশী, আবার লেখক ওটিকে ব্যবহার করে লেখনীরূপে। নানান রকমের গুণ সন্নিবিষ্ট রয়েছে নলখাগড়ায় যেমন তেমনি কুমুদ, কহ্লার, শালুক প্রভৃতি প্রত্যেকটি জলজ উদ্ভিদের মধ্যে। এইসব গুণগুলি নিজ নিজ নিয়ম মেনেই চলে থাকে, এবং যে অধিষ্ঠাত্রী শক্তি রয়েছেন তাদের নিয়মানুবর্তিতার কারণরূপে, তার নাম নিদিবা-দেবী। একজন প্রৌঢ়া রমণীরূপে এই দেবীকে কল্পনা করে সুমেরীয় ভাস্করেরা তাঁর মূর্তি খোদাই করেছেন। নলখাগড়াগুলি বেরিয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে।

নলখাগড়াগুলি প্রত্যেকটি বিভিন্ন পদার্থ, কিন্তু তারা এক জাতীয়।

এক জাতীয় পদার্থের মধ্যে একই শক্তি বিরাজ করে, এই বোধ থেকেই জন্মায় একটি ব্যাপক শক্তিকেন্দ্রের ধারণা। এই কেন্দ্রশক্তিই বস্তুগুলিকে বিশেষ গুণধর্মবিশিষ্ট করে তোলে। অর্থাৎ, নলখাগড়া রাখালের হাতে বাঁশী আর লেখকের হাতে লেখনীতে পরিণত হয় কোন কেন্দ্রশক্তির বিধানমত। কেন্দ্রশক্তির এমনি একটি ধারণা জন্মাবার পর আর তা নলখাগড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তখন বিভিন্ন জাতীয় কেন্দ্রশক্তির পিছনে সর্ব-শক্তির আধারস্বরূপ বিরাটের শক্তি-কল্পনা যেন আপনা থেকেই উদয় হয়। সর্ব-শক্তির মূলীভূত কারণ সেই বিশ্বজনীন আদ্যাশক্তি সকল শক্তির মধ্যে ছড়িয়ে আছে, বিভিন্ন শক্তি তাদের গুণধর্ম পেয়েছে এই মূল-শক্তি থেকে। আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত রয়েছে যে শক্তি, ধরণী যার প্রতিমা, সেই পরাশক্তিকে ভারতের আর্য ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন আত্মারূপে, সর্বভূতে আত্মদর্শন করেছিলেন তাঁরা। ব্যাবিলোনিয়ার চিন্তাধারায় আত্মার এই সর্বময় রূপ প্রকাশ পায় নি বটে, কিন্তু ঐ ধরনের ভাবের একটুখানি ইঙ্গিত যে একেবারে পাওয়া যায় না, তা নয়। একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে: "আমিই স্বর্গ, তুমি পার না আমায় স্পর্শ করতে। আমিই পৃথিবী, তুমি পার না আমায় যাদু করতে।" মন্ত্রোচ্চারণ করেছিল যে লোকটি, সে রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। রোগমুক্তির জন্য শত্রুর যাদুকে দূরীভূত করবার উদ্দেশ্যেই এই মন্ত্রপাঠ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই মন্ত্রের মধ্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানবাত্মার একত্ব কল্পনার একটি পূর্বাভাস রয়েছে—যে কল্পনা রূপে রসে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল বহু যুগ পরে ঋষি কক্ষিবানের উচ্ছ্বসিত ঋক্‌মন্ত্রের ভাষায়:

অহম্ মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চাহম্
কক্ষিবান্ ঋষি অস্মি বিপ্রঃ। (ঋক্ ৪-২৬-১)

অর্থাৎ, আমি হয়েছিলাম মনু, আমিই সূর্য, বিপ্র ঋষি কক্ষিবান আমিই।

দেব-কুলপতি আনু ও দেব-সেনাপতি এনলিল

শক্তিনিচয়ের একত্ব কল্পনা কোনরূপ সুসংবদ্ধ আকার ধারণ করে নি ব্যাবিলোনিয়ায়। লিপি-লেখনগুলিতে দেবতার স্তবস্তুতি যা করা হয়েছে তাতে শত্রু দমন, মারণ, উচাটন প্রভৃতি যত পাওয়া যায়, দর্শন বা ধর্মতত্ত্বের পরিচয় তেমন নেই। প্রকৃতপক্ষে সে যুগ প্রাক্-দর্শন যুগ। দর্শনচিন্তা, পরমার্থের

তত্ত্ববিচার, ন্যায়ের বা যুক্তির সংগতি (logical consistency)—জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলীভূত এইসব ভাব-সূত্রের সঙ্গে তখনো পরিচয় হয় নি মানুষের। তাই, প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের একত্বের আভাস ক্বচিৎ উঁকিঝুঁকি মারলেও, আসলে শক্তিগুলিকে পৃথকভাবেই কল্পনা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি শক্তি স্বতন্ত্র দেবতা, এবং মানুষের মত দেবতারাও যেন গড়ে তুলেছেন একটি দেব-সমাজ। মানবসমাজে কর্ম-বিভাগ আছে, দেবসমাজেও তেমনি দেবতাদের বিশেষ কর্ম নির্ধারিত করা হয়েছে। সমাজ-রক্ষার জন্য সমাজপতির প্রয়োজন হয়, প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী তিনি। তেমনি সর্ব দেবতার নেতা আছেন একজন, সকলেই যাঁর আদেশ পালন করে থাকেন। তিনি দেবাদিদেব, তাঁর নাম আনু। আকাশ-দেবতা তিনি, ঋগ্‌বেদের অসুর বরুণ অথবা রুদ্রের গুণ-ধর্মবিশিষ্ট দেবতা। রুদ্রের স্তুতি প্রসঙ্গে বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে নিজ শক্তির প্রতিরূপ করেছেন রুদ্র (চকৃষে ভূমিং প্রতিমানং ওজসো—ঋক্ ১।৫২।১২)। আর একটি মন্ত্রে পাই আমরা রুদ্রের বিশালতার সীমার নাগাল আকাশ বা পৃথিবী পায় নি। এইসব স্তোত্রে আছে বিরাট রহস্যশক্তির অনুভূতি ('mysterious tremendum'), সেইমত দেবাদিদেব আনুর বর্ণনায় সেই রহস্যশক্তির ইঙ্গিত সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান। দিগন্তবিস্তৃত আকাশের মত, বিশাল সমুদ্রের মত ভয়ংকর তিনি। প্রভুত্বের (authority) আধার তিনি। প্রভুশক্তি যেখানেই দেখা যায়—পরিবার মধ্যে পিতার, রাষ্ট্রে শাসকের—সকল প্রভুশক্তিই মানুষ লাভ করে দেবাদিদেব আনুর দাক্ষিণ্য প্রসাদে। রাজার মুকুট ও দণ্ড, রাখালের তাড়ন-যষ্টি—ধরাধামে নেমে এসেছে প্রভুশক্তির এইসব নিদর্শন ও উপকরণ তাঁরই দান স্বরূপে। সর্ব মানবের আদর্শ পিতা তিনি, শাসকবৃন্দের আদর্শ শাসক। রাজাদেশের প্রাণশক্তি, তাঁরই অনুশাসন রাজার মুখে ধ্বনিত হয়ে থাকে। জগতের সর্বময় কর্তা আনু, সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। শুধু জগতের কেন, ত্রিদিবেরও অধীশ্বর তিনি, আকাশ ও পৃথিবী বিধৃত তাঁর আদেশ প্রভাবে। একটি স্তোত্রে বলা হয়েছে :

দেব পরিষদে যার আদেশ অমোঘ
তুমি সেই দেব-কুলপতি।
শিরে ধর জ্যোতির কিরীটি মন্ত্র-সমুজ্জ্বল।

ঝঞ্ঝা পৃষ্ঠে, রাজমঞ্চে কভু প্রতিষ্ঠিত
রাজার গৌরবে—
দেবগণ তোমার আজ্ঞায় কম্পমান,
থরথর বাত্যাহত বেণু-কুঞ্জ সম।

আক্কাডের উরুক নগরের এনমেন্না নামক একটি মন্দির থেকে দেবাদিদেব আন্থর মূর্তি রথে চড়িয়ে একটি শোভাযাত্রা বের করা হত, পুরোহিতরা স্তব পাঠ করত রথযাত্রাকালে নির্দিষ্ট বিধানমত, সেই নির্দেশগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে একটি চাকতির ওপর। এই উপলক্ষে যে স্তোত্রটি আবৃত্তি করতেন পুরোহিতরা সেটি এই :

হে মহান আন্থ, স্বর্গ মর্ত্যভূমি
এনলিল ইয়া বেল দেবকুল বরণীয় তুমি।
রবি (সামাস) শশি (সিন) শ্রদ্ধানতশির হোক তব আবির্ভাবে।
নারগেল সিবি দেব বিপুল গৌরবে
জয়গান করুক তোমার।
ত্রিদিবের ধরিত্রীর যত দেবগণ
সাগর-দেবতা যত দেউল-দেবতা
স্তবগান করুক তোমার,
প্রতি দিন প্রতি মাস প্রতিটি বৎসর।

দেব-সভায় আন্থর পরের স্থানটি অধিকার করেন এনলিল, তিনি বাত্যা-দেবতা, 'এনলিল' শব্দটির অর্থ 'প্রভু বাত্যা' (Lord Storm)। উদ্দাম শক্তির (Force) প্রতিমূর্তি, প্রলয়ংকর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মধ্যেই তাঁর প্রকাশ। দ্যৌ-পৃথিবীর মাঝখানে তাঁর অবস্থান, আকাশের নীচে—কিন্তু তিনি শুধু প্রাকৃতিক শক্তি মাত্র নন। মানুষের সর্বাত্মক ধ্বংস অভিযানে বা যুদ্ধ-বিগ্রহে বলবীর্যের মূলাধার তিনি। আমরা দেখেছি, বর্বর ইলামী বাহিনী ঝঞ্ঝার মত এসে উর নগরকে বিধ্বস্ত করেছিল। 'ঝঞ্ঝার মত' কথাটি রূপক ছলেই ব্যবহার করি আমরা—আসলে কিন্তু ঝঞ্ঝারূপী এনলিলই উরের ধ্বংসকারী, দুর্ধর্ষ শত্রুর আক্রমণ তাঁরই শক্তির বহিঃপ্রকাশ। উর ধ্বংসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল দেব-সংসদ (assembly of gods)। এনলিল

সেই সিদ্ধান্তমতই কাজ করেছিলেন, কেননা তিনি দেব-সেনাপতি। শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত উর এনলিলের আদেশে তুফান-বিধ্বস্ত নগরীরূপে বর্ণিত হয়েছে :

ঝটিকারে ডাকেন এনলিল,
—জনগণ করে 'হায় হায়'—
সুমেরের শুভাশুভ বায়ু যত
ডাক দেন সকলেরে,
—জনগণ করে 'হায় হায়'—
এনলিল—গিবিল সহায়—
আকাশের উগ্র তুফানেরে ডেকে কন, ধ্বংস কর।
—জনগণ করে 'হায় হায়'—
ঝড় বয়, গগন বিদীর্ণ হয় সন্ সন্ রবে,
—জনগণ করে 'হায় হায়'—
লণ্ডভণ্ড সারা ভূমি বিপুল গর্জনে,
—জনগণ করে 'হায় হায়'—
প্লাবনের তরঙ্গ আঘাতে
বাত্যাহত তরী খানখান,
ঝটিকার পুরোভাগে জ্বলে হুতাশন,
—জনগণ করে 'হায় হায়'—
ঝঞ্ঝাপৃষ্ঠে চড়ি,
মধ্যাহ্ন মরুর তাপে ঝলকে ঝলকে
বজ্র-বহ্নি দহে দশ দিক।······

এমনি করে ক্রুদ্ধ এনলিলের আদেশে ঝটিকা দেশ ধ্বংস করে উর নগরীকে যেন এক খণ্ড আস্তরণ দিয়ে আবৃত করেছিল। তারপর ঝড় যখন স্তব্ধ হল তখন দেখা গেল, নগরীর ধ্বংসাবশেষ, ভগ্ন প্রাচীর, মৃতদেহের স্তূপ তোরণে রাজপথে।

সেই রাজপথ—প্রমোদ উৎসবে যেথা মিলে নরনারী,
ধরাশায়ী মৃতদেহ এখানে সেখানে।

খোলা মাঠ পূর্ণ ছিল নর্তকের দলে,
সেথা তারা স্তূপাকারে শুয়ে।
বিবর যেখানে যত পরিপূর্ণ দেশের শোণিতে,
ধাতু যেন ছাঁচে ঢালা।

সুমেরীয় রচনাবলীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ উর ধ্বংসের উপরোক্ত বর্ণনা। কবি-প্রতিভার পরিচয় তো আছেই, তা ছাড়া আছে খুঁটিনাটির পদলালিত্য আর ছন্দের পুনরাবৃত্তি (refrain)—যাকে আমরা বলি 'আখর' বা 'ধুয়া'। সুমেরীয় সাহিত্যে আখরের ছড়াছড়ি দেখা যায়।

শুধু যে দেব-সভার আদেশ পালনই এনলিলের কাজ তা নয়। জগতের অভিশাপরূপেও কল্পনা করা হয় নি তাঁকে। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, মানুষের মনে ভয়ের কারণস্বরূপ তিনি, আবার মানুষের সর্বময় কল্যাণ তাঁকেই আশ্রয় করে থাকে। তিনি ন্যায়ের শক্তি, রাষ্ট্রের শক্তি, দেবতার শক্তি। শুনুন একটি স্তোত্র :

তুমি আছ স্বর্গ মর্ত্য ঘিরে, হে চঞ্চল দেব,
প্রাজ্ঞ তুমি মানবের উপদেষ্টা……
তোমার মুখের কথা—
দেবতার সাধ্য কি যে করে অবহেলা।
মহাদেব—স্বর্গের দেবতা মানে শাসন তোমার।
ন্যায়নিষ্ঠ রাজা তুমি, পৃথিবীর দেবতারে দাও উপদেশ।……

রুদ্র-দেবতার এই চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে শুধু তাঁর কল্যাণতম রূপ—'রুদ্র যত্তে রূপং কল্যাণতমং তেন মে পাহি নিত্যং' (ঋগ্বেদ)। কিন্তু সেই সঙ্গে রুদ্রের মতই এনলিলের প্রকৃতির অন্তস্তলে হিংস্রভাব ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতারও সাক্ষাৎ মেলে। জগৎকে তিনি স্বাভাবিক নিয়মে পরিচালিত করে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্ধকার গহ্বরে উন্মত্ত হিংসাবৃত্তি কখন যে উত্থিত হয়ে এমন সুন্দর বিশ্ব-শৃঙ্খলাকে তছনছ করে দিয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই মানুষের মনে এনলিলের প্রতি একটি ভয়ের ভাব সদাই জাগরূক। সেই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে একটি স্তোত্রে :

কি আছে পিতার মনে ?
কি আছে এনলিলের পবিত্র মানসে ?
কোন (বক্র) অভিসন্ধি মনে তাঁর জাগে ?
জাল বিছিয়ে রাখেন তিনি, শত্রুর সে জাল।
ফাঁদ পেতে রাখেন তিনি, সে ফাঁদ শত্রুর।
দরিয়ায় ফেলেন জাল, ধরেন মাছ।
পাখী ধরেন ফাঁদ পেতে।.....

নির্দয় কুলিশ-কঠোর, ক্রোধোন্মত্ত এনলিল দিশেহারা হয়ে পড়েন। সর্বেন্দ্রিয় যায় তখন রুদ্ধ হয়ে। স্তবস্তুতি সবই তখন তাঁর সেই রুদ্ধ মনের কপাটে আঘাত করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

হে পিতা এনলিল, রোষে ঘূর্ণমান আঁখি
শান্ত হবে কবে ?......
পেটিকার মত রুদ্ধ হৃদয় তোমার
খুলবে আর কবে ?
শ্রবণ-কুহর বন্ধ তোমার
খুলবে আর কবে ?......

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম যে ব্যাবিলোনিয়ার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাষ্ট্র-কল্পনায় আনু প্রভুত্বের আর এনলিল শক্তির আধার রূপেই বিরাজ করেন। আকাশ-দেবতা আনুর বিশালত্বের সমুখে মানুষের মস্তক আপনা থেকেই নত হয়ে আসে, তার বিরাট প্রভুত্বকে মেনে নিতে হয় বাইরের কোনরূপ বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকেই। এনলিলের দোর্দণ্ড প্রতাপ ভিন্ন রকমের—শত্রুকে পরাভূত করেন তিনি বাহুবলের প্রভাবে। বস্তুত প্রভু-শক্তি (authority) ও বাহুশক্তি (force), এই দুটি শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-রাষ্ট্রকে পরিচালিত করে। অন্যান্য যেসব দেবতা তাঁদের শাসন-কার্যে সাহায্য করে থাকেন, পৃথিবীর দেবতা নিনটু আর জল-দেবতা এনকি-ই তাঁদের মধ্যে প্রধান। পৃথ্বী-দেবতা নিনটু নবজীবনের ও উর্বরতার উৎস। তিনি স্ত্রী, প্রস্তরমূর্তিতে তাঁকে দেখা যায় শিশুকে স্তন্য পান করাতে। জন্ম

ও বিবৃদ্ধির মূল কারণ তিনি, তাঁরই প্রসাদে উদ্ভিদ ও শস্যের, পশু ও মানবের সংবৃদ্ধি ঘটছে। দেব-পরিষদে তিনি আনু ও এনলিলেরই পাশে উপবেশন করেন। আর এনকি নামে জল-দেবতাটি হলেন সৃজনশক্তি (creativity)। একজন প্রধান দেবতা তিনি, যাঁকে কেন্দ্র করে পুরাণ-কাহিনী (myth) রচিত হয়েছে। পূর্বে জল ছিল পৃথিবীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। কালক্রমে জল ও জলের মধ্যে নিহিত শক্তি পৃথিবীর সঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে পৃথক সত্তা লাভ করেছিল—নূতন জীবন, নূতন জীব ও নূতন পদার্থরূপে। পৃথিবীর গুণ ও জলের ধর্ম, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও প্রভেদ আছে অনেক বিষয়ে। পৃথিবীর উর্বরতা একটি নিষ্ক্রিয় নিশ্চল গুণবিশেষ (immobility)। পক্ষান্তরে জলের ধর্ম চির-চঞ্চলতা, ভূমি সিক্ত করে জল নিরন্তর বয়ে যায়। সক্রিয় সৃজনশক্তির প্রতীক, জল-দেবতার ধী ও প্রজ্ঞা বৃষ্টির সৃষ্টি করে মেঘপুঞ্জ থেকে, আর সেই বর্ষার ধারা যখন শতমুখে প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, ধরণী তখন শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে। দেবসমাজে এনকির কাজ পৃথিবীতে কৃষির ব্যবস্থাকরণ, জল-সেচন, নদী ও খালের জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করবার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছেন আনু ও এনলিল। তিনি তাঁদের মন্ত্রী, ক্ষমতা লাভ করেছেন তাঁদেরই কাছ থেকে। সকল জ্ঞানের মূলে এনকির সক্রিয় শক্তি প্রকাশিত। এনকির চিন্ময় উদ্ভাবনী-শক্তি সচিবের সুযুক্তি ও বুদ্ধিবিবেচনা (wise counsel) আর কারিগরের কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে বিরাজ করে। তিনি বিশ্বকর্মা ("god of the craftsmen")। একটি স্তোত্রে এই দেবতার বিবিধ গুণাবলী কীর্তিত হয়েছে :

এনকি স্তোত্র

মায়া দৃষ্টি অচঞ্চল চিন্ময় আবেশে—
হে দেব এনকি,
তোমার অনন্ত প্রজ্ঞা করে উদ্ভাসিত বিশ্বের অন্তর।
যত কলহ বিবাদ, যুক্তি যেথা যুঝে যুক্তি সাথে,
তোমার মঙ্গলবাণী উঠে ধ্বনি, শোনে সবে শ্রদ্ধানত শিরে—
মেনে নেয় সিদ্ধান্ত মীমাংসা যত কল্যাণ বিধান।
প্রভু তুমি প্রাজ্ঞ-বচনের, নমো এনকি—তোমারে প্রণাম।

বিশৃঙ্খল বিশ্ব-জগতের আদি-অধিপতি,
শাসক তোমার পিতা আনু-দেব
সঁপেছেন তব 'পরে গঠন-চালন ভার স্বর্গ-ধরণীর।

ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিসের পরিশুদ্ধ সাগর-সংগম,
তৃণাচ্ছন্ন তটভূমি, মেঘপুঞ্জ ঢালে বারি,
সিক্ত ক্ষেত্রে মুঞ্জরিত শস্যশীর্ষ,
শষ্প শ্যামলিমা মরু চারণ-প্রান্তরে,
অরণ্যে উদ্যানে তরুশাখার বিকাশ, নবোদ্ভিন্ন কিশলয়—
মাঙ্গলিক কর্ম যত, তুমি কর আনুর আদেশে।
সর্ব ভূতাশ্রয় যিনি দেব-এনলিল,
তুমি ক্ষুদ্র-এনলিল, এনলিল-অনুজ।

এই স্তোত্রটিতেও সুমেরীয় কবি-প্রতিভা যেন মুক্তার মত শুভ্র স্বচ্ছ রূপ ধরেই দেখা দিয়েছে। প্রকৃতিবর্ণনার অনুপম লালিত্যের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা বা শব্দ, যার মঙ্গল-শঙ্খ নিনাদিত হয় দিকে দিকে—বিশ্ব-সাহিত্যে ঋত-সত্যস্বরূপিণী প্রজ্ঞার দর্শন পাই আমরা সেই সুদূর অতীত যুগে এনকি স্তোত্রের কয়েকটি পদের মধ্যে। পরবর্তী কালে এই প্রজ্ঞাশক্তিই নানাবিধ প্রাজ্ঞবচনে শাখা-পল্লবিত হয়ে ব্যাবিলোনীয় সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল, এবং তা-ই আবার যথাসময়ে ইহুদিদের বাইবেলে 'প্রবাদ মালা'য় (Proverbs) ও 'প্রজ্ঞাগ্রন্থে' (Book of Wisdom) স্থান লাভ করেছিল।

এই যে কয়েকজন প্রধান বিশ্ব-দেবতার পরিচয় একটু বিশেষভাবে দেওয়া হল, তাঁরা ছাড়াও দেবসমাজে আছেন অসংখ্য গণদেবতা, কোন-না-কোন প্রাকৃতিক পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে যাঁদের কল্পনা করা হয়েছে। বিশ্ব-রাষ্ট্রের পরিচালক এই দেবসমাজ সুমেরীয়দের আদিম গণতন্ত্রের ছাঁচে ঢালাই-করা একটি সংস্থা, যেখানে সমাজের শীর্ষস্থানীয় রূপে দেব-কুলপতি প্রতিষ্ঠিত, মন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত মুখ্য দেবতারা, আর অন্যান্য গণদেবতারা তাঁদের সহায়ক ও কর্মী। বিশ্ব-রাষ্ট্র ও বিশ্ব-সংসদের অধীনে অবস্থান করে

পৌর-রাষ্ট্র ও পৌর-পরিষদ। প্রতি নগরে নগর-দেবতা অধিষ্ঠিত—নগরের অধিপতি তিনিই। অনুষ্ঠিত কর্মের জন্য তাঁকে জবাবদিহি করা হয় জনগণের কাছে নয়, বিশ্ব-দেবসমাজের সমক্ষে। আমরা দেখেছি, আদিকালের সুমের দেশের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বা রাজার সঙ্গে রাজার সংগ্রাম নয়—যুদ্ধ বাধত একজন নগর-দেবতার সঙ্গে আর একজন নগর-দেবতার, জয়-পরাজয়ও ঘটত নগর-দেবতারই। স্মরণ থাকতে পারে, উম্মার পটেশী লুগাল জাগ্‌গিশির লাগাস ধ্বংস জনিত মহাপাপের কলঙ্ক উম্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিদবার ওপর আরোপ করা হয়েছিল। আবার দেখা যায়, বিশ্ব-দেবসংসদের নির্দেশ অনুসারেই এক দেবতা অন্য দেবতার নগরকে ধ্বংস করেন, উর ধ্বংসের বিবরণই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। লাগাস নগরের প্রধান দেবতা নিনগিরসু-র সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। উরের দেবতা এনজু বা নান্‌নার ছিলেন চন্দ্র-দেবতা। লারসার নগর-দেবতা ছিলেন সূর্য-দেবতা বাব্‌বার—তিনি বিধানের (laws) ও ন্যায়বিচারেরও (justice) দেবতা। এরেক নগরের দেবতা নানা বা নিন্‌নি ছিলেন শক্তিশালিনী রণচণ্ডী—সম্ভবত এই দেবীকেই দেখতে পাই আমরা ইস্‌তার রূপে পরবর্তী কালে। এই দেবতারা সকলেই ছিলেন জাতীয় দেবতা (national gods), জাতির মঙ্গল নগরবাসীর কল্যাণ সাধন করেন। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এঁরা নগর-রক্ষার জন্য, নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য। সাধারণত এঁদের ক্ষমতা ও অধিকার ছিল নিজেদের রাজ্যসীমার মধ্যে আবদ্ধ—যদিও কোন-কোন ক্ষেত্রে বিশ্ব-দেবতাকে দেখা যায় নগর-দেবতারূপে অধিষ্ঠিত। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে : বিভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রগুলির অধিপতি যখন পৌর-দেবতারা, আর যখন বিশ্ব-দেবগণের আধিপত্য ব্রহ্মাণ্ড-জোড়া, তখন বিশ্ব ও পৌর উভয় সম্প্রদায়ের দেবগণের মধ্যে সম্বন্ধ দাঁড়ায় কিরূপ ? আর, পৌর-দেবতারা সত্যই যদি বিশ্ব-রাষ্ট্রের নিয়ন্তাদের প্রতিনিধি হন, অর্থাৎ তাঁদের কর্তৃত্বাধীনে নগর-শাসকের পদ অধিকার করে থাকেন, তা হলে শাসকবৃন্দের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ নিরন্তর চলতে থাকলে, সেটা কি দুর্বল কেন্দ্রশক্তির পরিচায়ক নয় ? এই তো গেল প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় কথা এই যে, পৌর-দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় বিশ্ব-প্রকৃতির শক্তি-দেবতাদের, যাঁদের শক্তি বা অধিকার নিজেদের

নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। যেমন, নিপ্‌পার নগরের অধীশ্বর হলেন এনলিল, বিশ্ব-শক্তির আধার যিনি, আর পৌর-দেবতা হলেও সূর্য-দেবতা ও চন্দ্র-দেবতার প্রকাশ বিশ্বের সর্বত্র। পৌর-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে বিশ্ব-রাষ্ট্রের সম্বন্ধ বিচার করতে গিয়ে এই যেসব জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কোন মীমাংসা করেন নি সুমেরীয়রা, বিরোধগুলিরও সামঞ্জস্য করেন নি। এই প্রসঙ্গে প্রঃ গর্ডন চাইল্‌ড্ বলেছেন—"Some moderns have seen in the universal worship of deities like Enlil, whose chief temple was at Nippur, the reflection of political unity in pre-historic times. But such contemporary documents as survive give no definite evidence of the supremacy of one city over all the rest till about 2500 B. C." অর্থাৎ নিপ্‌পারের নগর-দেবতা এনলিলের পূজা সার্বজনীন, এই কথা বিবেচনা করে কোন-কোন আধুনিক ব্যক্তির মত এই যে, ব্যাপারটি সমগ্র দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের পূর্বে গোটা দেশের ওপর কোন একটি নগরের আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফলকথা, আদিকালে পৌর-রাষ্ট্রগুলির ছিল স্বতন্ত্র সত্তা, তাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনও ছিল স্বতন্ত্র। গোষ্ঠীর ইষ্টদেবতা রূপেই প্রথমে এই প্রকৃতি-দেবতারা নগরের অধিপতি হয়েছিলেন। তারপর যখন একটি নগর-রাষ্ট্র অন্য নগরগুলির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করল এবং অন্যের রাজ্য আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করল, তখন সেই রাজধানীর প্রধান দেবতাও অন্যান্য পৌর-দেবতার প্রভু হয়ে উঠলেন। তখন বিজেতা ও বিজিত পৌর-রাষ্ট্রগুলির দেবতাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল, তারই ফলে গড়ে উঠল একটি দেবসমাজ—যাকে বলা হয় pantheon. উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্যাবিলন যখন সমগ্র সুমের দেশ জয় করে ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল, তখন ব্যাবিলনের নগর-দেবতা মারডুক সর্বময় কর্তা আনুর স্থান অধিকার করেছিলেন—আনু হলেন তাঁর অধীনস্থ দেবতা।

পৌর-দেবতাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটে কেন, তাঁদের প্রভুত্ব হ্রাস, আধিপত্যই বা হস্তান্তরিত হয় কেন তার একটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল।

কোন দর্শনতত্ত্বকে ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করা হয় নি। সাধারণভাবে বিজেতা ও বিজিত দেবদেবীর গুণাগুণের আলোচনা করা হয়েছে মাত্র। দেব-দেবীর গুণ ছিল যেমন, দোষও ছিল তেমনি, মানুষের মতই দোষগুণসম্পন্ন তাঁরা। আমরা দেখেছি, উরকে ধ্বংস করেছিলেন এনলিল বিশ্ব-দেব-সংসদের অভিরুচি অনুসারে। বিশ্বদেবতারা উরকে বিধ্বস্ত করে উরের দেবতা নান্নারকেই শক্তিহীন করতে চেয়েছিলেন। পরাভূত নগর-দেবতা কেবল যে বিজেতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছেন তা নয়—সমগ্র বিশ্বশক্তির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। বিশ্ব-রাষ্ট্রের কল্পনায় কোন স্থিতিশীল (static) শক্তির স্থান নেই। গতিশীল অবস্থা ও কালের মানদণ্ডে ওজন করেই পৌর-রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ণয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিশ্ব-দেবসংসদ।

গুডিয়ার স্বপ্ন-দর্শন

সকল দেবতাই সংসারী, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ আছে। মানুষ তাঁদের দাস মাত্র। দেবতারা সর্বপ্রকার নির্মাণ-কার্য পর্যবেক্ষণ করেন। লাগাসের নগর-দেবতা নিনগিরসুর সফরের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে পটেশী গুডিয়ার একটি শিলালিপিতে। গুডিয়া নূতন মন্দির নির্মাণ করেছেন, সেখানে সপরিবারে নিনগিরসু গেলেন বসবাস করবার জন্য। সঙ্গে পত্নী বাউ, পুত্র কন্যা পরিজনবর্গ, সেনাপতি, উজির, মন্ত্রী, সারথী, গায়ক, বাদক, সেচ-যন্ত্রাদির অধ্যক্ষ, মৎস্যপূর্ণ জলাশয়াদির রক্ষক, পশুপক্ষীর পালক, দুর্গ প্রভৃতি প্রতিরোধ ব্যবস্থার পরিদর্শক। দেখা যায়, রাজার সমস্ত গুণধর্ম ও অধিকার, সার্বভৌম কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়েছে দেবতাকে, আর পটেশী সেই দেবতারই প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির কাছে দেবতা স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে শাসন-কার্য, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহেরও পরামর্শ দিতেন। স্বপ্ন-দর্শনের একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছেন গুডিয়া তাঁর মন্দির নির্মাণের বর্ণনায়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে স্বপ্নে দেখলেন তিনি এক দীর্ঘাকার পুরুষ মূর্তি, মাথায় দিব্য মুকুট, পাখীর মতই দুই পার্শ্বে পক্ষপুট, অধোদেশে প্লাবনের তরঙ্গ। মূর্তির দুই দিকে শায়িত দুটি সিংহ। দিব্যপুরুষ মন্দির নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন গুডিয়াকে। আকাশে অমনি উষার আলোক ফুটে উঠল। তখন এক দিব্যাঙ্গনার আবির্ভাব হল, তাঁর হাতে একটি স্বর্ণ-ফলক

(stylus) আর মৃন্ময় চাকতি। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ সেই চাকতির ওপর উৎকীর্ণ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি। পরিশেষে দেখা দিলেন একজন যোদ্ধপুরুষ, রত্নখচিত চাকতির ওপর অঙ্কিত গৃহের একটি নকশা সহ। গুডিয়া আরও দেখলেন, একটি ইঁটের ছাঁচ ও ঝুড়ি নিকটেই পড়ে রয়েছে, পক্ষী-মানবেরা (bird-men) আধারে জল ঢালছে, আর একটি গর্দভ দেবতার পাশে দাঁড়িয়ে অধীরভাবে খুর দিয়ে মাটির ওপর আঘাত করছে। নিদ্রাভঙ্গের পর গুডিয়া এই স্বপ্নের মর্মোদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করলেন। নগর-দেবতা নিনগিরস্থর মন্দির নির্মাণের প্রত্যাদেশ এই স্বপ্ন, মোটামুটিভাবে তা তিনি বুঝেছিলেন বটে, কিন্তু স্বপ্নের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির অর্থ বুঝতে পারলেন না। তখন তিনি রাজ্যের আর একটি নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নানসে-র কাছে গেলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে বিশেষ পটিয়সী বলে খ্যাতি ছিল এই দেবীর—স্বপ্ন-দর্শনের কথা তাঁকে নিবেদন করলেন গুডিয়া। দেবী বললেন, দিব্য মুকুট পরিহিত পক্ষধারী দীর্ঘাকৃতি বিশাল পুরুষ স্বয়ং নিনগিরস্থ—তিনিই গুডিয়াকে মন্দির নির্মাণ করতে আদেশ দিয়েছেন। ঊষার আলোক গুডিয়ার ভাগ্য-দেবতা—তিনিই নির্মাণ-কার্যের উপকরণাদি সংগ্রহে গুডিয়াকে সাহায্য করবেন। দিব্যাঙ্গনা নির্দেশ দিচ্ছেন রাশি-নক্ষত্রের কোন শুভ লগ্নে নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করতে হবে। নকশাটি মন্দিরেরই নকশা। পক্ষী-মানবের জলধারা গুডিয়ার দিবারাত্র অবিশ্রান্ত পরিশ্রম স্থচনা করে। গর্দভের অধীর পদক্ষেপ কর্মারম্ভে গুডিয়ার গভীর উৎকণ্ঠারই দ্যোতক।

বিশ্ব-দেবতা ও পৌর বা গণদেবতাদের প্রকৃতি ও দেবসমাজের গঠন প্রভৃতি আলোচনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত রয়েছে আদিকালের স্থমেরীয় পুরাণ-কথা (Myths)। এই পুরাণ-কাহিনীগুলি স্থষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্ব-সংগঠন বিষয়ক। ধর্মচিন্তা প্রতিফলিত হয় পুরাণ-কথায়। তাই আমরা এখন স্থমেরীয় পুরাণের কথা ও কাহিনী প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

॥ সাত ॥

সুমেরীয় পুরাণ-কাহিনী

দেবতাদের নিয়ে পুরাণ-কাহিনী রচিত হয়েছে সকল প্রাচীন দেশে—যেমন মিশর ও সুমের দেশে, তেমনি গ্রীসে ও ভারতবর্ষে। পুরাণ-কাহিনী রূপকথা নয়, রূপকও নয়। রূপকথার উপভোগ্য রসবস্তুটি হল অলীক কল্পনা। পুতুলের বিয়ে একটি অলীক কল্পনা মাত্র, শিশু সেই কল্পনাকেই জড়িয়ে ধরে প্রচুর আনন্দ লাভ করে। তেমনই যখন কতকগুলি অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে একটি কথাচিত্র অঙ্কিত করে শিশুর মনের সামনে ধরা যায়, তখন সেটা হয় একটি চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা যার সঙ্গে সত্য-মিথ্যার কোন সম্পর্ক নেই। পুরাণ-কথা যে রূপকথা নয় তা বোঝা যায় এই থেকে যে, পুরাণ-কথা মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য তৈরী হয় নি যেমন হয়েছে রূপকথা। তেমনি আবার রূপকও কল্পনা, ছদ্ম হলেও অলীক নয়। রূপকের মধ্যে আমরা পাই সত্যের প্রচ্ছন্ন অনুভূতিকে বোধগম্য আকারে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা। পুরাণের কল্পনাকে রূপকের পর্যায়ে ফেলা চলে না। রূপকের বাইরের আবরণটিকে খুলে যেমন ফেলা হল, অমনি ভিতরকার সত্য রূপের সন্ধান মেলে। অন্তর বাহির এক নয় রূপকের, বাইরে এক জিনিস ভিতরে আর একটি। পুরাণ-কথা তেমন নয়—ঘরে বাইরে তার একই জিনিস, বাইরের রূপ আর ভিতরের বস্তু বলে আলাদা দুটি পদার্থ নেই। আসলে, পৌরাণিক কল্পনাকে চিন্তাধারার প্রকৃত রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সভ্যতার শৈশবে মানব-মনে যেসব ছাপ এঁকে রেখে গেছে অভিজ্ঞতা নানারকম নৈসর্গিক অবস্থার, সেই ছাপগুলিই কল্পনার আকারে বেরিয়ে পড়েছে পুরাণ-কথার মধ্যে, যেমন বেরোয় কবির কাব্যে। কল্পনাকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা করেন কবি, তাঁর কাব্যে থাকে উচ্ছ্বসিত আবেগ ও অতিশয়োক্তি। কোন নির্জীব পদার্থকে কবি যখন 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন, তখন তিনি ভালই জানেন যে বস্তুটির চেতনা নাই, তাকে মধ্যম পুরুষে সম্বোধন কল্পনার লীলা মাত্র। পুরাণের কল্পনা কিন্তু এ ধরনের কল্পনা-বিলাস নয়। পুরাণ-রচয়িতার চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিকে বুঝতে হলে সেই রচনার যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। জীবন-পথের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে মানুষ তখন প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে দেখত সজীব রূপে—

তার কতগুলি মিত্রশক্তি আর কতগুলি করে মানুষের অপকার। এই শক্তিগুলির জন্ম ও জীবন-লীলা নিয়ে যে কল্পনা জেগে উঠত তার মনে, সেই কল্পনাকে সত্যের জীবন্ত রূপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না সে। তার এই কল্পনায় না ছিল দার্শনিক চিন্তার বাঁধা-ধরা যুক্তির গ্রন্থি, না ছিল সত্যাসত্য বিচার। নৈসর্গিক শক্তির বিচিত্র অনুভূতিগুলি তার কল্পনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কথারূপের আকারে ফুটে উঠত, যেমন ফোটে রামধনু আকাশের গায়ে। রামধনু একটি নৈসর্গিক সত্য, পুরাণের কথা-রূপও ছিল তাই, কল্পনাকে রাঙিয়ে দিত, নিজেও ফুটে উঠত সত্য হয়ে।

পুরাণ-কথার যে সংজ্ঞা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল, সর্বদেশের সর্বকালের পৌরাণিক কাহিনীগুলি যে এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বে না, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে যেসব পুরাণ রচিত হয়েছিল, যেমন বিষ্ণু-পুরাণ, বায়ু-পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ—এই পুরাণগুলিকে 'মিথ' (Myth) বলা চলে না। 'মিথ'ই খাঁটি পুরাণ-কথা। ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্রে দেবতার জীবন-লীলার বৃত্তান্তগুলি থাকলেও, মূলত এইসব গ্রন্থ দর্শনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অধ্যাত্ম-জ্ঞানের আধার বলে মনে করা হয় পুরাণগুলিকে। অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্ব, সমুদ্র-মন্থন প্রভৃতি বিবরণের মধ্যে 'মিথ' বা খাঁটি পুরাণ-কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদের উর্বশী-পুরুরবা উপাখ্যানটি কাব্য যেমন, তেমনি আবার ওটিকে 'মিথ'ও বলা যায়। ফলকথা, ভারতের পুরাণ-যুগের তত্ত্ববিচার ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে আসল 'মিথে'র স্থান নেই, অতি প্রাচীন কালের কয়েকটি 'মিথ' তখনো টিঁকে ছিল মাত্র। পক্ষান্তরে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার অধিবাসীদের কল্পনা কতগুলি সহজ আখ্যায়িকা রচনা করেছিল, মানুষের মনে আদিকাল থেকে জীবনমরণ সম্বন্ধে নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবে যেসব প্রশ্ন উঠেছে তারই জবাব স্বরূপে। সেই কথাগুলির মধ্যে কোন দর্শনতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা নেই—আছে বিশ্ব-রাষ্ট্র কল্পনার পটভূমিকায় বিবিধ প্রাকৃতিক দেবদেবীর লীলার মধ্যে একটুখানি মানবিক মনস্তত্ত্বের খেলা। সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে রাখাল বালক এটানার আশ্চর্য অভিযানের কথা। তার মেষপাল যখন বন্ধ্যাত্ব দোষযুক্ত হয়ে আর শাবক প্রসব করল না, তখন জীবনের মূল কোথায় তার সন্ধানে সে উঠেছিল আকাশপথে একটি ঈগল পক্ষীর পৃষ্ঠে চড়ে। কিন্তু তার ব্রত সফল হল না।

আকাশ থেকে ঠেলে ফেলা হয়েছিল তাকে ধরণীতলে। মৃত্যু-রহস্য নিয়ে রচিত হয়েছে আর একটি কাহিনী—ধীবর আদাপার উপাখ্যান। দক্ষিণ-বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিলেন আদাপার নৌকাখানা উলটিয়ে, যখন সে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। ক্রোধান্ধ আদাপা করলেন তখন দেবীর পক্ষচ্ছেদ। আকাশ-দেবতা তলব করলেন আদাপাকে তাঁর দরবারে, কিন্তু ধীবর তাঁকে এমনিভাবে তোয়াজ করে খুশী করল যে তিনি তাকে দিলেন রুটি-জল, যা খেলে মানুষ অমর হয়। সেই রুটি-জল যদি খেত ধীবর তা হলে মানুষ অমরত্ব লাভ করত। মানুষের দুর্ভাগ্য আদাপার মনে সন্দেহ জেগেছিল—তাই রুটি-জল সে খায় নি। ফলে সে নিজে ও মনুষ্য জাতি—উভয়েই অমরত্বরূপ অমূল্য নিধি হারিয়ে বসল। মানুষের চিরবাঞ্ছিত অমরত্ব পেয়ে-হারানোর এই যে কাহিনী তারই ভাবধারা প্রতিবিম্বিত হয়েছিল অতি সুন্দররূপে 'গিলগামেশ উপাখ্যান' নামে ব্যাবিলনের প্রসিদ্ধ পুরাণ-কথায়, আমরা তা পরে দেখতে পাব।

জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে একশ্রেণীর আখ্যায়িকা দেখা যায় সুমেরীয় পুরাণ-কথায়, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, টিলমুন উপাখ্যান। কাহিনীটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল, তাই থেকে অকৃত্রিম পুরাণ-কথার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে।

টিলমুন উপাখ্যান

জল-দেবতা ও পৃথ্বী-দেবীর যোগাযোগের ফলে কিরূপে বিবিধ দেব-শক্তির জন্ম হল, সেই কথা বলা হয়েছে এই কাহিনীটিতে। পারস্য উপসাগরের কূলে বাহ্‌রিন নামে যে দ্বীপ আছে তারই প্রাচীন নাম টিলমুন। দেবতারা যখন পৃথিবীকে বণ্টন করেছিলেন তখন এই দ্বীপটি পড়েছিল জল-দেবতা এনকি এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিন্‌হারসাগা-র ভাগে। এই দুই দেবদেবীকে উদ্দেশ করেই কাহিনীটির মুখবন্ধে বলা হয়েছে : "দেবগণ সহ তোমরা যখন পৃথিবীকে বণ্টন করছিলে, টিলমুন দেশটি ছিল তখন শুদ্ধ, নির্মল, উজ্জ্বল। দাঁড়কাক ডাকত না, মোরগও ডাকত না। সিংহ হত্যা করত না, নেকড়ে বাঘ মেষশাবককে ধরত না।...চক্ষুর ব্যাধি বলত না আমি চোখের ব্যাধি।

মাথাধরা বলত না আমি শিরোরোগ। বৃদ্ধা বলত না আমি বৃদ্ধা। বৃদ্ধও বলত না আমি বৃদ্ধ।" এমনি যখন পৃথিবীর অবস্থা—অর্থাৎ, পৃথিবীর সেই আদিকালে যখন কোন প্রাণী বা পদার্থ নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নি, পৃথক প্রকৃতিও তাদের মধ্যে দেখা দেয় নি, যুগ-প্রভাতের সেই সন্ধিক্ষণটিতে পৃথিবী ছিল একটি ফুলের কুঁড়ির মত, ফুটি-ফুটি করছে, কিন্তু ফোটে নি। পৃথ্বী-দেবীর কথামত জল-দেবতা টিলমুন দ্বীপকে জলসিক্ত করলেন, তারপর পৃথ্বী-দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। তাদের জন্মাল একটি দেবকন্যা—নাম নিনসার। এই দেবকন্যাটি আর কেউ নয়, উদ্ভিদের চারা। নদীর জল দু কূল প্লাবিত করে নেমে যায়, তারপর জন্মায় তটভূমির ওপর উদ্ভিদ। ঠিক এই চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে পুরাণ-কথায়, একটু চিন্তা করলেই তা বেশ বোঝা যায়। জল-দেবতা ছিলেন লম্পট প্রকৃতির, কন্যা নিনসারের জন্ম পর্যন্ত পৃথ্বী-দেবীর সঙ্গে মিলিত থাকেন নি তিনি, পূর্বেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। বসন্তকালে উদ্ভিদ নেমে আসে যেমন নদীর জলপ্রান্তে, তেমনি এসে দেখা দিয়েছিল একদিন উদ্ভিদের দেবী নিনসার নদীর ঘাটে। জল-দেবতা এনকি দেখলেন এই কিশোরীকে, সহস্র বাহু মেলে আলিঙ্গন করলেন তাকে। এই মিলনের ফলে উদ্ভিদ-দেবী জন্মদান করলেন আঁশের (Fibra) দেবীকে। আঁশের দরকার হয় কাপড় বোনার জন্য। আঁশের দেবীকে নিয়ে পূর্বের ব্যাপারের পুনরভিনয় ঘটল, এবং তার গর্ভে তখন জন্মাল রঙের দেবতা। রঙের প্রয়োজন হয় সুতোকে রং করতে। তারপর রঙের দেবতাকে নিয়ে যে কাণ্ডটি ঘটল তার ফলে জন্মাল বস্ত্র ও বয়নের দেবী—উটু। এখন আর জল-দেবতার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কারও অজানা রইল না। উটু দেবী দাবি করে বসল জল-দেবতার কাছে, তাকে বিবাহ করতে হবে। অগত্যা এনকি রাজি হলেন এবং প্রচুর উপহার এনে হাজির করলেন তার কাছে। কিন্তু সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল যখন অতিরিক্ত মদ্যপান করে উটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল আর সেই অবস্থায় জল-দেবতা তার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন। এনকির উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে পৃথ্বী-দেবীর ক্রোধের ও ঘৃণার অবধি রইল না। জল-দেবতাকে তিনি ভয়ংকর অভিশাপ দিলেন—জল যেন ভূগর্ভের অন্ধকার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং গ্রীষ্মকালে যখন নদী, নালা, কূপ, তড়াগ প্রভৃতি শুকিয়ে যায় তখন যেন তার ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটে। এনকির ওপর এই যে কঠোর

অভিসম্পাত হল, তা দেখে সকল দেবতাই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের অনুরোধে পৃথ্বী-দেবী জল-দেবতাকে আংশিকভাবে শাপমুক্ত করে তার ঔরসে আটটি দেবতার জন্মদান করলেন। এই দেবতাদের কার্য ও স্থান নির্ণয় করে আখ্যায়িকা শেষ করা হয়েছে।

সাবলীল ছন্দে প্রাঞ্জলভাবে পৃথিবীর আদিকাল থেকে শুরু করে উদ্ভিদের জন্ম, সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত পর্যন্ত সব বৃত্তান্ত এই আখ্যায়িকায় বলা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু আছে। পৃথিবীর আদি অবস্থায় 'দাঁড়-কাক ডাকত না', 'সিংহ নেকড়ে বাঘ হত্যা করত না'—কথাগুলি আমরা বেশ বুঝি। কিন্তু যখন বলা হয়, 'চোখের ব্যাধি বলে না আমি চোখের রোগ', 'মাথাধরা বলে না আমি শিরোরোগ', তখনই মনে ধাঁধা লাগে—সত্যি কি এগুলি কথার কথা? না, সিংহ-ব্যাঘ্রের মত ব্যাধিকেও মনে করা হত শুধু জীবন্ত পদার্থ নয়—দস্তুরমত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ যে অনুভব করতে পারে আমি অমুক রোগ। এক কথায় এই প্রশ্নের জবাব এই যে, আদিম মানব বস্তুগুলিকে দেখে 'এটা' 'ওটা' 'সেটা' বলে নয়, নিজের সঙ্গে বস্তুগুলির সম্বন্ধকে বিচার করে সে 'আমি-তুমি' ভাবে—অর্থাৎ সে নিজে যেমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ, যাকে বলে সে 'আমি', পদার্থগুলিও তেমনি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যাকে বলা যায় 'তুমি'। এমনি করে জগতের যাবতীয় পদার্থকে গ্রহণ করা হয়েছে নিতান্ত সহজভাবে। দর্শন-শাস্ত্রের বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিতর্কের কোন স্থান নেই এইরূপ চিন্তাধারার মধ্যে।

প্রকৃতি ও মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে শৃঙ্খলা (world order) বিরাজ করছে, সেই শৃঙ্খলার উৎপত্তি প্রণালী ও ধারা সম্বন্ধেও কতগুলি কাহিনী আছে। সুমেরীয়দের বিশ্ব-রাষ্ট্ররূপের কল্পনা বিষয়ে পূর্বে অনেক কথা বলা হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম ও সমাজ-শৃঙ্খলা সেই সার্বজনীন রাষ্ট্রেরই বিধান। বিশ্ব-রাষ্ট্রের সেই বিধানকে প্রবর্তন ও সংরক্ষণের ভার জল-দেবতা এনকির ওপর। এই ভার দিয়েছেন তাঁকে দেবাদিদেব আনু ও দেব-সেনাপতি এনলিল। কৃষির জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থাসমূহ পরিদর্শন করেন এনকি, ধরণীকে শস্যশ্যামলা করে তোলেন। নদী জলে ভরে ওঠে, মাছ ছুটোছুটি করে বেড়ায় তার মধ্যে, এ ব্যবস্থা তাঁরই। কৃষি-কার্য, ইষ্টক ও গৃহাদি

নির্মাণ প্রভৃতি তত্ত্বাবধান করে তাঁরই পরিদর্শকেরা। দেবতার সুব্যবস্থায় পৃথিবী সত্যই উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু এ সত্ত্বেও মানুষের জীবন মঙ্গলময় হয় নি। জন্ম থেকে ব্যাধিগ্রস্ত এমন মানুষ আছে—আর আছে ক্লীব, নপুংসক, বন্ধ্যা নারী, জরা। দেবতার প্রশাসনের এইসব ত্রুটিবিচ্যুতির অনুব্যাখ্যান প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা রয়েছে মৃৎলিপি লেখনে, কিন্তু চাকতিটি পাওয়া গেছে ভগ্নাবস্থায়, তাই সম্পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নি। স্থূলভাবে যে ধারণা করা যায় এই ভগ্ন চাকতিটির লিখন থেকে, তাই এখানে বলা হল :

এনকি-নিনমা উপাখ্যান

প্রথমেই বলা হয়েছে সেকালে জীবিকা-নির্বাহের জন্য দেবতাদেরও পরিশ্রম করতে হত। কাস্তে দিয়ে শস্য কাটতেন তাঁরা, কুড়ুল দিয়ে কাটতেন গাছ। খাল কাটতেন—খাদ্যের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হ'ত তাঁদের। কিন্তু কায়িক পরিশ্রম তাঁরা ঘৃণা করতেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার যে দেবতার ওপর, সেই জল-দেবতা এনকি তখন অনন্ত শয্যায় ঘুমিয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে এলেন দেবতারা, এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মাতা নামমু, যিনি পাতালের দেবী। তারপর কিরূপে পাতালের উপরিভাগে একটি কর্দমের স্তর প্রস্তুত করে তার ওপর পৃথ্বী-দেবী নিনমাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল তার বর্ণনা আছে। কিন্তু এখানেই ভাঙা চাকতিটির বিবরণীতে একটি বৃহৎ ছেদ ঘটেছে। মানবজাতির সৃষ্টির কথা লেখা ছিল চাকতির যে স্থানটিতে, সেই জায়গাটি গেছে ভেঙে, তাই এখানে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিষয় আমরা কিছু জানতে পারি নি। তারপর গল্পের যে বোধগম্য অংশ তা এইরূপ : জল-দেবতা এনকি পৃথ্বী-দেবী নিনমা ও তার মাতাকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্রেষ্ঠ দেবতারাও নিমন্ত্রিত অতিথি। সুদক্ষ কর্মী এনকির প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ, কিন্তু এই প্রমোদোৎসবের মধ্যেও শুরু হয়ে গেল বাগ্‌বিতণ্ডা। এনকি ও নিনমা উভয়েই অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন। মত্তাবস্থায় পৃথ্বী-দেবী নিনমা জল-দেবতাকে খোঁচা দিয়ে পরুষকণ্ঠেই বললেন, "আসলে মানুষের শরীরের আবার ভাল মন্দ কি? খুশিমত আমি তার শরীরকে ভালও করতে পারি, মন্দও করতে পারি।" প্রত্যুত্তরে এনকি

বললেন, "ভাল বা মন্দ মানুষের দশা যেমন ইচ্ছা তৈরি করতে পার তুমি, এ কথা যদি সত্য হয়—তা হলে আমিও তোমার তৈরি ভাল দশাকে করতে পারি মন্দ, আর মন্দ দশাকে করতে পারি ভাল, তাও তেমনি সত্য।"

তখন আরম্ভ হল উভয়ের উভয়কে পরীক্ষা। পৃথ্বী-দেবী খানিকটা কর্দম তুলে নিয়ে ছয়টি বিকলাঙ্গ পুরুষ ও নারী নির্মাণ করলেন—তারা হল কেউ জন্ম থেকে মূত্রাশয়ের ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ, কেউ বা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক আর কেউ বা নপুংসক। সঙ্গে সঙ্গেই এনকি এদের প্রত্যেকেরই সমাজ-জীবনে এক একটি স্থান নির্ণয় করে দিয়ে তাদের মন্দের প্রতিকার করলেন। নপুংসক হল রাজার খোজা-ভৃত্য এবং বন্ধ্যা নারীকে করা হল অন্তঃপুরে রাজ্ঞীর পরিচারিকা। এমনি করে বিকলাঙ্গ নরনারীর কোন-না-কোন গতি করে দিলেন এনকি। তারপর প্রস্তাব করলেন, "এবার আমি সৃষ্টি করব মানুষের দশা। পার যদি কর দেখি তার প্রতিবিধান।" তারপর তিনি মানুষের নানান দশার সৃষ্টি করলেন—কিন্তু ঠিক এইখানেই চাকতি আবার ভেঙে যাওয়ায় দশাগুলির বিবরণ ধ্বংস পেয়েছে। শুধু পাওয়া যায় একটি অতিবৃদ্ধ ব্যক্তির বিবরণ। তার জীবন নিঃশেষিত হয়ে আসছে, চোখে দেখতে পায় না সে। তার হাত কাঁপে, সে কাতর যকৃৎ ও হৃদ্‌পিণ্ডের যন্ত্রণায়। এমনি একটি জীব সৃষ্টি করে নিনমাকে বললেন এনকি, "তোমার সৃষ্ট ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করেছি আমি, এখন তুমি আমার সৃষ্ট মানুষের বাঁচবার উপায় করে দাও।" নিনমা পড়ল ফাঁপরে। প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারে না এই জীবটি। এক টুকরো রুটি দিলে সেটি যে তুলে নিয়ে খাবে, এমন শক্তিও নেই তার। এমন লোককে বাঁচাবে কেমন করে নিনমা? চটে-মটে বলল সে, এটা মানুষই নয়। এনকি করে তাকে ঠাট্টা। ভগ্ন মৃৎখণ্ডের লিপি-লেখন থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে, বার্ধক্যজনিত আধিব্যাধি এনকি সৃষ্টি করেছিলেন নিনমাকে জব্দ করবার জন্য। দেবতার পক্ষে যা ছিল খেলা মাত্র মানুষের পক্ষে তাই হয়েছে মৃত্যু। নিনমা পারে নি জগৎশৃঙ্খলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজ-জীবনে আধিব্যাধির একটি স্থান করে দিতে। ক্ষোভে রোষে নিনমা তখন এনকিকে এই বলে অভিশাপ দিল যে, এখন থেকে জল-দেবতা স্বর্গেও থাকবেন না, পৃথিবীতেও থাকবেন না—তাঁর বাসভূমি হবে পাতাল-

পুরীর অন্ধ গহ্বরে। কাহিনীটির পরিসমাপ্তি হল, টিলমুন উপাখ্যানে যেমন দেবসমাজের উপরোধে উভয়ের মধ্যে আপস হয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে।

এনলিল-নিনলিল উপাখ্যান

কথিকাটিতে চন্দ্র ও তার তিন ভ্রাতার জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্রের ভাইরা সব পাতালপুরীর বাসিন্দা। এমন উজ্জ্বল রজতশুভ্র চন্দ্র-দেবতা, তাঁর ভ্রাতৃগণ পাতালপুরীর অধিবাসী হল কিরূপে? আখ্যায়িকায় নগরের প্রাচীন নাম আর নদীনালার বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নায়ক-নায়িকার রঙ্গভূমি সুমের দেশের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর-রাজ্য নিপ্‌পার। সেখানে একটি দেবসমাজ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর নাটকের মূল ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরাও দেবতা। নায়ক প্রবল শক্তিমান ঝঞ্ঝার দেবতা, যার নাম এনলিল। নায়িকা দেব-কুমারী নিনলিল। কুমারীর মাতা দেবী নিনসেবারগুন্থ।

মাতৃদেবী কুমারী কন্যাকে নদীর জলে অবগাহন করতে বার-বার বারণ করেছিলেন—

> "ওলো, স্বচ্ছ নদী-নীরে করিস নি কো স্নান,
> পার বেয়ে নালার তটে উঠিস নি, নিনলিল।
> দীপ্ত দুটি আঁখির ঠারে চাইবে তোর পানে প্রভু এনলিল,
> দীপ্ত চোখ মেলে রবে গিরিশস্ত পিতা,
> চুপি চুপি দেখবে তোরে রাখাল-দেবতা,
> বুকে তুলে লবে সোহাগভরে, মুখে দেবে চুমু।"

মার মানা শুনল না তরুণী, আর কোন তরুণীই বা তা শোনে? সে গেল নদীর ঘাটে। মা যা বলেছিলেন হলও ঠিক তাই। এনলিল দেখলেন নিনলিলকে, নানা ছলে তার মন ভুলোতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজি হল না সে। তখন তাকে জোর করেই গ্রহণ করলেন এনলিল। ফলে নিনলিল হল অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভে ছিল তখন চন্দ্র-দেবতা 'সিন'।

এনলিলের এই অনাচার যখন দেবসমাজ জানতে পারল, তখন পঞ্চাশ জন দেবতা নিয়ে একটি সভা বসল, আর সেই সভায় হল এনলিলের বিচার। বলাৎকারের অপরাধে এনলিলের শাস্তি হল, নির্বাসন।

পাতালপুরীতে নির্বাসন। এনলিল চললেন সেখানে দেব-সভার আদেশ পালন করতে, আর তাঁর পিছে-পিছে চলল নিনলিল। এনলিল চান না, দীর্ঘ পথ সে তাঁর অনুসরণ করে। তাঁর ভয় হল, মেয়েটাকে অসহায় অবস্থায় একাকিনী পেয়ে তিনি নিজে যেমন অত্যাচার করেছেন তার ওপর, তেমনি জুলুম আর কেউ করতে পারে। পথে একটি নগরদ্বারে এসে প্রথমেই চোখে পড়ল জনৈক দ্বার-রক্ষক। তখনই মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল এনলিলের।

"ডেকে বলে দ্বার-রক্ষকেরে এনলিল :
হে দ্বারের মানুষ, ওহে খিলের মানুষ,
ওগো তালার মানুষ, পবিত্র আগল-ধারী মানুষ,
তোমার রানী নিনলিল আসছেন।
সুধায় তোমারে যদি কোথা আমি—
সে কথা ব'লো না তারে।
... ...
কী মধুর, রূপসী কুমারী,
সাবধান! আলিঙ্গন ক'রো না কো তারে, চুম্বন ক'রো না।
কত মধু কত রূপ নিনলিলের,
এনলিল দেখেছে তারে দীপ্ত আঁখি দিয়ে।"

তারপর দ্বার-রক্ষকের পরিচ্ছদ পরে তার স্থান গ্রহণ করলেন এনলিল। নিনলিল সেখানে এল, চিনতে পারল না এনলিলকে। মনে করল, সে দ্বার-রক্ষক। তখন সেই ছদ্মবেশী দ্বার-রক্ষক বলল, এনলিল তার প্রভু, তিনি তাকে আদেশ দিয়েছেন নিনলিলকে গ্রহণ করতে। নিনলিলও বলল, তার গর্ভে আছেন চন্দ্র-দেবতা সিন। তাই শুনে দ্বার-রক্ষক বিব্রত হয়ে পড়েছে এমনি ভান করল। বলল, প্রভুর ঔরসে যার জন্ম সেই সোনার চাঁদকে পাতালের অন্ধকূপে নিয়ে যাবে কেমন করে? সে তখন প্রস্তাব করল, নিজে সে উৎপাদন করবে একটি পুত্র-সন্তান যে প্রভু-পুত্র চন্দ্রমার স্থান অধিকার করে পাতালপুরীতে যাবে।

"প্রভুর সোনার চাঁদ ছেলে যাক স্বর্গে,
আমার ছেলে যাক পাতালপুরীতে।
প্রভুর ছেলের বদলে আমার ছেলেটি যাক রসাতলে।"

আলিঙ্গন করলেন এনলিল নিনলিলকে, গর্ভের সঞ্চার হল। চন্দ্র-দেবতার একটি ভাই জন্মাল। আবার চললেন এনলিল, নিনলিলও পিছু নিল। আগের ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল। এবার এনলিল ধরলেন খেয়াঘাটের পাটনীর বেশ। নিনলিলের গর্ভে তৃতীয় সন্তান জন্মাল। তারপর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও চতুর্থ সন্তানের জন্ম। কবিতাটি হঠাৎ এইখানে এনলিলের একটি স্তবগানের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়েছে। "জয় জয় প্রভু এনলিল, জয় জয় মাতা নিনলিল।"

আখ্যায়িকাটি সুরুচির পরিচয় দেয় না সত্য, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে সভ্যতার সেই উষাক্ষণে সকল সমাজেই নারীর মর্যাদাকে মূল্য দেওয়া হত খুবই অল্প। কুমারীর ধর্ষণ তার নিজের লাঞ্ছনা নয়, লাঞ্ছনা তার অভিভাবকের। বিবাহিতা নারীর নির্যাতন তার স্বামীর প্রতি অপরাধ। আর সে অপরাধ সামাজিক, নারীত্বের অপমান গণনার মধ্যেই আসে না। এই সময়ের বহু শতাব্দী পর ভারতের সুসভ্য বৈদিক যুগেও নারী-ধর্ষণ দেখতে পাই আমরা, মহাভারতের আদি পর্বে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। একজন ব্রাহ্মণ উদ্দালক-পত্নীকে তার স্বামীর ও পুত্রের সামনেই জোর করে ('বলাৎ ইব') অন্যত্র নিয়ে গেল। পুত্র শ্বেতকেতু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কিন্তু উদ্দালক বললেন, "তাত! রাগ ক'রো না, ধৈর্য ধর। এষঃ ধর্মঃ সনাতনঃ (আদিপর্ব ১।১২২।১৪)।" তিনি আরও বললেন, "পৃথিবীতে সর্ববর্ণের অঙ্গনাগণ অনাবৃতা। মনুষ্যেরা স্ব-স্ব বর্ণের নারীর সঙ্গে গো-বৎ আচরণ করে।" উদ্দালক বৃহদারণ্যক উপনিষদের একজন ঋষি, যাজ্ঞবল্ক্যের সমসাময়িক। যাজ্ঞবল্ক্য যে সমাজের মানুষ, সেখানেই যখন এরূপ অবস্থা তখন তার বহু পূর্ব যুগের সমাজের উপরোক্ত আখ্যায়িকাটিতে ব্যভিচার দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করা চলে কি ? এই উপাখ্যানের সার্থকতা হল নীতির বিচার নয়, নিনলিলের তিনটি দেব-শিশুর জন্ম দান। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করেই উপাখ্যানটিকে বুঝতে হবে, তার ব্যাখ্যা করতে হবে। জ্যোতির্ময় চন্দ্র-দেবতার তিন ভাই হল কেন, পাতালপুরীর শক্তি-নিচয় রূপেই বা তাদের আবির্ভাব হল কেন ? এইসব প্রশ্নের যে জবাব ফুটে উঠেছে মানস-লোকে, সেই মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলিকে ভাষায় রূপ দেওয়া হয়েছে কাহিনীটিতে। এনলিল বাত্যা-দেবতা, বিশৃঙ্খল উন্মাদশক্তি, উর্ধ্বতন জগতেই বিরাজ করেন তিনি।

এই উদ্দাম ঝঞ্ঝা-দেবতা মানে না কোন সমাজব্যবস্থা, তার অস্থির প্রকৃতিই হল তার দেবসমাজ থেকে নির্বাসনের কারণ। উর্ধ্বলোকে তিনি জন্ম দিয়েছিলেন উজ্জ্বল চন্দ্র-দেবতাকে, আর সেই শক্তিমান প্রভু পাতালে অন্ধ-গহ্বরে ঢুকে নারকীয় শক্তিপুঞ্জ সৃষ্টি করলেন। এনলিলের শিশুসন্তান স্বর্গীয় ও নারকীয়—এমন বিপরীতধর্মী হল কেমন করে? না, এনলিলের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে সেই বিরুদ্ধ-ধর্ম, আলোর মাঝে আঁধার। 'মিথ'টির পিছনে রয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্ররূপ কল্পনা। এনলিল, নিনলিল, সিন সকলেই প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের বিভিন্ন রূপ।

সারা বিশ্বকে রাষ্ট্ররূপে কল্পনা করে দেবতাদের সেই রাজ্যের শাসক সম্প্রদায় বলে মনে করা হত। বিশ্ব-রাষ্ট্রের পটভূমিকায় এই যে সব পুণ্য-কাহিনী রচিত হয়েছিল, তাই থেকেই আমাদের সুমেরীয় ধর্মের মর্ম গ্রহণ করতে হবে। দর্শন-তত্ত্বের আবির্ভাব হয় নি তখনো, সুমেরীয়দের ধর্ম দর্শন-চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন যুক্তি সিদ্ধ আর কোন যুক্তিটিই বা অসিদ্ধ, এরকম তর্কবিচার তখনো মানুষের মনে জাগে নি। সম্ভব-অসম্ভব বিচারশূন্য, যুক্তি-তর্কবর্জিত আদিম মনোবৃত্তি, যা দেখতে পাই আমরা আদিম জাতির সমাজে, সেই মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ করতে পারে নি তখনো সুমেরীয়রা। মানুষ, জীবজন্তু যেমন জীবন্ত, বিশ্ব-প্রকৃতির অন্যান্য বস্তু—যেমন উদ্ভিদ, পাথর, নক্ষত্র প্রভৃতি—তারাও তেমনি প্রাণবন্ত। এই আদিম বিশ্বাস, যাকে বলে animism বা animatism—এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পেয়েছি আমরা পূর্বে বর্ণিত 'লবণ-স্তুতি'র মধ্যে। অর্থাৎ যখন লবণকে ব্যক্তিরূপে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—"হে লবণ, তোমার জন্ম শুদ্ধ স্থানে। এনলিলের বিধানে তুমি হয়েছ দেবগণের খাদ্য" ইত্যাদি। এখানকার ধর্মে ছিল বহু দেবতা, সবই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি—সর্বশক্তির মূলাধার কোন আদি কারণের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একেশ্বরবাদ কল্পনায় আসে নি তখনো।

প্রকৃতপক্ষে কি মিশর, কি সুমের দেশ বা সিন্ধু উপত্যকা সর্বত্রই সভ্যতার উন্মেষক্ষণে তখন আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণ ছিল ইন্দ্রজালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর সেই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাকে অঘটন-ঘটনপটিয়সী বলেই মনে করা হত। প্রাক্‌দর্শন যুগের দেবতারা প্রত্যেকে ছিলেন এক একটি সেরা ঐন্দ্রজালিক,

ইন্দ্রজাল প্রভাবে দেবতার মুখের বাণী সৃষ্টি করে জাগতিক বস্তু, এবং সেই বস্তুগুলির মধ্যেই দেবতা প্রাণরূপে অবস্থান করেন, এই ধরনের বিশ্বাস থেকেই স্থমেরের যাবতীয় পুরাণ-কাহিনী রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর গর্ডন চাইল্ড্ বলেছেন, "It is an accepted principle of magic among modern barbarian's as among the literate peoples of antiquity that the name of a thing is mystically equivalent to the thing itself; in Sumerian mythology the gods create a thing when they pronounce its name." (p. 135, *What Happened in History* by Gordon Childe).

॥ আট ॥

নগর—নাগরিক—সমাজ

ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকায় মাঝে-মাঝে দেখা যায় পাহাড়ের মত বৃহদাকার কৃত্রিম ঢিবি, যার নাম 'জিগ্‌গুরাট' (Ziggurat)। 'জিগ্‌গুরাট' শব্দটির অর্থ 'স্বর্গের পাহাড়' বা 'ঈশ্বরের পর্বত'। স্তূপগুলি প্রাচীন কালের এক একটি বৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। বিরাট সাত-আটতলার সৌধ এইসব মন্দির, নিচের আয়তন বিলক্ষণ চওড়া, উপরে ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে এসেছে। ধাতু-যুগের সুমেরীয় নগরসমূহ মন্দিরকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আকারে আয়তনে প্রস্তরযুগীয় গ্রামের পরিবর্ধিত সংস্করণ এই নগরগুলি, প্রাকার-বেষ্টিত, আয়তন আধুনিক শহরের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। খাল, পোতাশ্রয়, মন্দির সমেত উর নগরের আয়তন ছিল দু শ' কুড়ি একর মাত্র। এরেক নগরের প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে ছিল দুই বর্গমাইল জমি। আকারে ছোট হলেও শহরের জনসংখ্যা অল্প ছিল না। লাগাস একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শহর, সেখানকার জনৈক শাসক এই দাবি করেছেন যে তাঁর শাসনাধীনে ছত্রিশ হাজার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাস করে। উম্মার জনসংখ্যা ছিল উনিশ হাজার। শুধু সুমের দেশের উপত্যকা-ভূমিতে নয়, আসিরিয়া সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে যেসব নগর গড়ে উঠেছিল, সেগুলিও ছিল ক্ষুদ্রায়তন। আসিরিয়ার রাজধানী আস্থর (Assur) নগরের আয়তন মাত্র ১২০ একর, এশিয়া মাইনরে ট্রয় (Troy) নগরের ৪ একর মাত্র। কিন্তু নগর-প্রাচীরের বাইরে বহু লোক বসবাস করত মাটির ঘরে, সেই ঘরগুলির চিহ্নমাত্র এখন আর নেই।*

* ট্রয় নগরের আয়তনের বিবরণ দিয়েছেন গর্ডন চাইল্‌ড্ এইরূপ: "The 'city' of Troy...began as a fortified hamlet or citadel, not much more than one and a half acres in area, dominated by the chief's palace. In time, it expanded till as 'Troy II' it covered nearly two acres." (*What Happened in History*—p. 146). ট্রয় ও সুমেরীয় নগরগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে সমকালীন সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার আয়তনের বিষয়টি কৌতূহলোদ্দীপক: "The ruins of Mohenjo-

অতি প্রাচীন কালের সুমেরীয় শহরে নাগরিকদের ঘরবাড়ি, জীবনযাত্রার একটি কাল্পনিক ছবি অনায়াসে আমরা অঙ্কিত করতে পারি। সরু সরু রাস্তা, লোক গিজ্‌গিজ্ করছে, ভিড়ের মধ্যে চলেছে ব্যাপারীর দল গাধার পিঠে সওদা চাপিয়ে, তারা যায় দূরদেশে বাণিজ্য করতে, আবার বিদেশ থেকে বাণিজ্যের বেসাতি নিয়ে ফিরে আসে। রাস্তার দু পাশে নানান শ্রেণীর কারিগরদের কর্মশালা—কুম্ভকার আছে, ছুতার আছে, কামার আছে, আর আছে শিল্পী—কোলাহলমুখর নগরে সকলেই তারা নিজ নিজ কাজ করে যায়। কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা এই যে আলেখ্য-বর্ণন আসলে কিন্তু এই চিত্র কাল্পনিক নয়, অমূলকও নয়। উরের খনন-কার্যে আবিষ্কৃত হয়েছে বাইবেলের মান্ধাতা আব্রাহামের কালের অপ্রশস্ত আঁকাবাঁকা কাঁচা রাস্তা, দুধারে বাড়িগুলির জানালাবিহীন দেয়াল, যেমন রাস্তা যেমন বাড়ি প্রাচ্য দেশের প্রাচীন শহরগুলিতে আজও দেখা যায়। ইঁটের তৈরি বাড়ি, প্রধানত মধ্যশ্রেণীর ব্যক্তিদের বাসগৃহ, কোনটি বা ধনী ব্যক্তির দোতলা বাড়ি, আলোবাতাসযুক্ত বাঁধানো আঙিনার চারদিকে তের-চৌদ্দটি ঘর। এমনি ছোটবড় নানান রকমের বাড়ি। সম্ভবত চাষীরাও থাকত শহরের মধ্যে যদিও তাদের জমিগুলি ছিল নগরের বাইরে।

নগরের সবচেয়ে বিরাট দর্শনীয় হর্ম্য ছিল দেব-মন্দির, যার ধ্বংসস্তূপকেই জিগ্‌গুরাট বলা হয়েছে। এই জিগ্‌গুরাটগুলি খনন করে সুমেরীয় সংস্কৃতি বিষয়ে নানান তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। প্রকৃতপক্ষে এই শহরগুলিকে 'মন্দির-নগর' (cathedral city) বলা যেতে পারে। মন্দিরের বৃহৎ আকারের জন্য নয়, এ নামের সার্থকতা এই যে মন্দিরের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে নগর ও নাগরিক উভয়কেই জানা চেনা যায়। খাড়া উঁচু সিঁড়ি চত্বর পর্যন্ত উঠেছে, সেই বিশাল আঙিনার একাংশে মন্দির। অভ্যন্তরে একটি লম্বা ধাঁচের পূজার বা সাধনার ঘর (cult room)। কক্ষটির দুই ধারে ছোট ছোট ঘর এবং শেষ প্রান্তে একটি বেদী ও বিগ্রহমূর্তি। চুনকাম-করা ইঁটের

---

daro in Sind cover at least a square mile; at Harappa, 400 miles further north, the walled area visible in 1853 had a perimeter of 2½ miles, but buildings once extended further." (*ibid*— p. 125)

দেয়াল, আলো প্রবেশের জন্য তেরছা-ধরনের জানালা (clerestroy windows) ছিল মন্দিরগুলিতে, পাইন কাঠের দরজা তৈরি করা হত আর পাইন গাছ আমদানি করা হত পাহাড় অঞ্চল থেকে। নানান রকমের রঙিন পাথর (lapis lazuli), রুপো, তামা, সীসার আভরণ ও দ্রব্যসম্ভার দিয়ে মন্দির ও তার বিগ্রহটিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে—মন্দিরে সুন্দর-সুন্দর মৃৎভাণ্ডও আছে। প্রকৃতপক্ষে মন্দির ছিল একটি যাদুঘরবিশেষ, সেখানে নানান রকমের পুরনো জিনিস সংগ্রহ করে সযত্নে রাখা হত। যুগ যুগ ধরে নৃপতিবৃন্দ ও বিত্তশালী নাগরিকগণ প্রচুর ধনরত্ন দেবতাকে অর্পণ করেছেন, মন্দিরের কোষাগারে সেই ঐশ্বর্যভাণ্ডার রক্ষিত হয়েছে। উরের চন্দ্র-দেবতার মন্দিরের পূজারিনী ছিলেন রাজা ডুঙ্গির কন্যা, সম্রাট সারগনের নামাঙ্কিত একটি পাথরবাটি সংগ্রহ করে তিনি সেটিকে সেই মন্দিরে রেখেছিলেন। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দিরের এত সব ঐশ্বর্য সেই প্রাচীন যুগেও দস্যুর শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় নি। সারগনের কন্যার একটি স্মৃতিচিহ্ন ও অন্যান্য জিনিস পাঁচ সাত শ' বছর ধরে মন্দিরের তোশাখানায় জমা ছিল, সেগুলি সবই একদিন দস্যুরা লুঠে নিয়ে গিয়েছিল।

আবিষ্কৃত মন্দিরসমূহের আকার দেখে অনুমান করা কঠিন নয় যে, বহু লোকের সমবেত চেষ্টার ফলে সেগুলি তৈরি হয়েছিল। উরের চন্দ্র-দেবতা নান্নারের মন্দির একটি দৃষ্টান্তস্থল। এই মন্দিরটি ২০০ ফিট লম্বা, ১৫০ ফিট চওড়া এবং ৭০ ফিট উঁচু। সমগ্র আয়তন জুড়ে একটি নিরেট সৌধ, পুরু দেয়ালটি ৮ ফিট, বাইরের দিকে পোড়ানো ইঁট, ভিতরে কাঁচা (unbaked) ইঁট। এরূপ প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় পরিকল্পনার, যাকে আমরা বলি 'প্ল্যান'। একটি মন্দিরের মেঝের মূলে লাল দড়ির একটি লাইনের ছাপ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেছে, যা থেকে বেশ বোঝা যায় যে প্ল্যানমত দড়ি দিয়ে মেপে তারপর গৃহনির্মাণ করা হত। পরবর্তী কালের চাকতি-লেখনে দেখা যায় যে নির্মাণ-কার্যের পূর্বে দস্তুরমত নক্শা প্রস্তুত করা হত। মন্দির নির্মাণ করতে যেসব রাজমিস্ত্রী, কারিগর ও মজুর বাহিনীর প্রয়োজন, হয়তো বা তারা ধর্মভাবাপন্ন হয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছে। কিন্তু তা হলেও দীর্ঘকাল ধরে কাজ করতে

হয়েছে তাদের, এবং সেই সময়ে তাদের ও তাদের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ভার সমাজকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। সমাজের এই দায়িত্ব রক্ষা ব্যাপারে সাহায্য করেছে কৃষকশ্রেণী, অতিরিক্ত ফসল ফলাও করে। অর্থাৎ নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল জন্মিয়ে কারিগরদের অন্ন যুগিয়েছে কৃষকেরা।

দেব-মন্দিরে পূজা আরাধনা আর দেবতার উদ্দেশে বলিদান (sacrifice) ছিল পূজারীদের প্রধান কাজ। পূজারী সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরও স্থান ছিল, আমরা তা দেখেছি। সারগন, ডুঙ্গি, নাবোনিডাস—এমন সব বড় বড় রাজার কন্যারা উরের চন্দ্র-দেবতার মন্দিরে পূজারিনী হয়েছিলেন। পূজা, আরাধনা, বলিদানের বিশেষ লগ্ন আছে, বিশেষ ঋতুও আছে। সেই ঋতুকালে নাগরিকেরা নিয়ে আসত নৈবেন্থ—মাছ, খেজুর, খোবানি, শশা, মাখন, তৈল, পিষ্টক। বলির জন্য আনা হত বৃষ, ছাগল, মেষ, ঘুঘু, মুরগি ও হাঁস। সুমেরীয়রা যে কিরূপ ভোজনবিলাসী ছিল তা বোঝা যায়, রাজা গুডিয়া কর্তৃক প্রস্তুত দেবতাদের প্রিয় উপরোক্ত খাদ্যের তালিকা থেকে। সুমেরীয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত একটি মৃৎলিপিতে বলা হয়েছে: "মেষ মানুষেরই বিকল্প। মানুষ তার জীবনের পরিবর্তে মেষশাবক বলি দেয়।" নরবলি পূর্বে প্রচলিত ছিল এবং সভ্যতার বিবৃদ্ধির সঙ্গে সেই প্রথা লোপ পেয়েছে, উপরোক্ত লিখন থেকে এমনি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সহকার-শাখা দিয়ে মঙ্গলঘট সাজানো হয় আমাদের দেশে, তেমনি জলপূর্ণ মাটির পাত্র নবোদ্ভিন্ন তালবৃন্ত দিয়ে সাজানো হত—সেটি ছিল 'জীবন-তরু'র প্রতীক। নানান উপচারে পূজা দেওয়া হত পৃথ্বী-দেবতা, বায়ু-দেবতা, জল-দেবতাকে—প্রার্থনা করা হত যেন সুবৃষ্টি হয়, ভূমি যেন শস্যপূর্ণা হয়, বন্যা থেকে যেন রক্ষা পায়। কালপঞ্জী রাখা হত মন্দিরে, পূজা ও বলিদানের কাল নির্ধারণ করে। বীজ বপন করা হয় যে ঋতুকালে সেই সময়ই ছিল বলিদানের জন্য প্রশস্ত। শস্য উৎপাদন করে যে শক্তি ক্ষয় হয় ধরিত্রীর, সেই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করেন তিনি পশুরক্ত পান করে বীজ বপনের পূর্বে। ভাষ্যান্তরে বলা যায়, পশুরক্তে ধরিত্রী ঋতুমতী হয়ে থাকেন।

দেবতার সংসার

দেবতার একটি সত্যকার সংসার প্রতিষ্ঠিত ছিল সুমেরের দেব-মন্দিরে। কৃষিকার্য, কারিগরের কাজ, শিল্প, এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিকদের সকল প্রকার শ্রমের লক্ষ্য ছিল দেব-সংসারটির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। শ্রম-বিভাগ (division of labour) ক্রমেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করছিল। নব-প্রস্তরযুগের স্বয়ংপূর্ণ সমাজে পারিবারিক প্রয়োজনের প্রত্যেকটি কাজ গৃহস্থকেই করতে হত, যেমন বস্ত্রবয়নের প্রয়োজনীয় পশম উৎপন্ন করা, পশমের সুতো কাটা এবং সেই সুতো দিয়ে পরিধেয় বসন বোনা, এই তিন রকমের কাজই করত গৃহস্থ-পরিবার। তাম্রযুগের সুমেরীয় সমাজে এই তিন কাজ তিন শ্রেণীর লোকের দ্বারা সম্পন্ন হত। অর্থাৎ, পশুপালন করে পশম উৎপন্ন করত এক শ্রেণীর ব্যক্তি, অন্য শ্রেণীর লোক সুতো কাটত, এবং তৃতীয় শ্রেণীর মানুষেরা ছিল তাঁতি, তারা কাপড় বুনত। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরগুলি এক একটি ফ্যাক্টরি হয়ে উঠেছিল। কর-রূপে যেসব কাঁচা মাল পাওয়া যেত তাই থেকে নানান দ্রব্য প্রস্তুত করা হত সেখানে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত হিসাবপত্র পাওয়া গেছে। যেসব নারী দেব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করত, তারাই পশম কাটত, তাঁতে কাপড় বুনত। কতখানি পশম দেওয়া হয়েছে কাকে, কাপড় পাওয়া গেল ক'খানা, এবং পারিশ্রমিক বাবদ কত শস্য ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া গেল তার হিসাব অনেকটা আধুনিক ধরনের। পশমের কাপড় ঘাগরার মত করে পরত লোকে, অনেকটা হাইল্যাণ্ডারদের পোশাকের মত। বয়ন-কার্যে পেঁজা তুলোর সুতো ব্যবহার হত কচিৎ। তুলোর চাষ এ দেশে হত না, হত সিন্ধু দেশে ও পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের হরপ্পা থেকে বণিকেরা বাণিজ্য করতে আসত খুব সম্ভব তুলার।

স্বর্ণকার, শিল্পী, কারিগর,* রাজকর্মচারী, লেখক ও পুরোহিত প্রত্যেকটি

* সুমেরীয় যুগ থেকেই ব্যাবিলোনিয়ায় জহুরির জহরত-কাটা শিল্প প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করেছিল : "Gem-cutting, an art in which the Babylonians excelled, had in Sumerian times been carried to high perfection." (*The Legacy of the Ancient World* by W. G. De Burgh—p. 25)

শ্রেণী নিজের সম্প্রদায় (guild)-ভুক্ত ছিল বলেই মনে হয়। এসব কাজে নিযুক্ত ছিল যারা, তাদের খাদ্যের জন্য শস্য উৎপন্ন করত কৃষকেরা। চাষের জমির মালিকী স্বত্ব তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জমি জরিপ করে চার ভাগে বিভক্ত করা হত—তিন ভাগ প্রজাদের আর এক ভাগ দেবতার। লাগাসে দেবত্র জমির অংশীদার ছিলেন বিশজন দেব-দেবী, নিজ-নিজ জমি তারা ভাগচাষী দিয়ে চাষ করাতেন। ভাগচাষীরা পেত উৎপন্ন শস্যের সাত কি আট ভাগের এক অংশ। রাষ্ট্রে সকলের চেয়ে বড় জমিদার নগর-দেবতা, আর তার জমিদারির ম্যানেজার পটেশী। মন্দিরে দেব-সেবার সুচারু ব্যবস্থা করাই ছিল পটেশীর একটি প্রধান কর্তব্য। মন্দিরের ফ্যাক্টরিতে খাটত অনেক স্ত্রী-পুরুষ। নানান কাজ করত তারা। নিনগিরসু-পত্নী বাউ দেবীর মন্দিরে কাজ করত ২১ জন রুটি-ওয়ালা, ২৭ জন মদ্য প্রস্তুতকারক—পশম পেঁজার কাজে ৪০টি স্ত্রীলোক নিযুক্ত ছিল, তা ছাড়া আরও অনেক স্ত্রীলোক পশমের সুতো কাটত আর পরিধেয় বসন বুনত। একজন কামার, বহু কারিগর, কর্মচারী, কেরানী ও পুরোহিতও ছিল সেখানে। কারিগরদের জন্য কাঁচা মাল, ধাতু ও ধাতুনির্মিত যন্ত্রপাতি, লাঙল, বলদ, গাড়ি, নৌকা প্রভৃতি মন্দির থেকেই সরবরাহ করা হত। বিভিন্ন বিভাগের নানারূপ কর্মসংস্থার গঠন ও সংরক্ষণ, এসব কাজের ব্যবস্থা করতেন পটেশী। শাসনকর্তাও ছিলেন তিনি, স্বৈরাচারী নন, একনায়কত্বের প্রতীকও নন। মন্দির ছিল একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান, নাগরিকরা থাকত মন্দির সংক্রান্ত কাজে লিপ্ত। মন্দিরের কার্য পরিচালনার জন্য ছিল একটি 'সেবাইত সংঘ' (temple corporation)—অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে প্রচুর স্বাধীনতা ছিল এই সংঘের। পটেশীদের নূতন আবির্ভাব হত, আবার তিরোধানও হত, তাদের বংশের ছিল উত্থান-পতন, কিন্তু সংঘটি একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, চিরদিন যা অক্ষুণ্ণই থেকে যেত। মন্দিরকে সম্মান করত বিজেতারাও। অনেক সময়ে তারা প্রতিষ্ঠানকে প্রভূত অর্থদান করত। এ কথা বোধ করি স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই যে কালক্রমে এই পটেশীরাই রাজার নাম গ্রহণ করেছিলেন—এমন কি উত্তরকালে উরের রাজারা নিজেদের দেবতার প্রতিভূ বলে জাহির করতে সংকোচ বোধ করেন নি।

সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিল মন্দিরগুলি। মন্দিরে যেসব স্তোত্র পাঠ হত, চাকতির লিখন উদ্ধার করা হয়েছে সেই স্তবমালার, আর পাওয়া গেছে অঙ্কের তালিকা (mathematical tables), যোগের সোজা অঙ্ক থেকে বর্গমূল ও ঘনবর্গমূলের ফরমুলা পর্যন্ত। এখানেই ছিল বিদ্যাপীঠ, সাহিত্য গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা হত, ব্যাবিলোনিয়ার গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

ব্যাবিলনের রাজত্ব-সময়ের একটি জিগ্‌গুরাট খনন করে দেখা গেছে, সেখানে বিচারকার্য চলত, মকদ্দমার রায় লেখা আছে চাকতির ওপর এবং তাকের ওপর সেই রায়গুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে নজির রূপে ব্যবহার করবার জন্য। জিগ্‌গুরাটটি অবশ্য সুমেরীয় যুগের পরবর্তী কালের, যখন হাম্মুরাবির আইন (Code of Hammurabi) সারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু আইনের বিধান চলিত ছিল সুমেরীয় যুগ থেকেই, যেসব বিধান সংগ্রহ করে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি তাঁর বিখ্যাত 'কোড' প্রণয়ন করেছিলেন। সুমেরীয়দের রচিত কোন কোড পাওয়া যায় নি বটে, কিন্তু গৃহ বিক্রয় সংক্রান্ত একটি চুক্তিলিপি উদ্ধার করা হয়েছে যাতে প্রচলিত আইনের আভাস পাওয়া যায়।*

কারিগরদের কাঁচা মাল সরবরাহের বন্দোবস্তের ভার মন্দিরের ওপর হলেও, এক শ্রেণীর বণিক ছিল যারা বিদেশ থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসত এবং সেই সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যও রপ্তানি করত। সমাজে তাদের স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন, মন্দিরের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল সামান্যই। তাম্র আমদানি করা হত পারস্য উপসাগরের কূলে অবস্থিত ওমান থেকে, টিন আনা হত পূর্ব ইরান, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, এমন কি ইউরোপ থেকে। মাল বহন করা হত প্রধানত জলপথে—স্থলে চক্রযানের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। দূরবিস্তৃত ব্যবসা-বাণিজ্য যে কিরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল, বণিকদের নানান স্থানে গতিবিধি, আমদানি-রপ্তানিই তার বিশেষ পরিচয়। ক্রীতদাসের ব্যবসাও করত এই বণিকেরা। দাস-প্রথা ছিল

* তিন-এর পরিচ্ছেদ ৪২ পৃষ্ঠায় উম্মা নগরের উচ্চ রাজকর্মচারী লুপাদের রেখাচিত্র দেখুন। শিলামূর্তির গায়ে লাগাস নগরে জমি খরিদের একটি দলিল লেখা রয়েছে কীলকাক্ষরে।

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। দূর দেশ থেকে ক্রীতদাস আমদানি করা হত, বাণিজ্যের অন্যান্য বেসাতের মত এদেরও ক্রয়বিক্রয় চলত। মুদ্রা বা টাকার চলন হয় নি তখনো। বিনিময় (barter) সূত্রেই জিনিস কেনাবেচা চলত। সাধারণত সোনা বা রুপোর বদলে জিনিস দেওয়া হত। মহাজনরা সিল-মোহর ব্যবহার করত শুধু চিঠিপত্রে নয়—জিনিসের ওপর ছাপ দিলে সেটা হত ট্রেড্-মার্ক, আর সোনা-রুপোকে সিল দিয়ে চিহ্নিত করে জানানো হত খাঁটি ধাতু, খাদ মিশানো নয়। চিহ্নিত জিনিস, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি নিয়েই ভ্রাম্যমাণ বণিকের দল বেরিয়ে পড়ত দেশ-বিদেশে। এক শ্রেণীর মহাজন বা ব্যাঙ্কারের উদ্ভব হয়েছিল তাদের ধনরত্ন দাদন দেবার জন্য।

রাজন্য ও অভিজাতবৃন্দের সমাধি-কক্ষ

দেশের সমৃদ্ধির আর একটি নিদর্শন রেখে গেছেন সুমেরীয়রা রাজন্যকুলের ও অভিজাতবর্গের সমাধিগর্ভে। মিশরীদের মত সুমেরীয়রাও বিশ্বাস করত যে, পরকাল ইহকালেরই সম্প্রসারণ। পরলোকগত ব্যক্তিরও আহারের জন্য খাদ্য, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র, ভোগের জন্য বিলাসবস্তুর প্রয়োজন হয়। মানুষের এ বিশ্বাস নূতন নয়—প্রস্তরযুগে, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক আদি মানবের কালেও মৃতের সমাধির মধ্যে খাদ্য প্রস্তরাস্ত্র প্রভৃতি রাখা হত। পরকাল যে মানুষের স্থানান্তরে গমনের মতই একটা ব্যাপার, সে আবার ঘুরে ফিরে এসে পূর্ব-দেহকেই আশ্রয় করে—এই ধারণা থেকেই মিশরীরা তুলেছিল ভুবনবিখ্যাত পিরামিড, মৃত ফারাওদের সমাধি-সৌধ। ব্যাবিলোনিয়ার অধিবাসীরা তেমন কোন অতিকায় সমাধিস্তূপ নির্মাণ করেন নি বটে, সাধারণ নাগরিকেরা গর্ত খুঁড়ে মৃতকে প্রোথিত করত তার আভরণ, শখের বস্তু, ছোরা, সিলমোহর, ধাতু বা পাথর নির্মিত পাত্র ইত্যাদি সমেত, কিন্তু রাজ-রাজড়ার সমাধি ছিল বিশেষ রকমের—সে কিছু একটা সাধারণ ব্যাপার নয়। বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয় দশকে উরে খনন-কার্যের ফলে রাজ্ঞী সুব-আদ ও তাঁর স্বামীর দুইটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার বিশেষ বিবরণ দিয়েছেন স্যর লিওনার্ড উলি। ভূগর্ভস্থ সমাধি দুটিতে যেসব ধনরত্ন মূল্যবান জিনিস-পত্র রাখা হয়েছিল, প্রাচীন যুগেই সুরঙ্গ কেটে সমাধিকক্ষে ঢুকে সেগুলি চুরি করে নিয়েছে তস্করেরা। এই ব্যাপারটি থেকেই বোঝা যায় যে, প্রেতাত্মার

সম্পদ লুণ্ঠনের মত অপকর্মকে বন্ধ করতে পারে এমন শক্তি তখনকার দিনের গভীর ধর্মভয় ও ধর্মবিশ্বাসেরও ছিল না। মাটির নীচে প্রস্তুত করা হয়েছে একটি ইষ্টকনির্মিত সৌধ, সেটি সমাধি-গৃহ—তার মধ্যে চারটি কক্ষ। রাজা ও রানীকে ছুইটি কক্ষে সমাধি দান করা হয়েছে, আর বাইরের ছুটি ঘরে এবং প্রবেশপথে পড়ে আছে অনেকগুলি নরনারীর কঙ্কাল, সারিবদ্ধভাবে শায়িত। এক জায়গায় দশটি নারীদেহ রয়েছে ছুই সারিতে, তাদের মাথায় কণ্ঠে সোনার ও পাথরের অলংকার। একটি সোনার মুকুট-পরা মেয়ের হাতে রয়েছে একটি বীণা। সমাধিকক্ষে প্রবেশ করবার জুলিপথে একটি রথ, আর রথের উভয় পাশে দাঁড়িয়ে সিংহমূর্তি, স্বর্ণনির্মিত, নানান রকমের পাথরের কাজ করা। সোনা-রুপোর সিংহ ও বৃষের মূর্তিতে রথের চূড়াদেশ সজ্জিত। সমুখেই ছুটি গর্দভের ও সহিসের কঙ্কাল—আর দ্যূতক্রীড়ার ছক (gaming board), নানাবিধ অস্ত্র, স্বর্ণ ও তাম্র পাত্র, পাথরবাটি। প্রস্তরনির্মিত কক্ষটির প্রান্তদেশে নয়টি নারী, সকলেরই মাথায় রত্নভূষণ, কানে সোনার ছুল, মাকড়ি। মোট ৬৮টি নারীর কঙ্কাল ছিল সমাধিগর্ভে, তার মধ্যে ২৮টির মাথায় স্বর্ণালংকার পরানো। রাজা-রানীর সমাধি-গৃহে রত্নভূষণে সজ্জিতা স্ত্রীলোক, পুরুষমানুষ, রথ ইত্যাদি প্রোথিত করা হয়েছিল কেন? এর অত্যন্ত সহজ উত্তর এই যে, রাজা-রানীর সঙ্গে তাদের পরিচারক-পরিচারিকা-দেরও সমাধি দেওয়া হত, যেমন প্রোথিত করা হত তাদের শখের জিনিস, আবশ্যকীয় দ্রব্য। জিনিসের প্রয়োজন হত ব্যবহারের জন্য, আর দাস-দাসীর প্রয়োজন হত পরলোকে সেবার জন্য। প্রথাটি নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, বলপ্রয়োগ করে এদের নরবলি দেওয়া হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সুসম্বদ্ধভাবে এদের দেহগুলি সারি সারি শায়িত, কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষণ নেই। অলংকার, আভরণগুলি নিপুণভাবে মাথায় ও অঙ্গে পরানো রয়েছে, বলপ্রয়োগ হলে সেগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে ইতস্তত পড়ে থাকত। মৃত অবস্থায় সেখানে তাদের শুইয়ে রাখা হয় নি,—গর্দভটিকে কবর দেওয়া হয়েছিল জীবন্ত অবস্থায়, অঙ্গবিক্ষেপই তার প্রমাণ। এ দেখে মনে হয় সহিস ও অন্যান্য নরনারীকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়েছে। অনুমান করা হয়, এইসব নরনারী সমাধিগর্ভে নেমে আফিম বা 'হসিস' নামক মাদক দ্রব্য খেয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে, তারপর তারা যেমন ঘুমিয়ে

পড়েছে সেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। "There seems to be nothing brutal in the manner of their death." (Woolley)—তাদের এই মৃত্যুর মধ্যে কোনরূপ জবরদস্তি ছিল না। পরলোকে গিয়ে তারা প্রভুর পরিচর্যা করবে, এই বিশ্বাসেই তারা মৃত্যু বরণ করেছিল।

এই তো গেল রাজন্যবর্গ ও অভিজাতকুলের সমাধির একটি চিত্র। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ছিল অন্যরূপ, মৃতের শবদেহ তারা বাসগৃহের মেঝের তলে প্রোথিত করত। এই প্রথাটি প্রস্তরযুগ থেকে নানান স্থানে চলে এসেছে, ইরানের সিয়াল্‌ক নামক স্থানে এরূপ সৎকার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, আবার ব্যাবিলোনীয় যুগেও আমরা এই প্রথার চলন দেখতে পাব। মৃত ব্যক্তি তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই বসবাস করতে চায়, এই ধারণা থেকেই বোধ করি প্রথাটির উদ্ভব। সুমেরীয় পুরোহিতদেরও এই প্রথামতই গৃহের মেঝের তলে গোর দেওয়া হত, কিন্তু তাদের ভোগের জন্য প্রভূত ঐশ্বর্য সঙ্গে দেবার ব্যবস্থা ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উলি বলেন, পুরোহিতদের বাড়িগুলি দস্যুদের লুব্ধ দৃষ্টি এড়ায় নি, রাজসমাধির মত পুরোহিতদেরও প্রতিটি সমাধি খুঁড়ে তারা ঐশ্বর্যের সন্ধান করেছে!

সুমেরীয় সভ্যতার পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যকালে হাম্মুরাবির যুগে, যা আমরা পরে আলোচনা করব। বহু পূর্ব থেকেই সমাজ-শৃঙ্খলা গড়ে তোলা হয়েছিল পরিবার, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের (family, community, state) যোগাযোগ-সম্পর্কের ভিত্তির ওপর। পরিবারের স্বতন্ত্র জীবন ছিল সাম্প্রদায়িক জীবনের অঙ্গ, এবং ঐ দুইটি জীবন আবার রাষ্ট্রজীবনেরই অন্তর্ভুক্ত। বাইরে থেকে দেখতে সমাজের এই রূপটি বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল সন্দেহ নেই। ধর্মক্ষেত্রে ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যা ছিল আর্য-ভারতের বর্ণধর্মের আদর্শ, তেমনি গুণকর্ম বিভাগ করেই সমাজে শ্রেণী গঠিত হয়েছিল, আর সেই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অনিবার্যরূপে জড়িত হয়ে পড়েছিল নানা প্রকার অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন। ইতিপূর্বে আমরা লাগাসের শেষ স্বাধীন নৃপতি উরুকাগিনার সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার বিষয় বলেছি। সমাজের একটি সত্যকার বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর সংস্কার-বিধান সংক্রান্ত মৃৎলিপিতে,

তার মধ্যে লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা, দুঃখ-দৈন্যের কথা, অত্যাচার উৎপীড়নের কথা, সব বিষয়েরই উল্লেখ করা হয়েছে। লাগাসের পটেশী নগর-দেবতা নিনগিরস্থর প্রধান পুরোহিত হিসাবে যে সম্পত্তির অধিকারী তা ছাড়াও দেবতার বিপুল নিজস্ব সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করত অন্যায়ভাবেই, দেবতার জমির শস্য তসরুপ করত, দেবতার পশু নিজের কাজে ব্যবহার করত। আদিকালে পটেশীরা সাদাসিধাভাবে জীবনযাপন করতেন, কিন্তু লাগাস যেমন সমৃদ্ধ হতে লাগল, শক্ররাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্ন দিয়ে রাজ্যের কোষাগার পরিপূর্ণ হতে লাগল যেমন, পটেশীরাও তেমনি তখন বিলাসী হয়ে উঠলেন। পূর্বে সর্বপ্রকার জাঁকজমক ঘিরে থাকত দেবতাকে, এখন সেই জাঁকজমক ব্যক্তিগত ঠাটে পরিণত হয়েছিল। বিলাসী জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন হত অর্থের, সেই অর্থ সংগ্রহ করা হত প্রজাদের করভার বৃদ্ধি করে। কর্মচারীরা ছিল অসৎ ও অর্থগৃধ্নু। প্রজাদের অনেক প্রকারে শোষণ করত তারা, জোর করে তাদের গাছ কাটত, ফল পেড়ে নিত। মন্দিরের ধনে পূজারীবৃন্দ বিলক্ষণ ধনী হয়ে উঠেছিল, প্রজাদের ওপর জুলুমবাজি চালিয়ে তাদের ধনরত্ন রীতিমত লুঠে নিত। উরুকাগিনা অসৎ কর্মচারীদের বরখাস্ত করেছিলেন এবং উৎকোচ গ্রহণকারীদের দণ্ডের বিধান করেছিলেন। পুরোহিতদের দুর্নীতির পথ বন্ধ করবার জন্য নানাবিধ আইনেরও প্রবর্তন করেছিলেন তিনি। উরুকাগিনার এইসব সাধু প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হয়েছিল, আমরা তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। লাগাসের পতনের কারণই যে এইসব দুর্নীতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আক্কাডীয় সাম্রাজ্যের শেষে (খৃঃ পূঃ ২৪৫০) লাগাসের আর একটি স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছিল পটেশী গুডিয়ার শাসনকালে, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সমাজ-নীতির মান যে তখন বেশ ঊর্ধ্বে উঠেছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে গুডিয়ার শিলালিপিগুলিতে। তখন সুশাসনের প্রভাবে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ হয়েছে। প্রজার অর্থ শোষণ করে মন্দিরকে সমৃদ্ধ করা আর হয় না, ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভাবে। প্রশাসনের আদর্শ হয়েছিল সুশৃঙ্খলা, সুনীতি, সুবিচার ও দুর্বলের রক্ষণ। রাজকর্মচারীদের উপদ্রব আর ছিল না। প্রভুভৃত্যের পরস্পরের প্রতি বন্ধুর মত আচরণ, উচ্চনীচের ব্যবধান বিলোপ, এইরূপ কতগুলি সাম্যের বিধান করে মানবীয়

সম্বন্ধকে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন গুডিয়া। সামাজিক অগ্রগতির একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত এই সাম্যের পরিকল্পনা।

স্থমেরীয় সমাজে আদিযুগ থেকেই জ্যোতির্বিদ্যা গণিত শিল্প প্রভৃতির চর্চা দেখা গেছে। পরবর্তী কালের ব্যাবিলোনিয়ায় সেই জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পচর্চারই জের চলে এসেছিল, কোথাও কোনরূপ ছেদ ঘটে নি। ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্থমেরীয় শিল্পের পরিচয় কিছু দিয়েছি—কিরূপে আদিকালের স্থূল খোদাই-কার্য থেকে স্থাপত্য নারাম-সিনের উৎকীর্ণ সূক্ষ্ম কারুর পর্যায়ে গিয়ে উঠেছিল, তারই পরিচয়। স্থমেরীয় যুগের বিজ্ঞান ও শিল্পসৃষ্টির পরিণতি যেরূপ ঘটেছিল উত্তরকালের ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যে, তার পূর্বাপর আলোচনা আমরা একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে করব।

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্যাবিলন

॥ এক ॥

ব্যাবিলনের অভ্যুত্থান

ব্যাবিলোনিয়ার উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত ব্যাবিলন ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই নগণ্য গ্রামটির অত্যাশ্চর্য শ্রীবৃদ্ধি, কিরূপে ব্যাবিলন নগর একটি পরাক্রান্ত বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন তার পতন ঘটল কিরূপে তখন তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজেতা জাতিগুলির ওপর দুরপনেয় বৈদগ্ধ্যের ছাপ অঙ্কিত করেছিল, সেই কীর্তিমুখর কাহিনীই ব্যাবিলনের ইতিহাস। পরিশেষে দূর ভবিষ্যতে পারসীকদের আক্রমণে বিরাট আসিরীয় সাম্রাজ্য যখন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল, রাজধানী নিনেভে ও আস্থর নগরের যখন চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না, ব্যাবিলন কিন্তু তখনো অতুলনীয় সাংস্কৃতিক মর্যাদায় স্বপ্রতিষ্ঠ, সেই মহিমা-সমুজ্জ্বল অমর কাহিনীই ব্যাবিলনের ইতিহাস। গ্রীকদের কাছে আসিরীয় সাম্রাজ্যের নাম ছিল অজ্ঞাত, কিন্তু প্রাকার-বেষ্টিত ব্যাবিলন গ্রীক আমলেও উন্নত গৌরবে দণ্ডায়মান। সেই মহানগরী পরিদর্শন করেছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস, তাঁর বর্ণনায় ব্যাবিলনের পরম সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। নগরের বিরাট আয়তন, চল্লিশ মাইল দীর্ঘ বৃত্তাকার প্রাচীরটি ছিল পুরাকালের একটি বিস্ময়ের বস্তু। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টট্‌ল্‌ বলেছেন, ব্যাবিলনকে 'নগর' না বলে একটি 'নেশন' বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে অভিহিত করাই সংগত।

'ব্যাবিলন' নামটির উৎপত্তি সেমেটিক শব্দ 'ব্যাব-ইল্‌' (Bab-Il) থেকে। শব্দটির অর্থ—'দেবতার নগর' (City of the gods)। সিরিয়ার মরুপ্রান্তে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকা-ভূমির এই নগরটির আদিকালের অধিবাসীরা ছিল অন্যান্য সুমেরীয় নগরবাসীদের স্বজাতীয়, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এ অঞ্চলে পশ্চিম থেকে সিরিয়ার মরুবাসীদের অনুপ্রবেশ চলে আসছিল। পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্রখানির ওপর দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, প্যালেস্টাইন থেকে আরম্ভ করে ব্যাবিলোনিয়ার নিম্নে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি অনতিপ্রশস্ত উর্বর ভূখণ্ড বিস্তৃত রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকারে। আরব্য মরুভূমির মাথার ওপর সেই শ্যামল ভূখণ্ডটি ইন্দ্রনীলখচিত মুকুটের

মতই শোভাময়, সেইজন্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্রেস্টেড এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি উর্বরা ভূমির নাম দিয়েছেন Fertile Crescent। নামকরণ খুবই সুষ্ঠু হয়েছে, সন্দেহ নেই। পশ্চিম এশিয়ায় যতগুলি সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল প্রাচীন কালে তার প্রায় সবগুলিরই পীঠস্থান এই 'উর্বর অর্ধচন্দ্রে'র গণ্ডীর মধ্যে। মরুপ্রান্তের যাযাবর জাতিরা স্মরণাতীত কাল থেকেই কৃষিপ্রধান উর্বরা ভূমির ওপর হানা দিয়েছে—আরবের সেমেটিক জাতিরা যেমন দক্ষিণ দিক থেকে, তেমনি এসেছে আর্য মিটানি (Mitanni) ও ক্যাসাইট (Kassite) এবং আর্মানয়েড হিটাইট (Hittite) অন্যান্য দিক থেকে।

সেমেটিক জাতিসমূহের আদি বাসস্থান আরব দেশ, এ কথা এখন সর্ববাদী-সম্মত। আরব্য উপদ্বীপ আজ জনশূন্য মরুভূমি, কিন্তু প্রাচীন কালে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা মনুষ্যবাসের অধিকতর উপযোগী ছিল বলে মনে করবার কারণ আছে। দক্ষিণ আরবে আজও আমরা দেখতে পাই, সমুদ্রতটের সমতলভূমি থেকে মধ্যদেশীয় মালভূমির দক্ষিণ প্রান্তস্থ পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের নানা স্থানে অপেক্ষাকৃত উর্বর জমি ছড়ানো রয়েছে। আরব দেশে কতগুলি জলাভূমি ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, মরুভূমিও তখন এতখানি বিস্তৃত হয়ে পড়ে নি। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর সাবিয়ান (Sabaean) রাজাদের সময়েও দক্ষিণ আরবের উর্বর শস্যক্ষেত্রগুলি ঝটিকাতাড়িত মরুবালুকায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে নি। মধ্য এশিয়ার সমতলভূমির মত আরব দেশও ছিল মানবজাতির ধাত্রীভূমি। মধ্য এশিয়ার মতই সমগ্র দেশটি কালক্রমে মরুগ্রাসে পতিত হয়েছিল। এখানকার যাযাবর জাতিরা পশুপালন করত, পশুর দুগ্ধ পান ও মাংস ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করত, যেহেতু কৃষিকার্য তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিত্ত সঞ্চয় করতে পারত না তারা, কেননা ভ্রাম্যমাণের ভ্রমণ-সজ্জা ছিল লঘু, আর ভারী জিনিস বহন করা একটি দুঃসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার ছিল। তাদের সমাজ ছিল পিতৃকেন্দ্রিক, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। মেষ বা ছাগলোমে বোনা তাঁবুতে বাস করত তারা—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই পশুচারণে রত থাকত। গোষ্ঠীপতির নির্দেশক্রমে তাঁবু তুলে সকলকে পশুচারণের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হত তল্পিতল্পা সমেত। কোনরূপ লিখন ছিল না তাদের, ঐতিহ্যের অতীত কাহিনী বহন করত তারা মুখে-মুখে, পুরুষানুক্রমে। আরবের প্রাচীনতম

লেখনগুলি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বকার বলে মনে হয় না, আর সেগুলিও যাযাবরদের লেখন নয়। যেসব সেমেটিক জাতি দক্ষিণাঞ্চলের উর্বর অংশের গ্রাম ও শহরসমূহে স্থিতিবান জীবন যাপন করত তাদেরই রচনা এই-সকল শিলালিপির লিখন। দেশটি শুকিয়ে গিয়ে মরু অঞ্চল যত প্রসারিত হতে লাগল, চারণভূমির পরিমাণ ততই হ্রাস পেল, এবং তারই ফলে উত্তর মরুপ্রান্তের অধিবাসীদের একরকম বাধ্য হয়েই অনাহার থেকে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্যের সন্ধানে 'উর্বর অর্ধচন্দ্রে'র অর্থাৎ ক্যানান (Canaan), সিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। স্থিতিবান অঞ্চলে প্রবেশ করে যাযাবর জাতিকে জীবনযাত্রার নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হল, এবং সেই সঙ্গে তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। তারা ধরল কৃষিকার্য, সুমেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করল। দীর্ঘকাল স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাদের সমাজ-সংস্থাও স্থানীয় সমাজের অনুরূপ হয়ে উঠেছিল।

'উর্বর অর্ধচন্দ্রে'র ওপর সেমেটিকদের যে কয়টি প্রধান আক্রমণ সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছিল ইতিহাস-কালের মধ্যে, তার একটির সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় ঘটেছে। সেটি হল সুমের ও আক্কাডের ওপর সারগন-এর আধিপত্য। সেমেটিকদের দ্বিতীয় অনুপ্রবেশ প্যালেস্টাইন ও ক্যানান প্রদেশে—উভয় ক্ষেত্রেই স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সেমেটিকদের রক্তের মিশ্রণ ঘটেছিল। সুমের দেশে আক্কাডীয়দের রাজ্য আর সিরিয়া বা ক্যানানে সেমেটিক আধিপত্যকে ঠিক বৈদেশিক শাসন বলা চলে না, কারণ সেসব অঞ্চলে সেমেটিকরা নব আগন্তুক ছিল না, দীর্ঘকাল ধরেই তাদের অনুপ্রবেশ চলে আসছিল, এবং স্থিতিবানভাবেই তারা সেখানে বসবাস করেছে। কিন্তু তৃতীয় দফায় খৃঃ পূঃ চতুর্বিংশ শতাব্দে ব্যাবিলনে সেমেটিক জাতির অভ্যুত্থান এবং তারপর ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যবিস্তার যখন আরম্ভ হয়েছিল তখন সে একটা স্থানীয় ব্যাপার মাত্র ছিল না। নূতন একদল সেমেটিক জাতীয় মানুষ এসেছিল পশ্চিমাঞ্চল থেকে, তাদের নাম আমরু (Amarru) বা আমোরাইট (Amorites)। ইতিমধ্যেই এই জাতি সিরিয়ায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং দামাস্কাস নগরকে কেন্দ্র করে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল। সেই 'পশ্চিম দেশীয় সেমাইট'দেরই ("Western Semites") একটি শাখা ব্যাবিলনে প্রবেশ করে সুমের ও

আক্কাডের শিথিল হস্তের রাজশক্তি আয়ত্ত করেছিল। তারপর তাদের অধিষ্ঠান হল ব্যাবিলনের শাসকশ্রেণীরূপে।

প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা : সুমু-আবুম ও সুমু-লা-ইলাম

প্রথমে সম্ভবত ব্যাবিলনের শাসনকর্তারা নগরদেবতা মারদুক-এর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুমু-আবুম। তিনিই সর্বপ্রথম রাজার নাম গ্রহণ করেছিলেন (খৃঃ পূঃ ২২২৫)। এই রাজবংশ ব্যাবিলনে তিন শতাব্দ ধরে রাজত্ব করেছিল। সুমু-আবুমের রাজত্বকালে আসিরিয়ার একটি প্রচণ্ড আক্রমণ হয়েছিল ব্যাবিলনের ওপর, এবং ব্যাবিলন আততায়ীগণকে পরাভূত করেছিল, এরূপ জনশ্রুতি আছে—যদিও এই ঘটনাটির উল্লেখ কোন রাজকীয় কালপঞ্জীতে (date-formulae) দেখা যায় না। সে যা-ই হোক, তিনি যে ব্যাবিলন ও নিকটবর্তী স্থানসমূহে দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং তারপর আক্কাডের নগর-রাষ্ট্রগুলির ওপর অধিকার বিস্তার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিশ-নগরের অধিপতি আসদুনি-এরিম ছিলেন সুমু-আবুমের সমসাময়িক ব্যক্তি। একটি শিলালিপিতে বলেছেন আসদুনি-এরিম, 'পৃথিবীর চতুর্দিঙ্মণ্ডলে'র সঙ্গে (four quarters of the world) তাঁকে আট বছর ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, এবং পরিশেষে যখন তাঁর সেনা-বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র তিন শত যোদ্ধায় গিয়ে দাঁড়াল, নগরের দেব-দেবী জামামা ও ইস্‌তার তাঁর সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়েছিলেন খাদ্যসম্ভার নিয়ে—আর তখনই তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করে শত্রুর ভূমি অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শত্রুর নামের উল্লেখ না থাকলেও স্পষ্টই বোঝা যায় আততায়ী ব্যাবিলন ছাড়া আর কেউ নয়। রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ সংগ্রামের শেষ পরিণতি দেখা যায়—সুমু-আবুম কর্তৃক কিশ অধিকার। সিপ্‌পার নগরও অধিকার করেছিলেন তিনি, কিন্তু সিপ্‌পার বা কিশ কোন নগরকেই স্বীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কিশ রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং কোন-কোন বিষয়ে বিশেষ অধিকার বজায় রাখা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না সুমু-আবুমের উত্তরাধিকারী সুমু-লা-ইলাম-এর রাজত্বকালে কিশ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহ দমন করে সুমু-লা-ইলাম কিশকে ব্যাবিলন রাজ্যভুক্ত করেছিলেন।

সুমু-লা-ইলামের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২২১১ অব্দে। প্রথমেই তিনি পূর্ববর্তী রাজার প্রারব্ধ কর্মের অনুষ্ঠানে—অর্থাৎ রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজন সর্বাধিক। তিনি পূর্তকার্যে মনোনিবেশ করলেন। দুইটি বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করে একটির নামকরণ করেছিলেন নিজেরই নাম অনুসারে। তিনি রাজধানীর প্রাকার-বেষ্টনী পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু বারো বছরের মধ্যে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন মাত্র একবার। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে কিশ রাজ্য পুনর্বিজয় করেছিলেন তিনি দ্বিতীয়বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে। তারপর আরও কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তিনি—যেমন কাজলু ও কুথা নগরদ্বয়ের বিরুদ্ধে। নিপ্‌পার নগরও তিনি অধিকার করেছিলেন। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় এইসব অভিযান থেকে যে ব্যাবিলন তখন সমগ্র সুমের ও আক্‌কাড দেশের ওপর আধিপত্য স্থাপনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল।

ইলাম নিসিন ব্যাবিলন—রাষ্ট্র-ত্রয়ের সংগ্রাম-কাহিনী

এখন একবার সুমের দেশের কয়েকটি নগর-রাষ্ট্রের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা দেখেছি ইলাম কর্তৃক উর নগর ধ্বংসের পর সমগ্র দেশের উপর নিসিনের রাজন্যবর্গের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং নিসিনের অধীনতা-পাশ থেকে মুক্তি লাভ করেছিল লারসা, নগরীর শাসক ছিলেন যখন গুনগুনুম। এই রাজার একজন বংশধর সুমু-ইলুম-এর রাজত্বকালে লারসা নিসিনের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু লারসার এই আধিপত্য ছিল সাময়িক। আর নিসিনের যে আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছিল লারসা, সেই দুর্যোগের সঙ্গে ব্যাবিলনের কোনরূপ যোগাযোগ থাকাও বিচিত্র নয়। সে যা-ই হোক, এটা ঠিক যে ব্যাবিলন তখনো নিসিন বা লারসাকে গ্রাস করবার মত শক্তি সঞ্চয় করে নি। কিন্তু ব্যাবিলনে প্রথমবংশীয়দের রাজ্যারম্ভের সঙ্গে পটভূমির পরিবর্তন ঘটেছিল। দুইজন পরাক্রান্ত নৃপতির চেষ্টায় ও উদ্যোগে ব্যাবিলনের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বভাবত এই শক্তি দক্ষিণ অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের জন্য উন্মুখ হয়েই ছিল, কিন্তু অগ্রগতির

পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল একটি নূতন বিঘ্ন। সুমেরীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, নগর-রাষ্ট্রগুলির ওপর বারবার হানা দিয়েছে ইলামের পার্বত্য অধিবাসীরা। সেই ইলামই হয়ে উঠল এখন ব্যাবিলনের রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টার প্রধান অন্তরায়। ইতিমধ্যে লারসা রাজ্য অধিকার করেছিল ইলাম, এবং সেখান থেকে উত্তরাভিমুখে অভিযান চালিয়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে হলে প্রথম প্রয়োজন দুর্বল নিসিন রাজ্যটিকে অধিকার করা, এবং সেইজন্যই লারসার ইলামী শাসকদের হামলা শুরু হল নিসিনের ওপর। সে সময়ে ইলামের রাজা ছিলেন কুদুর-মাবুক। তিনি তাঁর দুই পুত্র ওয়ারাদ-সিন এবং রিম-সিন-কে লারসার সিংহাসনে পর্যায়ক্রমে অধিষ্ঠিত করে নিসিন রাজ্য অধিকার এবং সমগ্র সুমের ও আক্কাদে ইলামী আধিপত্য স্থাপনের জন্য উৎসাহিত করতে লাগলেন। লারসার সঙ্গে উর ও ব্যাবিলোনিয়ার দক্ষিণ অঞ্চল অধিকার করেছিলেন কুদুর-মাবুক। উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নিসিন রাজ্যই ছিল তাঁর উচ্চাশার প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান।

উত্তরে শক্তিশালী ব্যাবিলন দক্ষিণাঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের জন্য উন্মুখ আর দক্ষিণে লারসার ইলামী শাসক রিম-সিন উত্তর দেশের সমগ্র ভূখণ্ড গ্রাস করে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব, এবং উভয়েরই চলার পথে ক্ষীণবল নিসিন রাষ্ট্র তার নির্জীব জীবনটি নিয়ে ধুক্‌ধুক্ করছে—এরূপ ক্ষেত্রে প্রবল পরাক্রান্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। যুদ্ধ বাধল—কিন্তু সে যুদ্ধ দুই পক্ষের সাক্ষাৎ সংগ্রাম নয়। লারসা যখন নিসিন রাজ্য অধিকার করবার জন্য হামলা আরম্ভ করল, ব্যাবিলনও তখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল একটি অভিনব ভূমিকায়—নিসিনের সাহায্যার্থ নয়, যেহেতু ব্যাবিলনের আমরুগণ নিজেদের মনে করত অভিজাত বংশীয় আর সুমেরীয়দের করত গভীর ঘৃণা। তাই এক দিকে যেমন রিম-সিনের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করল ব্যাবিলন আততায়ীর অগ্রগতি প্রতিরোধ করবার জন্য, তেমনি আবার নিসিনকেও আক্রমণ করল রাজ্যটিকে গ্রাস করবার জন্য। কিন্তু এ যাত্রায় ব্যাবিলনের নিসিন অভিযান ব্যর্থই হয়েছিল। লারসা-পতি রিম-সিনই যুদ্ধ জয় করে নিসিন অধিকার করে বসলেন। তখন ব্যাবিলন, লারসা ও নিসিন, এই তিন পক্ষের বিচিত্র সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হল, এবং

সেই সঙ্গে বাধল একটি দীর্ঘকালব্যাপী দ্বন্দ্বযুদ্ধ, ব্যাবিলন ও লারসার মধ্যে।

ব্যাবিলন-রাজ স্মুমু-লা-ইলামের দুইজন বংশধর, জাবুম ও আপিল-সিন-এর রাজত্বকাল ছিল ৩২ বৎসর (খৃঃ পূঃ ২১৭৫-২১৪৪)। এই সময়ের মধ্যে পূর্তকার্য, মন্দির নির্মাণ, আভ্যন্তরীণ শাসন ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করেছিল ব্যাবিলন, বলক্ষয়কারী আক্রমণাত্মক অভিযানে অগ্রসর হয় নি। আপিল-সিনের রাজত্বকালে ইলাম-রাজ কুদুর-মাবুক যখন লারসা উর প্রভৃতি সুমের দেশের নগরগুলি অধিকার করে বসলেন, ব্যাবিলন তখন কোন উচ্চবাচ্য করে নি, শান্তভাবেই সময়ের প্রতীক্ষা করেছিল। শান্তিকালের সঞ্চিত শক্তি নিয়ে নিসিন ও লারসার বিরুদ্ধে যুগপৎ যুদ্ধ আরম্ভ করলেন আপিল-সিনের পুত্র সিন-মুবালিট। এই নৃপতির রাজত্বের প্রথম ভাগে লারসার অধিপতি ছিলেন ইলাম-রাজের পুত্র ওয়ারাদ-সিন, যিনি এরিদু লাগাস গিরসু প্রভৃতি সুমেরীয় নগরগুলিকে বাহুবলে অধিকার করেছিলেন। তারপর তাঁর ভ্রাতা রিম-সিন যখন লারসার সিংহাসনে অধিরোহণ করে নিসিন রাজ্য আক্রমণ করলেন, তখনই শুরু হল পূর্বোক্ত ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রাম। সিন-মুবালিটের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, তিনি উরের সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করেছিলেন। উর ছিল লারসারই অধীন রাজ্য, সুতরাং বাহিনীটি যে রিম-সিনের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লারসা-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছেন, এরূপ দাবিও করেছেন সিন-মুবালিট। কিন্তু এইসব দাবি সত্ত্বেও তিনি নিসিন বা উর জয় করতে পারেন নি, শুধু শত্রুপক্ষের অগ্রগতিকে রোধ করে ব্যাবিলন রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রিম-সিনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম মোটের উপর সুফল প্রসব করেছিল, যেহেতু তিনি নানান স্থানে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে ব্যাবিলন রাজ্য অটুট রাখতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পুত্র হাম্মুরাবির পক্ষে যুদ্ধ জয় সম্ভব হয়েছিল পরবর্তী কালে।

হাম্মুরাবির রাজত্বকাল ও অভিযানসমূহের বিবরণ

হাম্মুরাবি সিংহাসনে আরোহণ করেন সম্ভবত খৃঃ পূঃ ২১২৩ অব্দে। তাঁর যুদ্ধাভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল রাজত্বের সপ্তম বর্ষে যখন তিনি এরেক ও নিসিন নগরদ্বয় অধিকার করেছিলেন। কিন্তু এই নিসিন অধিকার হয়েছিল একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। ইলাম-রাজ কুদুর-মাবুক অচিরে তাঁর পুত্রের

সাহায্যার্থ স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। রাজত্বের অষ্টম বর্ষে হাম্মুরাবি একটি রাজ্যের আক্রমণ-কার্যে সদ্য সাফল্য লাভ করেছেন, সৈন্যরাও রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সেই সময়ে সুযোগ বুঝেই রিম-সিন বিপুল উদ্যমে যুদ্ধযাত্রা করে নিসিন নগর পুনরুদ্ধার করলেন। এইরূপে ইলামের শাসনাধীনে লারসা মধ্য ও দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়ায় রাজ্য বিস্তার করে ব্যাবিলনের উচ্চাশার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, অবশ্য সাময়িকভাবেই।

হাম্মুরাবি দক্ষিণাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করবার কোন চেষ্টাই তখন করলেন না। পরবর্তী উনিশ বছর কালের মধ্যে রাজ্যের পশ্চিমভাগে কয়েকটি নগর অধিকার ব্যতীত অন্য কোন সামরিক অভিযান দেখা যায় না। এই সময়কার কালপঞ্জীর বৎসরের নামকরণ হয়েছে দেবমন্দির নির্মাণ অথবা মন্দিরে মূর্তি-প্রতিষ্ঠাকে উপলক্ষ করে। পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও সিপ্পার প্রভৃতি অধীনস্থ প্রত্যন্তবর্তী নগরগুলির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিসাধন হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে যখন সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ায় পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছিল আমরা তখন লারসার অধীশ্বর রিম-সিনকে দেখতে পাই একটি বৃহৎ রাজ্যের সুশাসক-রূপে। রাজধানী লারসার পূর্বভাগে উর, এরেক, গিরসু, লাগাস প্রভৃতি সাগরকূলের সমীপবর্তী নগরগুলি ভ্রাতা ওয়ারাদ-সিনের উত্তরাধিকারীরূপে লাভ করেছিলেন রিম-সিন। একাধিক শিলালিপিতে রিম-সিন বলেছেন যে আনু, এনলিল ও এনকি এই প্রধান দেবতাত্রয় এরেকের শাসনভার তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছেন। নিসিন অধিকারের সঙ্গে নিপ্পার নগরও তাঁর হস্তগত হয়েছিল, এবং সেজন্য নিজেকে তিনি 'নিপ্পারের যুবরাজ' (Prince of Nippar) বলে অভিহিত করেছেন। রিম-সিনের শাসনকালে সুমের দেশের সমৃদ্ধি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করেছিল, নিপ্পার ও লারসায় প্রাপ্ত কয়েকটি দলিল থেকে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পূর্ত-ব্যবস্থা ও জলপথের উন্নতি বিধান করেছিলেন তিনি। ইউফ্রেটিস নদীর নিম্নাংশে নূতন পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ এবং টাইগ্রিস নদীগর্ভের পঙ্কোদ্ধার করে জলাভূমির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করেছিলেন, দেশকেও বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করেছিলেন। রিম-সিনের জনহিতকর কার্যানুষ্ঠানগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিদেশী রাজপুত্র হলেও মাতৃভূমিজ্ঞানে সুমের দেশের সেবায় অপরিসীম দরদ ও সহানুভূতি সহকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি।

অকস্মাৎ সুদীর্ঘ কাল ধরে বিরাজমান শান্তির অবসান ঘটল। হাম্মুরাবি ইলাম রাজ্য আক্রমণ করলেন। রাজত্বের ত্রিংশতি বৎসরের বিবরণে দেখা যায়, ইলামী বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করে তিনি লারসা অধিকার করেছিলেন। অগত্যা রিম-সিনকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁর অধীনে লারসার শাসক পদ গ্রহণ করে। পরে আমরা দেখব, ইতিহাস রিম-সিনকে বিস্মৃতির জলে একেবারে ভাসিয়ে দেয় নি। হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর ব্যাবিলনের পক্ষে যথেষ্ট শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিলেন তিনি। লাগাসের ক্ষুণ্ণ অধিকার আপাতত বরদাস্ত করলেও রিম-সিমের অন্তরের ধূমায়িত অসন্তোষ প্রথম সুযোগেই বিদ্রোহের বহ্নিশিখায় প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল হাম্মুরাবির পুত্র সামসু-ইলুনা-র রাজত্বকালে—যাক্, সে পরের কথা।

রিম-সিনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সমগ্র সুমের দেশ অধিকার করেছিলেন হাম্মুরাবি। উরের প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে স্যার লিওনার্ড উলি হাম্মুরাবির বিজয়-স্মৃতির (war memorial) উল্লেখ করে বলেছেন, পরবর্তী কালে উর যখন ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সেই স্মৃতিচিহ্নটিও তখন ধ্বংস পেয়েছিল। হাম্মুরাবির দিগ্বিজয়ের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি ইলাম দেশের নানান স্থানে হামলা চালিয়ে নগর-প্রাচীরগুলি বিধ্বস্ত করেছিলেন এবং শত্রুসৈন্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। বর্ণনায় সুবরতু নামক একটি দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়—সম্ভবত আসিরিয়া সেই দেশেরই অন্তর্ভুক্ত। আসিরিয়ার আসুর ও নিনেভে নগরদ্বয় যে হাম্মুরাবির শাসনাধীনেই ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। হাম্মুরাবির একখানি পত্রের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে আসিরিয়া বেশ কায়েমীভাবেই দখল করা হয়েছিল, সেখানে ব্যাবিলোনীয় সৈন্য স্থাপন করে। পশ্চিমাঞ্চলেও অভিযানের বর্ণনা আছে 'হাম্মুরাবির কোড' (Code of Hammurabi)-এর ভূমিকায়। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নানান অঞ্চলের নগর-সমূহের পূর্ণ বিবরণ এই কোডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পশ্চিম দিকে সিরিয়ার প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল হাম্মুরাবির সাম্রাজ্য, তার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় একটি দলিল থেকে। ইউফ্রেটিসের উত্তরভাগে প্রাপ্ত একটি চাকতির ওপর লিখিত এই দলিল—তার মধ্যে 'খানা'-রাজ্যের নৃপতি হাম্মুরাবির নামের উল্লেখ আছে। এই হাম্মুরাবি যে ব্যাবিলন-রাজ হাম্মুরাবি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কোড-এর বর্ণনা আত্মপ্রশস্তির জন্য দিগ্বিজয়-কাহিনী নয়,

অধিকৃত নগরসমূহের দেবতাদের উদ্দেশে মন্দির নির্মাণ, মূর্তি স্থাপন প্রভৃতি কি কি ধর্ম-কর্ম করেছেন তিনি, তারই বিবরণ। কোডের এই ভূমিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুই নদী উপত্যকার আসমুদ্রবিস্তৃত উর্বর শস্যশ্যাম ভূখণ্ডের সমৃদ্ধ নগর-রাষ্ট্রগুলির একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন হাম্মুরাবি, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব অঞ্চলে আসিরিয়া ও ইলাম অবস্থিত ছিল তাঁর সাম্রাজ্য-পরিধির অভ্যন্তরে, আর পশ্চিমভাগে সেই সাম্রাজ্য সিরিয়ার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হয়েছিল যে সামরিক গঠনব্যবস্থার ফলে, সেই ক্রমবর্ধমান শক্তির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছিল হাম্মুরাবির একাগ্র নিষ্ঠা ও অতুলনীয় ধৈর্য, এবং অসাধারণ তিতিক্ষা-বলেই পরিশেষে তিনি সুমের ও আক্‌কাডের সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, পূর্বে যেমন একদিন ঐ দেশটি অধিকার করে সে দেশের সম্রাট হয়েছিলেন তাঁরই স্বজাতীয় জনৈক বীরপুরুষ, যাঁর নাম সারগন।

ব্যাবিলনের সামরিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সামু-লা-ইলাম, কিন্তু দেশকে জ্ঞানগরিমায় উদ্ভাসিত করে সুশাসনের দ্বারা ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতিকে জগতের কাছে মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন হাম্মুরাবি। বাইবেলের মান্ধাতা মহাপ্রবীণ আব্রাহামের আদি নিবাসভূমি ছিল 'কালডিসদের উর' (Ur of the Chaldees)—সেখান থেকে তিনি ক্যানানে এসে বসবাস করেছিলেন, বাইবেলে তার বর্ণনা আছে। হাম্মুরাবি ছিলেন আব্রাহামের স্বজাতীয় এবং সমসাময়িক ব্যক্তি। বাইবেলের 'জেনেসিস' (Genesis) গ্রন্থে 'আমরাফায়েল' (Amraphael) নামে যে নৃপতির উল্লেখ রয়েছে, তিনিই হাম্মুরাবি। এই প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ নরপতির সাংগঠনিক কর্মজীবন ও ন্যায়নিষ্ঠার মহত্ত্ব তাঁর সামরিক দিগ্বিজয়ের খ্যাতিকেও কতদূর অতিক্রম করেছিল সেই পরিচয় পাই আমরা তাঁর সুবিখ্যাত 'কোড' বা আইনসমূহে যেমন, তেমনি তাঁর লিখিত কতগুলি চিঠিপত্র (despatches) থেকে। ১৯০২ খৃস্টাব্দে পারস্যের সুসা নগর খননকালে একটি বৃহৎ শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়—সেই শিলাখণ্ডে হাম্মুরাবির রাজ্যের যাবতীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে উৎকীর্ণ ছিল। শিলাখণ্ডটি সুসায় অপসারিত করেছিলেন ব্যাবিলন আক্রমণকারী ইলাম-রাজ শত্রুক নাখ্‌-খুন্‌তে—আমরা তা পরে দেখব। হাম্মুরাবির এই কোড (Code of Hammurabi) অপেক্ষা প্রাচীনতর বা অধিকতর সুসম্বদ্ধভাবে লিখিত কোন

আইন-গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নি—যদিও সুমেরীয় রাজা উরুকাগিনার সংস্কার-বিধি (reforms)-গুলি থেকে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সে দেশে লিখিত আইনের প্রয়োগ পূর্বকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কোডটি হয়তো বা সেই সুসভ্য দেশের বিধানসমূহের সংকলন। কিন্তু তা হলেও আইনের ইতিহাসে হাম্মুরাবির কোডের মূল্য অসামান্য, যেহেতু রোমানদের পূর্বে এমন সুপরিকল্পিত আইন-রচনা প্রচেষ্টা আর দেখা যায় না। কোডের বিশেষত্ব এই যে, সমাজ-নীতি শাসনপদ্ধতি ও দণ্ডবিধির আনুপূর্বিক বিবরণ এমন বিশদভাবে লিপিবদ্ধ যে তখনকার সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রপরিচালনা, ব্যক্তির স্বত্ব ও অধিকার কোন বিষয়েই অস্পষ্ট ধারণা পোষণের অবসর নেই। কোডে বর্ণিত বিষয়গুলির আলোচনা আমরা পরের অধ্যায়ে করব।

হাম্মুরাবির পত্র হুকুমনামা ও শাসনব্যবস্থা

হাম্মুরাবির লেখা পঞ্চান্নটি পত্র ও হুকুমনামা উদ্ধার করা হয়েছে, যা থেকে সম্রাটের কর্মব্যস্ত জীবনের ধারা ও সুমহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। প্রশাসন ব্যাপারের কোন খুঁটিনাটি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি—দূরাঞ্চলের কর্মচারীদেরও তিনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজা শুধু যে গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় কর্মগুলিই নিষ্পন্ন করতেন তা নয়—প্রজাদের সামান্য অভিযোগ, কলহবিবাদের মীমাংসায়ও মনোযোগ দিতেন। শাসকদের স্বয়ং আদেশ দিয়েছেন তিনি, মজা নদী খনন করে নৌচালনার ব্যবস্থা করবার জন্য। রাজা ছিলেন বিপুল মেষপালের মালিক—যাযাবর পিতৃপুরুষের শোণিত তখনো তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত। মধুমাসে পশুলোম সংগ্রহের সময় বিরাট উৎসবের আয়োজন করতেন তিনি, এবং সেই উৎসবে রাজপুরুষদের উপস্থিত থাকবার নির্দেশ দিতেন। চান্দ্রমাসিক বৎসরে যখন পুরো একটি মাসই ঋতুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তিনি তখন শাসকবৃন্দের কাছে পরোয়ানা দিলেন: "বৎসর গণনায় ঘাটতি দেখা যায়, সুতরাং যে মাসটি এইমাত্র আরম্ভ হল, সেই মাসটিকে বছরের প্রথম মাস না ধরে দ্বিতীয় মাস বলে গণ্য করতে হবে।" কিন্তু সেই সঙ্গে প্রজাদের সতর্ক করে দেওয়া হল এই বলে যে, বৎসর গণনার রীতির পরিবর্তনের জন্য বিলম্বে খাজনা দেওয়া চলবে না। আদেশপত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, কর্মচারীদের উৎকোচ

গ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতি নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন তিনি। উৎকোচ গ্রহণকারী কর্মচারীকে কঠোর শাস্তি দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বোধ করি এই অপরাধের জন্যেই একটি আদেশপত্রে তিনজন রাজকর্মচারীকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিয়েছিলেন তিনি।

হাম্মুরাবির প্রাসাদে রাজদরবার বসত, আর সেখানে আসত বিচার-প্রার্থীরা, যারা পায় নি সুবিচার বিচারকমণ্ডলীর কাছ থেকে। প্রার্থীর আরজিমত স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে শুনানির তারিখ মুলতুবি করা হয়েছে। দেখা যায় রাজদরবারে মকদ্দমার বিবরণ রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হত, আর বিচারপ্রার্থীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি রাজার যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। রাজপ্রাসাদ যে শুধু ধর্মাধিকরণ বা বিচারালয় মাত্র ছিল, তা নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময়-কেন্দ্র (Royal Exchange) প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে, মহাধিকরণও (Secretariat) ছিল সেই প্রাসাদ। বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিলপত্র সেখানেই লেখা হত, প্রাসাদ ছিল রাজকার্য পরিচালনার কেন্দ্রস্থল। হাম্মুরাবির রাজপ্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই। তের শত বৎসর পরে আসিরিয়ার রাজা সেন্নাচেরিব ব্যাবিলন নগরটিকে এমনভাবে ধ্বংস করেছিলেন যে এক খণ্ড প্রস্তর বা ইষ্টকও অবশিষ্ট ছিল না। নব-ব্যাবিলোনীয় (Neo-Babylonian) সাম্রাজ্যকালে নেবুকাডনেজ্জার রাজপ্রাসাদ পুনর্নির্মাণ করেন।

॥ দুই ॥

'হাম্মুরাবির কোড' : সমাজ-সংস্থা

সুমেরীয় ইতিহাস-পুরাণ আলোচনায় আমরা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রাষ্ট্ররূপ কল্পনার কথা বলেছি—কিরূপে আনু, এনলিল, এনকি প্রভৃতি প্রধান দেবতারা বিশ্বের শাসকরূপে নির্ধারিত কর্মে রত থেকে জগৎ-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন, আর তাঁদেরই প্রতিনিধিরূপে পৌর দেবতারা করতেন নগর-শাসন। সহস্রাধিক বৎসর অন্তে হাম্মুরাবির যুগেও এই দৈবী রাষ্ট্র-পরিকল্পনার কোন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু মানবীয় রাষ্ট্র-সংস্থা আদিকালের সেই আদিম গণতন্ত্র (primitive democracy)-কে ত্যাগ করে একচ্ছত্র রাজার হস্তে শাসন-শক্তি তুলে দিয়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে। সাম্রাজ্যবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সারগনের রাজত্বকালে—তারপর থেকে রাজশাসন সম্পূর্ণ এক-নায়কত্বে গিয়েই দাঁড়িয়েছিল। রাজশক্তিকে কেন্দ্রীভূত ও পরাক্রান্ত করে তোলাই সাম্রাজ্য বিস্তারের একমাত্র উপায় এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যেই সম্রাটের অপরিসীম শক্তি পরিচালনার প্রয়োজন। এইরূপেই কেন্দ্রশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে রাজ্যবিস্তার ছাড়াও আর কতগুলি শুভ পরিণাম দেখা দিয়েছিল। ধর্মাধিকরণে বিচার প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল, দণ্ডভোগও অপকর্মের অনিবার্য ফল-স্বরূপ হয়ে উঠল। ন্যায়বিচার যে প্রত্যেক মানুষের জন্মগত অধিকার, মানব-চিত্তে এই ধারণা জন্মাতে ও দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। 'হাম্মুরাবির কোডে'ই আমরা প্রথম দেখতে পাই যে, প্রজার প্রতি ন্যায়বিচার রাজার অনুগ্রহ মাত্র নয়—ন্যায়বিচার তার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার।

লাগাসের রাজা উরুকাগিনা এবং উরের রাজা উর-এঙ্গুর ও ডুঙ্গি শাসন-সৌকর্যের জন্য পূর্বকালে আইন প্রণয়ন করেছিলেন। হাম্মুরাবির কোড বা দণ্ড ও কার্য বিধি সেই আইনগুলির সংকলন এরূপ মনে করবার কারণ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, দৈবানুগ্রহে কোডটি পেয়েছেন হাম্মুরাবি, এই দাবিই করেছেন তিনি। কোডের শিলাখণ্ডের শিরোভাগে উৎকীর্ণ দুইটি মূর্তি দেখা যায়, উভয়ই শ্মশ্রুমান, আসনে উপবিষ্ট মূর্তি সূর্যদেবতা সামাস-এর, আর তাঁর সমুখে দণ্ডায়মান প্রতিমূর্তি হাম্মুরাবির, সামাসের নিকট থেকে কোডটি গ্রহণ করছেন

তিনি। মুখবন্ধে বলা হয়েছে: "আনু ও বেল (স্বর্গ ও মর্ত্যের দেবতাদ্বয়) তাদের সেবক রাজাধিরাজ হাম্মুরাবিকে আদেশ দিলেন, দুষ্টের দমন আর দুর্বলকে পরাক্রান্ত ব্যক্তির অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্য ন্যায়বিচারের প্রতিষ্ঠা করতে—মানুষের যেন কল্যাণ হয়, দেশ যেন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়।" সূচনায় দেবতার প্রশস্তি থাকলেও কোডটি ধর্মান্ধতাবর্জিত, ব্যবহারিক প্রয়োজনের সম্পূর্ণ উপযোগী করেই বিধানগুলি রচিত হয়েছে।* তবে এ কথাও যথার্থ যে প্রকৃষ্ট ন্যায়বুদ্ধির সূত্রে অনুবিদ্ধ নানারূপ কল্যাণকর বিধিব্যবস্থার সঙ্গে বর্বরোচিত শাস্তিবিধানও দেখা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, 'কৃচ্ছ্র পরীক্ষা'র (trial by ordeal) উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন নারী সতী কি অসতী তা নির্ধারণ করবার জন্য তাকে বদ্ধাবস্থায় জলে নিক্ষেপ করা হত—সে যদি ভেসে ওঠে তবেই প্রমাণিত হয় যে সে সতী। এই পরীক্ষাটি রামায়ণে বর্ণিত সীতার অগ্নিপরীক্ষার সমতুল্য। আবার পরিণীতার প্রতি অত্যাচার যেন না হয়, সে বিষয়ে আইনসংগত খুঁটিনাটি ব্যবস্থারও ত্রুটি ছিল না। কোডে ২৮৫টি ধারা, বিষয় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত, যেমন ব্যক্তি-সম্পত্তি, ভূমি-স্বত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারিবারিক সম্বন্ধ, ক্ষয়-ক্ষতি, শ্রম ইত্যাদি। আধুনিক জগতের আইনের মান উন্নত পর্যায়ে উঠেছে, সে কথা স্বীকার করতেই হয়, অনেক বিষয়ে হাম্মুরাবির কোড আধুনিক আইনেরই সমকক্ষ। কোডেব পরিসমাপ্তি করা হয়েছে যে কথাগুলি বলে, তার উদার ব্যঞ্জনা, বর্ণনা ও বাচনভঙ্গির তুলনা আইনের ইতিহাসে সত্যই বিরল। পরিশিষ্টে বলেছেন হাম্মুরাবি: "সুবিজ্ঞ নৃপতি হাম্মুরাবি ন্যায়সংগত বিধানসমূহ প্রবর্তন করে দেশের প্রশাসনকে পরিশুদ্ধ ও স্থিতিশীল করেছেন। প্রজাকুলের শাসক ও অভিভাবক আমি। সুমের ও আক্কাডের প্রজাপুঞ্জকে বক্ষমধ্যে রক্ষা করেছি আমি…প্রজ্ঞা দ্বারা আমি তাদের কার্য

* আধুনিক সভ্য জগৎ ধর্মসংস্কার-মুক্ত বিধান রচনারই পক্ষপাতী। এই দৃষ্টি-পথের পথিক যাঁরা তাঁদেরই পুরোধারূপে ইতিহাসে হাম্মুরাবি একটি গৌরবময় স্থানের অধিকারী। রোমান আইন নিঃসন্দেহে এই ব্যাবিলোনীয় পূর্বসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। ভারতবর্ষে চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র দণ্ডবিধিতে কোন ধর্মীয় অনুশাসন নেই বটে, কিন্তু মনু-সংহিতায় অপরাধীর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে যেমন, তেমনি আবার পাপ-পুণ্য; স্বর্গ-নিরয়বাস প্রভৃতি ধর্মীয় বিধানেরও অভাব নেই।

প্লেট ৯

(খ) সুমেরীয় দেবতা

(ক) দণ্ডায়মান হাম্মুরাবিকে সূর্যদেবতা শামাস 'কোড' বা আইন-গ্রন্থ প্রদান করছেন—প্রস্তর-ফলকে কোডের ধারাসমূহ উৎকীর্ণ
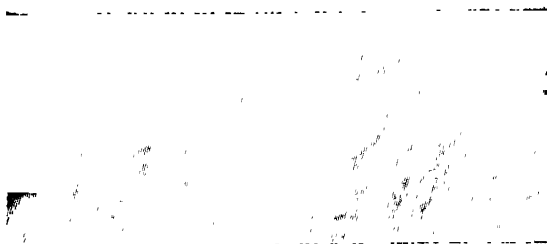
(ক) মহাবীর গিলগামেশের সিংহের সঙ্গে লড়াই-এর দৃশ্য-
চোঙা-সিলমোহরে উৎকীর্ণ
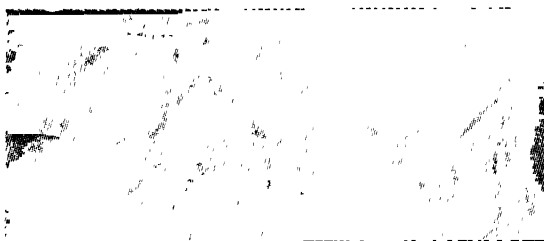
(খ) বন্য জন্তুর সঙ্গে গিলগামেশ ও এনকিদু-র লড়াই-এর দৃশ্য-
চোঙা-সিলমোহরে উৎকীর্ণ

(গ) পৌরাণিক জীবজন্তু বৃষ ও সিংহের লড়াই—
চোঙা-সিলমোহরে উৎকীর্ণ

নিয়ন্ত্রিত করেছি এইজন্যে যে, সবল যেন দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে না পারে, পতিহীনা ও পিতৃমাতৃহীন যেন সুবিচার লাভ করে। ন্যায়নিষ্ঠ রাজার (হাম্মুরাবির) প্রতিমূর্তির সমীপে নিপীড়িত অভিযোগকারী যেন এসে দাঁড়ায়। সে যেন স্মৃতিস্তম্ভের ওপর উৎকীর্ণ এই লিখন পাঠ করে আমার গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলির মর্ম প্রণিধান করে। আমার এই স্মৃতিস্তম্ভই যেন তাকে সচেতন করে দেয় তার অভিযোগের দায়িত্ব সম্বন্ধে, সে যেন অভিযোগের প্রকৃতি সম্যক উপলব্ধি করে। সে যেন নিশ্চিন্ত হয় এই ভেবে যে, হাম্মুরাবি এমন একজন শাসক যিনি প্রজাদের পিতৃতুল্য...সমৃদ্ধি বহন করে এনেছেন তিনি প্রজাদেরই জন্য, দুর্নীতিমুক্ত বিশুদ্ধ প্রশাসনের ব্যবস্থা করেছেন।...... স্মৃতিস্তম্ভে এই যে নীতিগর্ভ ন্যায়ের বিধানগুলি লিপিবদ্ধ করলাম আমি, অনাগত ভবিষ্যতের ভূপতিবৃন্দ যেন সেই উপদেশ অনুসারেই কর্ম করেন।"

সমাজে শ্রেণী-বিভাগ

হাম্মুরাবির কোডে দেখা যায়, সমাজ ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) 'আমেলু' (amelu) বা উচ্চ শ্রেণী ; (২) 'মুসকিনু' (muskinu) বা মধ্য-শ্রেণী ; এবং (৩) 'আরদু' (ardu), অর্থাৎ নিম্ন বা ক্রীতদাস শ্রেণী। মন্ত্রীবর্গ, উচ্চ রাজকর্মচারী ও ভূম্যধিকারীগণ ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু ধনদৌলত ও পদমর্যাদাই কেবল কোন ব্যক্তিকে উচ্চ শ্রেণীর অধিকার দান করে না। বস্তুত উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তির যদি ধন-ঐশ্বর্য বা পদমর্যাদা নষ্টও হয়, তথাপি সে তার শ্রেণীগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে আমরা একটি সত্যকার জাতিভেদের সন্ধান পাই এই শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে, যার মূলে রয়েছে বংশক্রম। সমাজে সেমেটিক অভিজাতবর্গের স্থানই ছিল সর্বোচ্চ। অভিজাতবর্গ ও ক্রীতদাস, এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি যেসব ব্যক্তি সমাজে বিদ্যমান, তাদের নিয়ে মধ্যম শ্রেণী গঠিত। সকলেই তারা দরিদ্র নয়, বিষয়-সম্পদ ও ক্রীতদাসের মালিক হবার অধিকার ছিল তাদের, কিন্তু তা সত্ত্বেও উচ্চ শ্রেণীর বিশেষ সুযোগ-সুবিধার উপভোগ-সুখ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। জাতি হিসাবে তারা ছিল সম্ভবত সুমেরীয়, অথবা পূর্বাগত আক্কাডীয় সেমেটিকগণের সঙ্গে স্থানীয় রক্তের সংমিশ্রণে যে বর্ণ-সংকর জাতির উদ্ভব হয়েছিল সেই জাতি। দণ্ডবিধিতে উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মধ্যে ব্যবস্থাগত প্রভেদ

বিশেষরূপেই দেখা যায়। শাস্তিরও তারতম্য আছে। বিচারালয়ে অভিজাত বংশীয় কোন ব্যক্তি মন্দিরের পশু বা নৌকা চুরি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তার অর্থদণ্ড হত অপহৃত দ্রব্যের মূল্যের ত্রিশ গুণ। আর ঠিক সেই ক্ষেত্রেই মধ্য শ্রেণীর ব্যক্তির অর্থদণ্ড ছিল মূল্যের দশ গুণ, এবং তার কোন বিষয়সম্পদ না থাকলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত সে। কোন সাধারণ ব্যক্তি সমশ্রেণীর কোন মানুষকে আঘাত করলে দশ 'সেকেল' (আনুমানিক দু শো টাকা) জরিমানা হত, আর অভিজাত বংশীয় কোন ব্যক্তিকে আঘাত করলে ঐ অর্থের ছয় গুণ পরিমাণ তাকে অর্থদণ্ড দিতে হত। মধ্য শ্রেণীর আসামীর সাধারণ কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধে অর্থদণ্ড ছিল অল্প, বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারেও সেই শ্রেণীর ব্যক্তির ব্যয় ছিল অল্প, আর অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার জন্য চিকিৎসককে দেয় নির্ধারিত ফিসের পরিমাণও ছিল অল্প। এসব সুবিধা সত্ত্বেও মধ্য শ্রেণীর লোকের জীবনের মূল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর।

ক্রীতদাস ছিল উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। দাসের সর্বময় প্রভু তার মালিক, পশুর মত দাসকে হাটে-বাজারে বিক্রি করা হত। যুদ্ধে পরাজিত বন্দীদের দাসে পরিণত করা হত। মরুবাসী বেদুইনরাও কোথাও হানা দিয়ে মানুষ ধরে দাসরূপে বিক্রয় করত সেই দুর্ভাগা মনুষ্যদের। ক্রীতদাসের ব্যবসা সে যুগে বেশ লাভজনকই হয়ে উঠেছিল। দাসকে হস্তান্তর করা হত বিক্রি কবালা বা দানপত্র সম্পাদন দ্বারা। বর্তমান টাকার মূল্যে একজন ক্রীতদাসীর বাজার-দর ছিল ৮০৲ থেকে ২৬০৲, আর ক্রীতদাসের মূল্য ২০০৲ থেকে ৪০০৲। সকল প্রকার কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে হত ক্রীতদাসদের, পশুচারণ ও কৃষিক্ষেত্রের কার্যও তারাই করত। ক্রেতার অভিরুচিমত ক্রীতদাসী হত তার শয্যাসঙ্গিনী, আর তা যদি না হতে পারত তা হলে নিজেকে উপেক্ষিতা মনে করে তার ক্ষোভের সীমা থাকত না। ক্রীতদাসের জীবনমরণের প্রভু ছিল তার অধিস্বামী, বন্ধক দিতে পারত তাকে, আর সে যদি অকর্মণ্য হত তবে তাকে হত্যাও করতে পারত। পলাতক ক্রীতদাসকে আশ্রয় দেওয়া আইনত ছিল একটি অপরাধ, তাকে ধৃত করে আনতে পারলে পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। পক্ষান্তরে প্রভু তার চিকিৎসার ব্যয় বহন করত, এবং বৃদ্ধ বয়সে তাকে ভরণ-পোষণ করত।

আইন : দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা

দণ্ডবিধি শুরু হয়েছিল প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা থেকে—রোমান আইনে এই ব্যবস্থাকে বলা হয় *lex talonis*—অর্থাৎ চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। যেমন, কেউ যদি অপরের কন্যাটিকে হত্যা করে তবে তার নিজের মেয়ের হবে মৃত্যুদণ্ড। ক্রমে এই বর্বর পদ্ধতি পরিহার করে দণ্ড শুধু ক্ষতিপূরণ বা অর্থদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু দণ্ডের এই কোমল ব্যবস্থার রূপটিও স্থায়ী হল না, তার সর্বশেষ পরিণতি মৃত্যুদণ্ডের পুনঃপ্রবর্তন আর অঙ্গচ্ছেদের বিধান। পিতাকে আঘাত করলে পুত্রের হাত কেটে ফেলা হত। অস্ত্রোপ-চারের ফলে রুগীর মৃত্যু ঘটলে বা চক্ষু নষ্ট হলে চিকিৎসককে দণ্ড দেওয়া হত তার অঙ্গুলি ছেদন করে। কয়েকটি বিশেষ অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, যেমন বলাৎকার, হরণ, দস্যুতা, সিঁদ চুরি, স্বামীহত্যা, পূজারিনীর শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ, পলাতক ক্রীতদাসকে আশ্রয় দান, কর্মচারীর বিশ্বাস-ঘাতকতা ইত্যাদি। কত সহস্র বৎসর ধরে চলে এসেছিল এমনি সব রূঢ় দণ্ডপদ্ধতি যার ফলে মানুষের মন স্বভাবতই নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিল, এবং যুগে যুগে তার নিয়মানুগত্যের অভ্যাস নিজের অজ্ঞাতসারেই ভাবী সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করেছিল।

হাম্মুরাবির কোডে দ্রব্যমূল্য ও কয়েক শ্রেণীর শ্রমিক ও বিশেষ কর্মীদের মজুরি নিয়ন্ত্রণের বিধান আছে। রাজমিস্ত্রী, ছুতার, মাঝি, রাখাল ও মজুরদের নির্দিষ্ট মজুরির ব্যবস্থা আছে যেমন, চিকিৎসকের পারিশ্রমিকও আবার তেমন আইনে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার নমুনা-স্বরূপ কোডে লিখিত চিকিৎসা ও কৃষি-কর্ম বিষয়ক আইনের কয়েকটি ধারা নিম্নে উদ্ধৃত হল :

চিকিৎসা বিষয়ক বিধান

কোন চিকিৎসক কোন ব্যক্তির গভীর ক্ষতের ওপর ব্রঞ্জ অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রোপচার করে তার জীবন রক্ষা করলে, অথবা ব্রঞ্জ অস্ত্রের দ্বারা কোন ব্যক্তির চক্ষুর ক্ষতের ওপর অস্ত্রোপচার করে তার চক্ষু রক্ষা করলে, সেই চিকিৎসকের ১০ সেকেল পরিমাণ রুপো দক্ষিণা-স্বরূপ প্রাপ্য।

রোগী (মধ্যম শ্রেণীর) স্বাধীন মানুষ হলে দক্ষিণার হার ৩ সেকেল।

রোগী দাস হলে, ক্রীতদাসের মালিক চিকিৎসককে ২ সেকেল রুপো দক্ষিণা দেবে।

কোন চিকিৎসক কোন ব্যক্তির গভীর ক্ষতের ওপর ব্রঞ্জ অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রোপচার করে তার মৃত্যু ঘটালে, অথবা ব্রঞ্জ অস্ত্রের দ্বারা কোন ব্যক্তির চক্ষুর ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করে চক্ষু নষ্ট করলে, চিকিৎসকের শাস্তি অঙ্গুলিচ্ছেদন।

কোন চিকিৎসক কোন ব্যক্তির ক্রীতদাসের গভীর ক্ষতের ওপর ব্রঞ্জ অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রোপচার করে তার মৃত্যু ঘটালে, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ চিকিৎসক ক্রীতদাসের প্রভুকে একটি সমমূল্যের ক্রীতদাস প্রদান করবে।

সে যদি ব্রঞ্জ অস্ত্র দ্বারা অস্ত্রোপচার করে ক্রীতদাসের চক্ষু নষ্ট করে তা হলে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ চিকিৎসক ক্রীতদাসের ক্রয়মূল্যের অর্ধেক পরিমাণ রুপো মালিককে প্রদান করবে।

যদি কোন চিকিৎসক কোন ব্যক্তির ভগ্ন অস্থি জোড়া দেয়, কিংবা তার পেটের ব্যারাম আরোগ্য করে তা হলে রোগী চিকিৎসককে ৫ সেকেল রুপো দক্ষিণা দেবে।

রোগী যদি (মধ্যম শ্রেণীর) স্বাধীন ব্যক্তি হয় তা হলে ৩ সেকেল দক্ষিণা দেয়।

রোগী যদি ক্রীতদাস হয় তবে তার মনিব চিকিৎসককে ২ সেকেল দক্ষিণা প্রদান করবে।

কৃষি বিষয়ক বিধান

যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে তার কৃষি-কর্ম পরিদর্শন ও পরিচালনার্থ বীজ শস্য ও চাষের বৃষ দেয় এবং তার সঙ্গে জমি চাষের চুক্তি করে, আর সেই ব্যক্তি যদি বীজ কিংবা শস্য চুরি করে আর সেই অপহৃত শস্য যদি তার দখলে পাওয়া যায় তবে অপরাধীর শাস্তি অঙ্গুলিচ্ছেদন।

যদি সেই ব্যক্তি বীজ শস্য গ্রহণ করে এবং বৃষকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় তা হলে সে উপ্ত শস্যের সমপরিমাণ শস্য প্রত্যর্পণ করবে।

যদি সেই ব্যক্তি বৃষগুলিকে অপর কোন ব্যক্তিকে ভাড়া দেয় কিংবা বীজ শস্য চুরি করে এবং ক্ষেতে কোন শস্য না থাকে, তা হলে সেই

ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে এবং প্রত্যেক 'গণ' পরিমাণ শস্যের জন্য ৬০ 'গুর' পরিমাণ শস্য তাকে মেপে দিতে হবে।

কোন ব্যক্তি কৃষি-কার্যে জনমজুর নিযুক্ত করলে প্রতি বছর সে তাকে (মজুরকে) ৮ গুর পরিমাণ শস্য প্রদান করবে।

আদালতে উকিল-মোক্তারদের মত কোন ব্যবহারজীবী প্রতিষ্ঠান দেখা যায় না, হয়তো ওই শ্রেণীর ব্যক্তিদের আবির্ভাব তখনো হয় নি। মামলা-মকদ্দমা রুজু করতে লোকদের কোনরূপ উৎসাহ দান করা হত না, তার প্রমাণ দণ্ডবিধির প্রথম ধারাটিতেই পাওয়া যায়: "যদি কোন ব্যক্তি অপরের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় একটি মিথ্যা অভিযোগ করে, যা সে প্রমাণ করতে অক্ষম, তা হলে অভিযোগকারীর শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড।" দণ্ডবিধির ২২-২৪ ধারায় প্রজার ধন-প্রাণ রক্ষার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে শাসন-কর্তার ওপর: "যে ব্যক্তি দস্যুতা করে, ধরা পড়লে তার হবে প্রাণদণ্ড। আর সে যদি ধরা না পড়ে তা হলে দস্যু যে ব্যক্তির ধন লুণ্ঠন করেছে, তাকে দেবতার সমুখে শপথ করে অপহৃত দ্রব্যের তালিকা সরকারে পেশ করতে হবে, আর শাসনকর্তা সেই অনুসারে তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। কেউ যদি নিহত হয়ে থাকে, তার জীবনের মূল্যস্বরূপ উত্তরাধিকারীকে শাসনকর্তা এক 'মিনা' (আন্দাজ ১২০০ টাকা) অর্থ দান করবেন। এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে আধুনিক সভ্য সমাজে অপরাধ নিবারণের জন্য বিস্তৃত পুলিশী ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রজার ধন-মান হানি ঘটলে তার খেসারত দেবার গুরু দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রই এ যাবৎ গ্রহণ করতে সাহস করে নি।*

মন্দিরের সম্পত্তি বাদ দিয়ে, বাকি জমির মালিক ছিলেন রাজা, অভিজাত-

* হাম্মুরাবি-কোডের আইনব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে ডবলু. এইচ. ডি বার্জ তাঁর *The Legacy of the Ancient World* গ্রন্থে বলেছেন, "It is extraordinarily interesting to read how such modern problems as exemption of military service, fixity of tenure, compensation for agricultural improvements, control of liquor traffic, banking deposits, liability for wife's debts and the legal rights of women and children were regulated by this Babylonian sovereign at the close of the third millennium B. C....The code itself remained in force well on into the Christian era and influenced subsequently the Mohammedan conquerers of the East."

স্বর্ণ ও ব্যবসায়ীরা। মন্দিরের বিষয়াদি পূজারীরাই ভোগ করতেন এবং তাঁরা ছিলেন একটি শক্তিশালী সম্প্রদায়। মালিকদের কাছ থেকে প্রজা জমির বন্দোবস্ত নিত চাষ করবার জন্য। প্রজা কর্তৃক জমি চাষ ও জমিদার-প্রজা সম্বন্ধ বিষয়ে কোডে সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বোধ করি প্রায়ই ঘটত, জমির ফসল নষ্ট করত পশু, তাই নিয়েও এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের বিবাদ বাধত। অপরাধীর দণ্ড বা ক্ষতি-পূরণের বিধান কোডে বিস্তারিতভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রাজা ছিলেন অসংখ্য পশু ও মেষপালের মালিক। পশুপালন পর্যবেক্ষণের জন্য একদল রাজকর্মচারী ছিল, যারা রাজার কাছে রাখালদের পালন-কার্য সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট পেশ করত।

পূর্ত ও কৃষি-কার্য—ব্যবসা-বাণিজ্য

রাষ্ট্রের একটি প্রধান কাজ ছিল পূর্তকার্য ও জলসেচের ব্যবস্থা। প্রত্যেক রাজাই নূতন খাল কাটতেন, আবার পুরনো খাল মজে গেলে তার সংস্কারও করা হত। খালগুলিকে জলসেচের উপযোগী করে রাখার বিশেষ ভার ন্যস্ত ছিল শাসকদের ওপর। দাস শ্রেণীর মানুষ, গ্রামবাসী ও রায়তদের মেরামতের কাজ করতে বাধ্য করবার ক্ষমতা ছিল তাদের। এই কাজের বিনিময়ে প্রজাদের দেওয়া হত মাছ ধরবার অধিকার, তারা যেখানে কাজ করেছে সেই সীমানার মধ্যে—তারা ছাড়া আর কেউ সেই সীমানায় মাছ ধরলে দণ্ডনীয় হত। এই প্রসঙ্গে হাম্মুরাবির আদেশে কিশ নগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যে যে সুদীর্ঘ খালটি কাটা হয়েছিল তার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই খাল দিয়ে জল নিঃসারণের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের নগরগুলি প্লাবন থেকে রক্ষা পেয়েছিল। খাল কাটার দরুন প্রজার প্রভূত কল্যাণ হয়েছিল, তার বর্ণনা করে হাম্মুরাবি একটি লিখনে যে আত্মপ্রশংসা করেছেন তা সম্পূর্ণ মার্জনীয়। তিনি বলেছেন, "খালের উভয় তীরের ভূমিগুলি কর্ষণযোগ্য করেছি আমি, রাশি রাশি শস্যের স্তূপ তৈরি করেছি আমি, অফুরন্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছি আমি···বিক্ষিপ্ত লোকদের একত্রিত করেছি আমি, চারণভূমি ও জল দিয়েছি তাদের, শান্তিপূর্ণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি।"

বর্তমান মিশর ও ইরাক দেশে নদীগর্ভ বা খাল থেকে জল তুলবার এক-প্রকার সেচ-যন্ত্র (irrigation machine) দেখা যায়। হাম্মুরাবির কালেও এই সেচযন্ত্রের প্রচলন ছিল, সেচ-প্রণালীর বিশেষ পরিবর্তন আজও হয় নি। এইসব প্রাচীন প্রণালীর প্রচলন দেখেই পূর্বাঞ্চলকে 'অপরিবর্তনীয় প্রাচী' (Unchanging East) বলে এককালে আখ্যা দিয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা। কূপ থেকে জল তুলবার অনুরূপ ব্যবস্থা আমাদের দেশেও আছে। একটি বাঁশের এক প্রান্তে এক খণ্ড ভারি পাথর বাঁধা, অপর প্রান্তে লম্বা দড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকে একটি বালতি, এবং উঁচু একটি কাষ্ঠখণ্ড মাটিতে প্রোথিত করে তার মাথায় আড়াআড়িভাবে বসানো হয় সেই বাঁশটিকে। কৃষক হাতে করে বালতি কূপের মধ্যে নামিয়ে জল ভরে, আর যেমন সে ছেড়ে দেয় দড়িটিকে অমনি অন্য দিকের পাথরের ভারের দরুন জল-ভরা বালতি আপনা থেকেই উঠে পড়ে। ঠিক এমনিধারা জলসেচ-যন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায় ব্যাবিলোনীয় শিলালিপিতে। তা ছাড়া চর্মাধারপূর্ণ জল সুকৌশলে নদীগর্ভ থেকে তুলে কাঠের দুনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থাও ছিল এবং সেই দুনির জলে ভূমি সিঞ্চিত করা হত। নদীগর্ভ থেকে জল-ভরা চর্মাধারটিকে তোলা হত বলদের সাহায্যে। দেখা যায়, সুদূর অতীত কালেও বলীবর্দ শুধু কৃষি-কার্যের জন্যই ব্যবহৃত হয় নি, জলসেচ-যন্ত্রের কাজেও নিযুক্ত হত।

সিলমোহর বা চাকতির ওপর অঙ্কিত হলকর্ষণের চিত্র দেখে স্পষ্টই মনে হয় তখনকার দিনের লাঙলই চলে এসেছে আজও জগতে এবং কর্ষণ-প্রণালীরও বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। হলকর্ষণ চিত্রের সর্বপ্রাচীন সিলমোহর খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দের। একটি চিত্রে দেখা যায়, এক জোড়া বলদ লাঙল টানছে, বলদ তাড়না করছে একজন লোক, এক ব্যক্তি ধরে আছে লাঙল, অপর একটি কৃষক চোঙার মধ্য দিয়ে জমিতে বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। জমি চাষ ও বীজ ছড়ানোর পূর্বে ভূমিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে আল বাঁধত কৃষক, এবং জলের প্রয়োজন হলে সেই আল কেটেই মাঠে জল আনত। হাম্মুরাবির যে চিঠিপত্র ও হুকুমনামার কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি, খালগুলি শুধু যে সেচের জল সরবরাহ করত তা নয়, জলযান চলাচলের পথও ছিল সেইসব খাল। শস্য, খেজুর, তিমি,

কাঠ, পশম, তৈল প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য অনেক ক্ষেত্রে বহন করা হত জলপথে। জাহাজ, নৌকা ও ভারবাহী ভেলাগুলির আকার ও গঠন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় সেকালের লেখনগুলিতে। বড় বড় জাহাজগুলিতে নাবিকদলের ওপর বিরাজ করতেন দস্তুরমত একজন কাপ্তেন। মুদ্রার প্রচলন হয় নি তখনো—বেতন বাবদ কি পরিমাণ শস্য পাবে নাবিকেরা, আইন
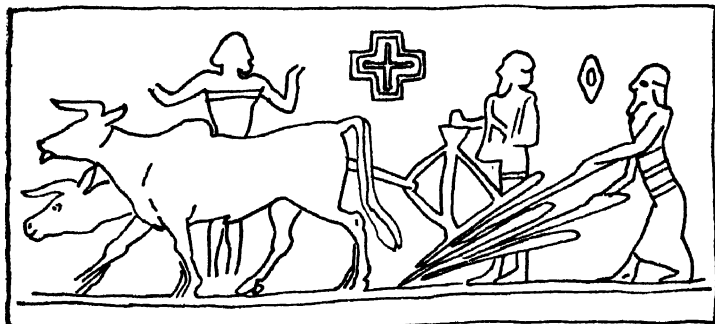
প্রাচীন কালের ব্যাবিলোনিয়ায় চাষের জন্য ব্যবহৃত লাঙলের রূপ—
ক্যাসাইট যুগের সিলমোহরে অঙ্কিত

করে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কর আদায় ও খালে নৌকাগুলির চলাচলের তদারকের জন্য কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। পলিমাটি জমে খাল বন্ধ হয়ে গেছে খবর পেয়ে একখানি পত্রে হুকুম দিলেন হাম্মুরাবি—তিন দিনের মধ্যে যেন মাটি কেটে খালটিকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়।

সারা ব্রঞ্জযুগ ধরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে চলেছিল। যবের দাম হাম্মুরাবির কালে আক্কাডীয় যুগের ডবল হয়েছিল। কারণ, কতকটা স্ফীতি (inflation) সন্দেহ নেই। দেশ জয়ের ফলে যে ধন বৃদ্ধি হয়েছিল তা লুঠ বই আর কিছু নয়। প্রকৃত সম্পদ বৃদ্ধি হয় ধনোৎপাদনের ফলে, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ধ্বংস-কার্য অপরিমিত ঐশ্বর্যের ক্ষয়-ক্ষতিই করেছিল, বৃদ্ধি করে নি। কৃষিপ্রধান দেশ ছিল ব্যাবিলোনিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যও কৃষিজাত অথবা পশুলোম-জাত দ্রব্য নিয়ে হত। ব্যাবিলোনিয়া ও ইলামের মধ্যে কারবারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠই ছিল, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য তুলাজাত দ্রব্য নিয়ে, আর মৃৎপাত্রের ব্যবসা চলত পশ্চিম দেশের সঙ্গে। বস্তুত ব্যাবিলন তখন একটি সর্বজনীন ব্যবসা-ক্ষেত্র, কেন্দ্রীয় বাজার হয়ে উঠেছিল, এই বাজারে

পূর্বদেশের ইরান ও ভারত আর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর প্রান্তের দেশসমূহের মধ্যে পণ্যবস্তুর আমদানি-রপ্তানি, বেচা-কিনির কার্য নির্বাহ হত। ব্যবসায়ীদের হাতে মূলধন জমেছিল বিস্তর। ফলে, এক শ্রেণীর কুসীদজীবী দেখা দিয়েছিল যারা চড়া সুদে ধার দিত। আইনের ব্যবস্থামত সুদের হার শতকরা কুড়ি থেকে ত্রিশ। অতিরিক্ত সুদের হার দেখে এই ধারণাই জন্মে যে, হাম্মুরাবির আইন মহাজনের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট, দায়গ্রস্তের কল্যাণচিন্তা করে নি। দায়িককে শুধু যে জমি বন্ধক দিতে হত, তা নয়—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, এমন কি নিজেকেও বন্ধক দেওয়া চলত। ঋণের জন্য দাসত্ব ছিল একটি আইনসংগত ব্যবস্থা। ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করা হত ধনিকের স্বার্থের অনুকূলে।

তাম্রের পরিবর্তে তখন ব্রঞ্জের ব্যবহার চলছিল। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রঞ্জ তৈরি করা হয়। ব্রঞ্জ তামার চেয়ে বেশি শক্ত। এই ধাতু দিয়ে নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও মূর্তি নির্মাণ করা হত। এই সময়কার একখানা লেখনে লোহার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সাধারণভাবে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হতে আরও হাজার বছর লেগেছিল। চক্রযুক্ত শকটের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু সেই শকট টানত গাধা, ঘোড়া নয়। ব্যাবিলোনিয়ায় অশ্বের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা যায় খৃঃ ২১০০ অব্দের একটি লিখিত বিবরণে। অশ্বের নাম দেওয়া হয়েছে সেখানে 'পূর্বদেশের গর্দভ'। হাম্মুরাবির রাজত্বের পর পূর্বাঞ্চল থেকে ক্যাসাইটরা ব্যাবিলোনিয়ায় অশ্ব নিয়ে এসেছিল, মিশরে যেমন অশ্ব এনেছিল হিকসোসরা। সিরীয় মরুভূমির উত্তরে এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে সারডিস নগর ও এজিয়ান সাগরের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ রাজপথে বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য পরিবহণ করা হত। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আইন ও ব্যবসা-ক্ষেত্রে পুরনো সুমেরীয় ভাষার বহু শব্দ ও পরিভাষা গৃহীত হয়েছিল। বস্তুত ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যাপারে সুমেরীয় ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। শুল্ক, খাজনা ও মূল্যাদি নগদ দেবার প্রথা ছিল না। নগদ মূল্যের স্থলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃষিজাত বা ধাতুদ্রব্য প্রদান করতে হত। মুদ্রার প্রচলন ছিল না, যদিও রৌপ্যের বিনিময় ব্যাপকভাবে সব ক্ষেত্রেই চলিত হয়েছিল। ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাপ করা হত যেসব ওজন দিয়ে, সেগুলির নাম—ট্যালেন্ট (talent), মানে (maneh) ও

সেকেল (shekel)।* 'পশ্চিম সেমাইট'গণ দ্রব্যবিনিময় ও মুদ্রামানের মধ্যবর্তী অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারে নি। একালে ব্যবসায়ীদের মাল নানা স্থানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত ব্যাপারীরা (traders) এবং সেজন্য আইন অনুসারে নির্দিষ্ট লাভের বখরা পেত তারা। ব্যবসায়ী ও ব্যাপারীদের মধ্যে অর্থ বা মালের আদানপ্রদান সম্বন্ধে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হত এবং যথারীতি রসিদ দেওয়ারও প্রথা ছিল। চুক্তি বা রসিদ ব্যতিরেকে কোনরূপ লেন-দেনের ব্যাপার আইনের চক্ষে ছিল অসিদ্ধ।

আব্রাহামের কালের শহর

সাম্প্রতিক খনন-কার্যে আব্রাহামের কালের (খৃঃ পূঃ ১৯০০) ব্যাবিলোনীয় শহরসমূহের পথঘাট, গৃহ ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সুপরিস্ফুট হয়েছে। পথগুলি ছিল সরু, আঁকাবাঁকা ও কাঁচা। দুই ধারে গৃহপ্রাচীর, তার ভেতর কোন জানালা নেই, কোনরূপ চক্রযুক্ত যান চলাচলের পক্ষে অযোগ্য রাস্তা। বাড়িগুলি অধিকাংশই মধ্যম শ্রেণীর লোকের। ভিত ও দেয়ালের নিম্নভাগ পোড়ানো ইট দিয়ে গাঁথা, উপরি-ভাগ রৌদ্রে শুকানো ইট দিয়ে তৈরি। পলেস্তারা ও চুনকাম করা দেয়াল, দোতলার সমান উঁচু, চত্বরের চারদিকে তের-চৌদ্দটি ঘর, ঘরগুলিতে আলো যাবার ব্যবস্থা আছে। বাড়িতে ঢুকেই আগন্তুক দেখবেন একটি ক্ষুদ্র জলাধার, সেখানে মুখ হাত ধুয়ে যাবেন চত্বরে। চত্বর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে উপরকার তলায়, আর সিঁড়ির পিছন দিকে আছে একটি পায়খানা ও 'টেরাকোটা' (terracotta) ড্রেন। তারপর দেখা যায় রান্নাঘর, চুল্লি ও যাঁতা পাওয়া গেছে সেখানে। দোতলার অস্তিত্ব নেই এখন, তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে, নীচের ঘরগুলির অনুরূপ উপরের তলায়ও ঘর ছিল চত্বরের চারদিকে। ঘরের দরজার মুখ চত্বরের দিকে, এবং সেই ঘরগুলির সামনে

* "Babylonian currency and measures obtained in the first millennium a wide circulation over Asia and the Mediterranean world; Indians and Greeks alike employed the Babylonian maneh (ভারতীয় মন ?) as the standard of weight."—*The Legacy of the Ancient World* by W. G. De Burge, p. 31

একটি অনতিপ্রশস্ত লম্বা বারান্দা চত্বরের ওপর ঝুলে আছে। বাসগৃহ দেখে বেশ মনে হয়, বাসিন্দারা স্বচ্ছন্দ আরামে বসবাস করতেন উন্নত সভ্য জীবন-সংস্থার কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে দৈহিক আরাম-বিরাম সুখ ভোগ করতেন তাঁরা, কিন্তু তাঁদের জীবন ছিল সম্ভোগসর্বস্ব এরূপ মনে করা ভুল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্ম-চর্চার অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে লেখন-চাকতিগুলিতে—যেমন, মন্দিরে যেসব স্তোত্র আবৃত্তি করা হত সেই স্তবমালা, অঙ্কের ছক (mathematical tables), বর্গমূল ও ঘনমূল (square root, cube root), অঙ্ক কষবার ফরমূলা এবং বড় বড় নগরগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সুমেরীয় যুগের জিগ্‌গুরাট (Ziggurat) বা সর্বসাধারণের তীর্থ-স্বরূপ বৃহৎ ধর্মমন্দিরগুলি ছাড়াও নাগরিকের গৃহে ছিল একটি পূজার ঘর, সেখানে বেদীর ওপর প্রতিষ্ঠিত দেবতার মৃন্ময় মূর্তির পূজা-অর্চনা করা হত। বিশ্বের দেবসমাজে যেমন নগর-দেবতার, তেমন আবার গৃহ-দেবতা বা কুল-দেবতারও একটি স্থান ছিল। গৃহ-দেবতার কৃপা ছাড়া মানুষ জীবনে কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে না। যে ভাগ্যবান ব্যক্তি কার্যে সিদ্ধিলাভ করেছে, লোকে বলত, সে 'দেবতাকে অর্জন করেছে' ('acquired a god')। গৃহস্বামী বা তার পরিবার মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে, বাথ্-টবের আকারের মৃন্ময় শবাধারে তার মৃতদেহ শায়িত করে বাসগৃহের মেঝের তলদেশে কফিনটিকে প্রোথিত করা হত। মৃত ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষের ভিটায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেই বসবাস করতে চায়, এই ছিল প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়দের বিশ্বাস।

সমাজে নারীর স্থান

সুমেরীয়দের কাল থেকেই বিবাহের কতগুলি বাঁধাবাঁধি আইনকানুন ছিল। পিতৃদত্ত যৌতুক পাত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি, যদিও সে তা স্বামীর সঙ্গে একত্র ভোগ করত। অনেক বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল স্ত্রীলোকের, সন্তানের ওপর স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ছিল সমান-সমান, এমন কি বিষয়রক্ষা-কার্য ও ব্যবসা পরিচালনার অধিকার থেকেও নারীজাতিকে বঞ্চিত করা হয় নি। কিন্তু স্ত্রীজাতিকে এরূপ মর্যাদা দান সত্ত্বেও, সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রকৃত প্রভু ছিল পুরুষমানুষ। বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে বিক্রয় করবার পক্ষে তার

কোন বাধা ছিল না, আর ঋণমুক্ত হবার জন্য তাকে ক্রীতদাসী রূপে হস্তান্তরিত করবার অধিকারও তার ছিল। পুরুষ ও স্ত্রীর জন্য দু'রকম আইনের ব্যবস্থা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল, পুরুষের বিত্তস্বত্ব ও উত্তরাধিকার অপেক্ষাকৃত ভারী হয়েই আইনের বাটখারায় স্থান লাভ করেছিল। যেমন, ব্যভিচার ছিল পুরুষের পক্ষে মার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু সেই একই দোষে স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হত। এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আদি-যুগ থেকে চলে আসছিল ব্যাবিলোনিয়ায়, হাম্মুরাবির কালেও স্ত্রীলোকের সেই অনুন্নত অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত নৈতিক জীবনে বেশ কিছু অবনতি ঘটেছিল। বিবাহ-প্রথা একটা জমকালো রকমের কেনাবেচার ব্যাপার হয়ে উঠেছিল পাত্র ও পাত্রীর পিতামাতার মধ্যে, তবে পাত্র কিনত পাত্রীকে, না পাত্রীই পাত্রকে ক্রয় করত তা বলা কঠিন, যেহেতু যৌতুকের আদানপ্রদান চলত উভয় পক্ষের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে কন্যাকেই বিক্রয় করা হত, এটা নিশ্চিত। হাম্মুরাবির কালের বহু শতাব্দ পরে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস এই প্রথার উল্লেখ করে বলেছেন: "পিতা সব বিবাহযোগ্যা কন্যাদের নিয়ে আসতেন একটি প্রকাশ্য স্থানে যেখানে অনেক মানুষ এসে জমত। কুমারীদের সারি সারি দাঁড় করিয়ে জনৈক ঘোষক (public crier) তারস্বরে হাঁক দিয়ে তাদের বিক্রি করত একটির পর একটি।···বিক্রি করা হত এই শর্তে যে ক্রেতারা তাদের বিবাহ করবে।" এরূপ অদ্ভুত প্রথা সত্ত্বেও বিবাহ ছিল একপত্নীক (monogamous), এবং বিবাহিত জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও তার উপপতিকে জলে নিমজ্জিত করবার বিধান পূর্বাবধি প্রচলিত ছিল। আর এক ধাপ উঠে এই ব্যবস্থা করলেন হাম্মুরাবি যে, কোন নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে লোকসমাজে সন্দেহের উদ্রেক হলেই তাকে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, সে যে সাধ্বী তা-ই প্রমাণ করবার জন্য। এই অনুশাসনের অর্থ হয়তো বা লোকের নিন্দার অভ্যাসকে বন্ধ করা, অথবা অগ্নিপরীক্ষার মত এও একটা পরীক্ষা। আইনে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রযোজ্য কঠোর বিধানের অভাব ছিল না, স্বামীর খেয়ালমত বন্ধ্যাত্ব বা অন্য কারণে বিবাহবিচ্ছেদ করা হত, এমন কি গৃহকর্মে বা সন্তানপালনে শৈথিল্যের অপরাধে স্ত্রীকে নিমজ্জিত করবারও

ব্যবস্থা ছিল। কার্যত এই নিষ্ঠুর বিধানসমূহ কতদূর পালন করা সম্ভব হত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ বিবাহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকের আয়ত্তাধীন না হলেও স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রমাণ করতে পারলে বিবাহলব্ধ বিত্তসম্পদ সহ স্বেচ্ছায় স্বামীগৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে আশ্রয় নেবার আইনসংগত অধিকার স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল। স্মরণ রাখা দরকার যে, উনবিংশ শতাব্দের পূর্বে ইংলণ্ডেও এরকম উদারতা প্রদর্শন করা হয় নি স্ত্রীজাতির প্রতি, এতখানি নারী-স্বাধীনতার আবির্ভাব তখনো হয় নি ইউরোপীয় সমাজে। হাম্মুরাবির যুগে বিবাহ হত কাবিন-নামা সম্পাদন করে, চুক্তিপত্র ছাড়া কোন বিবাহই আইনমত সিদ্ধ হত না। ফলকথা, ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা ছিল পুরোপুরি একটি বাণিজ্যিক সভ্যতা, সেখানে চুক্তিরই প্রাধান্য ও তাই গৃহধর্ম অনুষ্ঠানের জন্য বিবাহ-বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে চুক্তিপত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

একটি অদ্ভুত প্রথা

মন্দিরে দেবতার পূজারিনী হবার অধিকার স্ত্রীলোকের ছিল। অভিজাত বংশীয়া নারী, এমন কি রাজকুমারীও দেবতার সেবাদাসী (votaries) হয়েছেন। রাজা সারগন তাঁর কন্যাকে পাঠিয়েছিলেন উরের চন্দ্র-দেবতা নান্নারের মন্দিরে পূজারিনী রূপে, তার অভিজ্ঞান পাওয়া গেছে। সুমেরীয় আমলের এই প্রথা হাম্মুরাবির শাসনকালে তো প্রচলিত ছিলই, দীর্ঘ দেড় সহস্র বছর পরেও দেখা গেছে, শেষ ব্যাবিলোনীয় রাজা নবোনিডাস তাঁর কন্যাকে পাঠিয়েছেন উরের মন্দিরে। কিন্তু প্রথা যেমনই হোক মন্দিরগুলি ক্রমেই ব্যভিচারের পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। দেবদাসীর গণিকাবৃত্তি হয়তো পূর্ব থেকেই চলে আসছিল, পরিশেষে ব্যাবিলনে নারীচরিত্রের নৈতিক অধঃপতন এমন কদর্য স্থানে গিয়ে পৌঁছেছিল যা দেখে বিশ্বজয়ী আলেকজাণ্ডার—যিনি নিজে ছিলেন ঘোর মদ্যপায়ী—তিনিও বিস্ময়াবিষ্ট না হয়ে পারেন নি। এই প্রসঙ্গে হিরোডোটাস একটি অতি-কুৎসিত প্রথার বিবরণ দিয়েছেন। ধর্মমন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় প্রথাটিকে আরও বীভৎস মনে হয়। বিবরণটি এই : "প্রত্যেক কুমারীকে প্রেমের দেবতা ভিনাসের (অর্থাৎ ইস্তারের) মন্দিরে জীবনে একবার কোন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সহবাস করতে বাধ্য

করা হত।…অনেক কুমারী বসে থাকত মাথায় রজ্জুর মুকুট পরে ('wearing a crown of cord round their heads'), সেখানে লোকজন ক্রমাগত যাওয়া-আসা করত। কুমারী একবার সেখানে উপবেশন করলে উঠে আসা চলত না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আগন্তুক এসে তাকে সম্ভাষণ না করত। আগন্তুক তার ক্রোড়ে একটি রৌপ্যখণ্ড ছুঁড়ে দিয়ে বলত, মিলিট্টা (Mylitta)-দেবী তোমাকে দয়া করুন। রৌপ্যখণ্ড ক্ষুদ্র হলেও তা গ্রহণ করতে হত, সেটি পবিত্র বস্তু। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম রৌপ্যখণ্ড দিয়ে অমনি সম্ভাষণ করবে, তার সঙ্গেই উঠে গিয়ে তার অঙ্কশায়িনী হতে হবে কুমারীকে, অসম্মতি চলবে না। সহবাসের পরই কুমারী দেবতার কাছে সর্বপ্রকার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হত, বাড়ি ফিরে আসত সে, তখন আর তার সঙ্গ অর্থ দিয়ে লাভ করা যেত না। যাদের রূপসৌন্দর্য বা অঙ্গসৌষ্ঠব আছে তারা শীঘ্রই মুক্তিলাভ করতে পারত, মন্দিরে তাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না। কিন্তু যারা কুশ্রী বা বিকলাঙ্গ তাদের দীর্ঘকাল মন্দিরে বসে থাকতে হত আগন্তুকের প্রতীক্ষায়, এমনি করে কখনও তিন-চার বছর অতিবাহিত হত।"

প্রশ্ন উঠতে পারে এখানে, এমন অদ্ভুত প্রথার উদ্ভব হল কেমন করে? কোন কোন নৃতাত্ত্বিক বলেন, যদিও অনেকে তা অস্বীকার করেছেন, আদিম যুগের সমাজে নাকি যৌন কম্যুনিজম প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ পুরুষ মাত্রেরই যে-কোন নারীর সঙ্গলাভ ছিল একটি সামাজিক অধিকার। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে অপরিচিত আগন্তুকের কাছে আত্মসমর্পণ করে কুমারী সেই আদিম কালের সামাজিক দাবিকেই স্বীকার করেছে, অর্থাৎ এ প্রথা সেই আদিম প্রথারই পূর্বস্মৃতি। আবার এমনও হতে পারে যে, রক্তপাত একটি তাবু (taboo), স্বামীকে অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। অথবা কোনও অস্ট্রেলিয়ান আদিম জাতির মত, বিবাহের পূর্বে শারীরিক অভিজ্ঞতা অর্জন করবার সুযোগ দেওয়া হত কুমারীকে। সে যা-ই হোক, হিরোডোটাস বর্ণিত এই প্রথাটি হাম্মুরাবির যুগেও চলিত ছিল, এমন কথা বলা যায় না। হাম্মুরাবির কোডে এই প্রথার কোন উল্লেখ নেই, কোন সমর্থনও পাওয়া যায় না। হিরোডোটাস ব্যাবিলনে এসেছিলেন হাম্মুরাবির রাজত্বের দেড় হাজার বছর পরে। তখন ব্যাবিলোনিয়ার

পতন হয়েছে। দেশের অবস্থা, মানুষের চরিত্র যে অনেকখানি হীন হয়ে পড়েছিল তখন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আদালত ও বিচারকার্য

বিচারকার্যের জন্য আইন-আদালত ছিল। বিচারক নিযুক্ত করতেন রাজা। বিচারক যাতে খুশিমত বে-আইনী সিদ্ধান্ত না করতে পারেন সেজন্য নগরের মুখ্য ব্যক্তিরা বিচারকের সঙ্গে বসে আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ শুনানি বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। একবার রায় দেওয়া হলে আর তা বদলানো চলত না, কোন বিচারক ওরকম কুকার্য করলে তাকে বরখাস্ত করা হত। বিচারক ও কর্মচারীরা ধনীদের কাছে থেকে উৎকোচ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না, কিন্তু হাম্মুরাবির শ্যেনদৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারে নি এই কদাচার। তিনি যে দুর্নীতি দমন করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে পত্রগুলিতে। একখানি পত্রে দেখা যায়, ঘুষের অভিযোগ শ্রবণ করে রাজা শাসনকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন তদন্ত করে দোষীকে শাস্তি দিতে।

বিভিন্ন অপরাধের দরুন শাস্তির বিধানগুলি বিবেচনা করলে বোঝা যায়, সমাজে কোন কাজের ওপর কিরূপ গুরুত্ব বা মূল্য আরোপ করা হয়েছে। পুরোহিতদের মর্যাদা যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সুমেরীয় সমাজে মাতৃস্বত্বের (mother-right) কয়েকটি চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল, সেগুলি প্রাগৈতিহাসিক কালেরই উত্তরাধিকার। সেমেটিক প্রথামত প্রতিষ্ঠিত পিতৃস্বত্ব (patriarchal) পরিবারে পিতার ওপর অসীম কর্তৃত্ব অর্পণ করে হাম্মুরাবির আইন সুমেরীয় মাতৃস্বত্বের শীর্ণ অবশেষগুলির সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করেছিল।

সেমেটিক রাজত্বে উত্তর ও পশ্চিম দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কারবার চলত—আমদানি হত কাঁচা মাল ও ধাতুর, আর রপ্তানির জিনিস ছিল বোনা কাপড়, মৃন্ময় পাত্র প্রভৃতি। এমন ধারা ব্যবসায়ী সমাজে সাহিত্যানুরাগ অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্যের কড়া-ক্রান্তির হিসাবের দিকে বেশি জোর দেওয়াই তো স্বাভাবিক। সাহিত্যের বিকাশ যা কিছু দেখা যায়, সবই ধর্ম সম্বন্ধীয় স্তবস্তোত্র অনুষ্ঠানের বর্ণনায় আর রাজাদের রাশি

রাশি প্রশস্তি-বিবরণের মধ্যে। ব্যাবিলনের নিজস্ব কোন লিখন-পদ্ধতি ছিল না। সুমেরীয় 'কিউনিফরম' হরফে মন্দিরগুলির পরিচয় ও নগরের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সেমেটিক জাতির ভাষা স্বতন্ত্র, সুমেরীয় ভাষার সঙ্গে ছিল তার মূলগত প্রভেদ। ক্রমে সেমেটিক ভাষাই সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ায় প্রচলিত হয়েছিল এবং সেই ভাষায় অভিধান রচনাও করা হয়েছিল। হাম্মুরাবির যুগের সবচেয়ে বড় কীর্তি, একই ভাষার ঐক্যসূত্রে সমগ্র জাতিকে গ্রথিত করা। এইরূপে সারা দেশকে এক-ভাষাভাষী করে তোলার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, বারবার বিদেশী আক্রমণ সত্ত্বেও ব্যাবিলোনিয়ার মূল সংস্কৃতির কাঠামোটি ভেঙে পড়ে নি। বিদেশীরা এখানে নূতন জীবনের সঞ্চার করেছিল, নবীন উৎসাহ কর্মনিষ্ঠা উদ্বুদ্ধ করে সংস্কৃতির ধারাকে নূতন পথে পরিচালিত করেছিল বটে, কিন্তু তাতে করে সংস্কৃতির শক্তি বর্ধিতই হয়েছিল, হ্রাস পায় নি।

প্রবল পরাক্রান্ত বিচক্ষণ নরপতি হাম্মুরাবির শাসনকালে দেশের সমৃদ্ধি চরম শিখরে পৌঁছেছিল। কিন্তু ইতিহাসের নিয়মই এই যে, যে সমৃদ্ধির ফলে সভ্যতা ও কৃষ্টি বর্ধিষ্ণু হয়ে ওঠে, তা-ই আবার অবস্থাবিশেষে জাতিকে করে ক্ষয়িষ্ণু। ঐশ্বর্য জাতিকে বিলাসী করে তোলে এবং তখনই হয় আর্টের সৃষ্টি। মানুষ যেমন হয় শান্তিপ্রিয়, তার প্রকৃতিও তখন কোমল হয়ে পড়ে, এবং তার সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শক্তিশালী বুভুক্ষু জাতিরা তার ওপর আক্রমণ চালায়। হাম্মুরাবির মৃত্যুর পর ব্যাবিলনের ওপর কিরূপে বিদেশী ক্যাসাইটদের হামলা শুরু হয়েছিল, নানান ভাগ্যবিপর্যয়ের পর পরিশেষে কিরূপে সেখানে ক্যাসাইট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আমরা এখন সেই কাহিনী বর্ণনা করব।

॥ তিন ॥

হাম্মুরাবির বংশধরগণ : ক্যাসাইটদের রাজত্ব

ব্যাবিলনে সেমেটিক আমরুরুগণের রাজ্য হাম্মুরাবির যুগে গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, সেই সুউচ্চ মহিমা-মঞ্চ থেকে তার পতন হয়েছিল উল্কারই মতন। খৃঃ পূঃ ২০৮১ অব্দে হাম্মুরাবির মৃত্যু ঘটে। তখন ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন তাঁর পুত্র সামসু-ইলুনা। কৃতী পিতার সন্তান, পিতার গৌরবমণ্ডিত শাসনব্যবস্থা ও বিধানসমূহ রক্ষা করেই চলেছিলেন তিনি, পিতার মতই জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। দুইটি পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ এবং ব্যাবিলন ও সিপ্পার নগরদ্বয়ের সৌন্দর্যবিধান করা হয়েছিল তাঁর রাজত্বকালে। এমনি শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধির মধ্যে রাজত্বের প্রথম আট বৎসর কেটে গেল, কিন্তু নবম বর্ষে দেখা দিল একটি নূতন আপদ। এই সময়ে পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্তদেশে পশ্চিম ইলাম থেকে ক্যাসাইট (Kassite) নামক একটি নূতন জাতির আক্রমণ ঘটে। সামসু-ইলুনার একটি বিবরণে প্রকাশ, ক্যাসাইট বাহিনীকে পরাভূত করেছিলেন তিনি। কিন্তু জয়লাভ সম্ভবত সহজসাধ্য হয় নি। দেখা যায়, তাঁর সংগ্রামরত বিব্রত অবস্থার সুযোগ নিয়ে লারসার প্রাক্তন অধিপতি পিতৃশত্রু রিম-সিন নূতন সমরোদ্যমে উদ্দীপিত হয়েছিলেন। রিম-সিন তখন অতি-বৃদ্ধ। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অবসর-জীবনের সায়াহ্নকালেও তিনি ইলামাইটদের সহযোগে দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়া আক্রমণ করেছিলেন। প্রথম দিকে যুদ্ধে অনেকটা সাফল্য লাভ করেছিলেন বটে, এরেক নিসিন এমন কি লারসাও অধিকার করেছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁকে ব্যাবিলোনীয় বাহিনীর কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল। এইরূপ অনুমান করা হয় যে লারসা নগরে বন্দী রিম-সিনকে অগ্নিদগ্ধ করে বধ করা হয়েছিল।

সামসু-ইলুনা ও 'সাগর-ভূমি'

বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে অন্তর্বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হলেন সামসু-ইলুনা। নূতন শত্রুর আবির্ভাব হয়েছিল রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে, সমুদ্রের উপকূলে। ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদীর অববাহিকায় পলিমাটি জমে বিস্তীর্ণ চরভূমি সৃষ্টি হয়েছিল, ব্যাবিলোনীয়রা সেই দেশকে বলত 'সাগর-ভূমি'

(Sea Country)। এখানকার স্থানীয় শাসকেরা পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, আর বিদেশীর সঙ্গে ক্রমান্বয় যুদ্ধে সামসু-ইলুনা যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, সেই সময়েই ইলুমা-ইলুম নামক জনৈক উপকূলবাসী বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে সাগর-ভূমির স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, অসংখ্য নিহত সৈন্যের মৃতদেহ সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল। পরিণামে জয়-পরাজয় হয়তো বা অমীমাংসিতই ছিল, কিংবা সম্ভবত ব্যাবিলনেরই পরাজয় ঘটেছিল। সে যা-ই হোক, ব্যাবিলনের শক্তি তখনো নিঃশেষিত হয় নি, যেহেতু অন্যান্য স্থানে ব্যাবিলনকে আমরা দৃঢ় হস্তে বিদ্রোহ দমন করতে দেখতে পাই।

পারস্যসাগরের উপকূলে এই বিস্তীর্ণ জলাভূমির ওপর পুনরায় প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে নি ব্যাবিলন। প্রকৃতপক্ষে এখানে ব্যাবিলনের কর্তৃত্ব
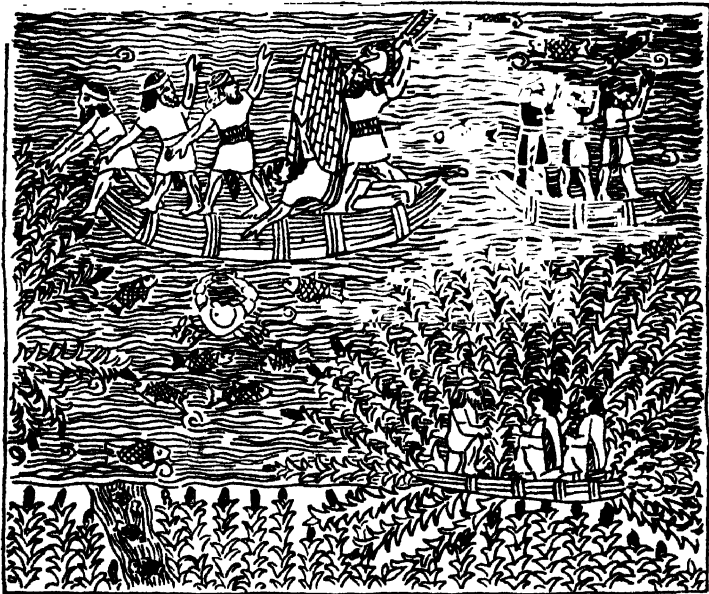
'সাগরিকা' বা দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়ার জলাভূমি—আসিরীয়দের আক্রমণের দৃশ্য—নিনেভের একটি শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ

বরাবরই ছিল নামমাত্র। দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীন সুমেরীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রতীক ছিল এই সাগর-ভূমি। ইতিহাসে সাগর-ভূমি

'বিট ইয়াকিন' নামে প্রসিদ্ধ, আসিরিয়া-রাজ টিগলাথ পিলেসারের কালেই সর্বপ্রথম এই প্রদেশটি পরাধীনতার কলঙ্ককালিমা ললাটে ধারণ করেছিল। এ অঞ্চলে হালকা নৌকায় চলাফেরা, এবং নলখাগড়ার অন্তরালে গা ঢাকা দেবার প্রচুর স্থযোগ ছিল অধিবাসীদের। এরূপ নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করে আত্মরক্ষা সম্ভব ছিল বলেই এই স্থপ্রাচীন জাতি এখানে আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল এবং তার স্বাধীনতাও বিনষ্ট হয় নি, যে পর্যন্ত না আসিরিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টার ফলে এখানকার বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল। দেখা যায়, ব্যাবিলন-রাজ সামস্থ-ইলুনার ভাগ্যবিপর্যয় সাগর-ভূমির ওপর প্রভাব নাশের সঙ্গেই ক্ষান্ত হয় নি। জলাভূমির রাজারা এখন ব্যাবিলনের নিজস্ব ভূমিগুলি পর্যন্ত দখল করতে শুরু করেছিল। ব্যাবিলন রাজ্য যে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল তার একটি প্রমাণ এই যে, প্রতিরক্ষার জন্য সামস্থ-ইলুনা যে দুর্গশ্রেণী নির্মাণ করেছিলেন সেই দুর্গগুলি অবস্থিত হাম্মুরাবির কালের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তদেশে নয়, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সীমান্তরেখার ওপর

সামস্থ-ইলুনার বংশধর আবি-এস্থ (খৃঃ পূঃ ২০৪২-২০১৫) ব্যাবিলন রাজ্যের হৃত ভূমি যে পুনরধিকার করতে চেষ্টা করেন নি, তা নয়, কিন্তু উদ্যম সত্ত্বেও বিফলকাম হয়েছিলেন তিনি। তারপর থেকে তিনি ও তাঁর বংশধরেরা —আম্মি-দিতানা (খৃঃ পূঃ ২০১৪-১৯৭৮), আমমি-জাদুগা (খৃঃ পূঃ ১৯৭৭-১৯৫৭) ও সামস্থ-দিতানা (খৃঃ পূঃ ১৯৫৬-১৯২৬)—যুদ্ধোদ্যমের চেয়ে ধর্মচর্চায় অধিকতর মনোযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু এই ধর্মচর্চার মধ্যেও চিন্তাধারার অধোগতি স্থপরিস্ফুট। দেবতার মঞ্চে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে স্ব স্ব মূর্তি নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন নৃপতিরা। অবশ্য দেবতার পূজা আরাধনা অর্ঘ্য নিবেদন খুবই সমারোহ সহকারে করা হত। সূর্য-দেবতা মারদুকের ছিল বহুবিধ স্বর্ণনির্মিত প্রহরণ, এবং সিপ্পার নগরের প্রস্তরনির্মিত সৌরচক্রটি স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত ও বহুমূল্য রত্নখচিত ছিল। এই সময়কার শিল্প রচনায় দেখা যায়, ব্রঞ্জের ওপর নদী ও পাহাড়ের চিত্র উৎকীর্ণ, আর মন্দিরে সেই ব্রঞ্জ ফলকটি রক্ষিত হয়েছে। সেমেটিক আমরুরু-বংশীয় শেষ রাজা সামস্থ-দিতানা দেবতার উদ্দেশে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে একটি গন্ধপাত্র উৎসর্গ

করেছিলেন। এইরূপ নানান বিবরণ থেকে জানা যায়, হাম্মুরাবির যুগে বাণিজ্যপ্রসারের ফলে যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, পরবর্তী কালেও তার অপহ্নব ঘটে নি। এক দিকে সিরিয়া অন্য দিকে ইলাম, উভয় দেশ থেকে মণিরত্ন, ধাতু ও কাষ্ঠ আহরণ করা হত, আর বিদেশীর সংস্পর্শে এসে ব্যাবিলোনীয় কারিগরেরাও শিল্প বিষয়ে প্রচুর শিক্ষা লাভ করেছিল। বস্তুত ব্যাবিলনের রাজ্য যদিও সংকীর্ণ হয়ে এসেছিল, তার সমৃদ্ধি ছিল কিন্তু অনেকটা হাম্মুরাবির যুগের মতই। রাজ্যশাসন, কৃষি-বাণিজ্য, জাতীয় জীবনের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ পূর্বের মতই চলেছিল। রাজারা পূর্তের জন্য পরিখা খনন করতেন, আর প্রতিরক্ষার জন্য নদীতীরে দুর্গ নির্মাণ করতেন।

উত্তরকালের সেমেটিক নৃপতিগণের মধ্যে একমাত্র আম্মি-দিতানা হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার বিষয়ে কথঞ্চিৎ যত্নবান হয়েছিলেন। সাগর-ভূমি কর্তৃক অধিকৃত ব্যাবিলন রাজ্যের কয়েকটি স্থান তিনি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এবং সেজন্য নিজেকে 'সুমের ও আক্কাড'-এর রাজা বলে জাহিরও করেছিলেন। কিন্তু তাঁব এই রাজ্যবিস্তার স্থায়ী হয় নি— বংশধরদেব, বিশেষত সামসু-দিতানার সময়ে (খৃঃ পূঃ ১৯৫৬-২৬) রাজ্যের অধিকাংশই সাগর-ভূমির রাজাদের করতলগত হয়েছিল। ব্যাবিলনের ওপর চরম আঘাত হেনে ভূপাতিত করেছিল তাকে সাগর-ভূমির নৃপতিরা নয়, কারণ আমরা দেখতে পাই, সামসু-দিতানার রাজ্যকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল উত্তরাঞ্চল থেকে আনাটোলিয়াব হিটাইটগণের আক্রমণ। পশ্চিম এশিয়ায় এই আর্মানয়েড জাতির নব অভ্যুত্থানের সূত্রপাত দেখা যায় এখন থেকেই। হিটাইটদের রাজধানী খাটুটি নগব ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্যাবিলনের 'পশ্চিম সেমাইট' রাজবংশ নির্মূল হয়েছিল হিটাইটদের হাতেই।* সম্ভবত এই আততায়ীগণের সঙ্গে যুদ্ধে সামসু-দিতানা নিহত হন। হিটাইটরা ব্যাবিলন অধিকার করেছিল বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য নয়। ব্যাবিলনের প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে তারা সেখানকার দেবদেবী সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে

* আমরুরু বা আমোরাইটরা সেমেটিক জাতীয় মানুষ, এবং তারা পশ্চিমাঞ্চল থেকে ব্যাবিলোনিয়ায় এসেছিল। সেজন্য বহু পূর্বে আগত আক্কাডীয় সেমেটিকদের থেকে পৃথক করে আমরুরুদের ইতিহাসে 'পশ্চিম সেমাইট' (Western Semites) নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রত্যাবর্তন করেছিল। যথাকালে হিটাইট সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের উপকূল, সিরিয়া, এমন কি প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র আখ্যায়িকা, যার বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

'পশ্চিম সেমাইট' বংশের পর সম্ভবত এরেক নগরের কোন স্থানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, কিন্তু এই সময়কার ইতিহাস রচনার মাল-মসলা অপ্রচুর। প্রমাণের অভাব থাকলেও অনুমান করতে বাধা নেই যে, ব্যাবিলন রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সুমেরীয় যুগের নগর-রাষ্ট্রসমূহের পুনরায় আবির্ভাব হয়েছিল। তবে এটা নিশ্চিত যে সাগর-ভূমির নৃপতিগণের শাসন সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে বংশানুক্রমে অব্যাহতই চলে আসছিল। দ্বাদশ খৃস্ট পূর্বাব্দের একটি সীমা-প্রস্তরে (boundary stone) রাজা গুলকিশার নামধেয় জনৈক সাগর-ভূমির নৃপতির উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রস্তরলিপি বহু পরবর্তী ক্যাসাইট আমলের, তা হলেও প্রাচীনকালের এই সাগর-ভূম্যধিপকে 'রাজা' রূপে বর্ণনা সে দেশের তৎকালীন স্বাধীন অস্তিত্বের কথাই সপ্রমাণ করে। হিটাইটদের আক্রমণে ও তারও আগেকার অন্তর্বিরোধের দরুন দেশের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে আক্রমণকারী ক্যাসাইটরা দেশজয়ের পর ব্যাবিলনকেই তাদের রাজধানী করেছিল, তাই থেকেই প্রমাণিত হয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমৃদ্ধ ব্যাবিলন এককালে যে গৌরবের অধিকারী হয়েছিল, সেই মহান মর্যাদাটি তার তখনো নষ্ট হয় নি।

ক্যাসাইট কারা?

সাম্‌সু-ইলুনার রাজত্বকালে সেই যে প্রথম ক্যাসাইট আক্রমণ ঘটেছিল, তার পর থেকে সম্ভবত মাঝে মাঝে প্রায়ই আবির্ভাব হত ব্যাবিলনে এই বর্বর হানাদারদের। শান্তিপূর্ণভাবেও তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল কৃষিশ্রমিক রূপে। ক্যাসাইটরা আর্য জাতি, অনেক পণ্ডিত এইরূপ সিদ্ধান্তই করেছেন। জাগ্রোস পর্বতাঞ্চলে (বর্তমান লুরিস্তান প্রদেশে) তারা বসবাস করত। পঞ্চদশ খৃস্ট পূর্বাব্দে ইউফ্রেটিস নদীর উৎপত্তি-স্থানের উত্তর-পশ্চিম ভাগে মিটানি নামক দেশেও আর্য জাতির শাসন আরম্ভ হয়েছিল। ক্যাসাইটরা ছিল এই শাসক-জাতিরই জ্ঞাতি। ব্যাবিলন রাজ্যের যখন বিলুপ্তি ঘটল,

তখন সুযোগ বুঝে ব্যাবিলোনিয়ায় অনুপ্রবেশ করেছিল ক্যাসাইটরা, এবং কালক্রমে সমগ্র রাজ্যটিকে অধিকার করে বসেছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাদের সংখ্যা ছিল অল্প—মিটানিতেও আর্যরা শাসক সম্প্রদায়রূপে অবস্থান করছিল—সুতরাং কি ব্যাবিলোনিয়া, কি মিটানি, কোথাও তারা স্থানীয় অধিবাসীদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারে নি। এখানে এই জাতির আবির্ভাব হয়েছিল পারস্যের পশ্চিম অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশসমূহ থেকে।* দেখা যায়, হাম্মুরাবির কালেই আর্যরা পারস্যে প্রবেশ করেছিল। এই জাতির সংস্কৃতি তখনো উচ্চ পর্যায়ে পৌছায় নি, এবং যদিও তারা ব্যাবিলনের সংস্পর্শে এসে সেই সুপ্রাচীন সভ্যতাকেই গ্রহণ করেছিল, তথাপি বহুকাল ধরে তারা আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছিল, নিজেদের জাতীয় নামগুলি পর্যন্ত বর্জন করে নি। অনুন্নত জাতি ছিল ক্যাসাইটরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন ধারই ধারত না। ধনোৎপাদনের যে একটি মাত্র কর্ম তাদের জানা ছিল, তা কৃষিকর্ম। তারা ছিল কর্মদক্ষ ও সুশাসক, অশ্বপালন করত, ব্যাবিলোনিয়ায় অশ্বের ব্যবহার তারাই আরম্ভ করে। সংস্কৃতির ভাণ্ডারে নূতন অবদানের কোন কৃতিত্বই নেই এই জাতির, শুধু এইমাত্র বলা চলে যে, সুমেরীয় কাল-নির্ধারণ প্রণালীর পরিবর্তন করে বর্ষ-গণনা পদ্ধতিকে সরল করে দিয়েছিল তারা। সুমেরীয় আমলে বর্ষ-গণনা হত কোন বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে, যেমন বলা যায়, প্লাবনের বছর থেকে তিন কি পাঁচ বছর। ক্যাসাইটরা রাজার রাজত্বকাল ধরে ঘটনার সময় নিরূপণের পদ্ধতি প্রবর্তন করে।

প্রথম ক্যাসাইট-রাজ গন্দাস : 'রাজন্যবর্গের নাম-তালিকা'

খৃঃ পূঃ ১৭৬০ অব্দে ক্যাসাইট শাসন আরম্ভ হয় ব্যাবিলনে। ৫৭৬ বৎসর ধরে ৩৬ জন নৃপতি রাজত্ব করেছিলেন। প্রথম রাজার নাম গন্দাস। বেল-

* চব্বিশ খৃস্ট পূর্বাব্দের ইলামী শিলালিপিতে ক্যাসাইট জাতির নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। আসিরীয়রা এই জাতির নাম দিয়েছিল 'ক্যাসি' (Kassi)। 'ক্যাসি' বা 'ক্যাসাইট' শব্দের সঙ্গে ক্যাসপিয়ান সাগরের নামের সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। অনেকে মনে করেন 'ক্যাসপিয়ান' নামটি ক্যাসাইটদের স্মৃতি বহন করে। গ্রীক ঐতিহাসিক স্ট্রাবো (Strabo) ক্যাসাইট জাতির আদি নিবাস ক্যাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে বলে নির্দেশ করেছেন।

মারডুকের বিধ্বস্ত মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন তিনি। অনুমান হয়, ব্যাবিলন অধিকার করতে তাঁকে বিপুল সংগ্রাম করতে হয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ঠিক এই সময়েই হিক্সোস নামক একটি জাতি প্যালেস্টাইন থেকে এসে মিশর জয় করেছিল, এবং ক্যাসাইটদের মত তারাই সর্বপ্রথম অশ্ব ও অশ্বরথের আমদানি করে মিশর দেশে। এই হিক্সোসদের সেমেটিক 'রাখাল-জাতি' বলা হয়েছে।* সে যা-ই হোক, দেখা যায় যে সমসাময়িক কালে মিটানি, পারস্য, ব্যাবিলোনিয়া ও মিশরে বর্বর নব আগন্তুকদের আক্রমণ বা অনুপ্রবেশ একই সঙ্গে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত পারস্যের পূর্বাঞ্চল থেকে আর্য জাতির কয়েকটি তরঙ্গ ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপর্যুপরি ভেঙে পড়ে সুপ্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতাকে বিচূর্ণ করে দিয়েছিল ইতিপূর্বেই, এবং সেই নব আগন্তুকদের বংশধরেরা যথাকালে সেখানে বৈদিক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মিটানির আর্যজাতীয় শাসকদের বিষয়ে অনেক কথা আমরা জানতে পেরেছি। আমরা জানি, তাদের ভাষা ছিল সংস্কৃতের অনুরূপ, ইন্দ্র বরুণ মিত্র নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতারাই ছিলেন তাদের উপাস্য। তেমনি সবিতৃ-দেবতাকে 'সূর্য' নামে অভিহিত করে পূজা করত ক্যাসাইটরা। ভারতীয় 'মারুত' ও গ্রীক 'বোরিয়াস' (Boreas) ছিল তাদের অন্যান্য দেবতা।

সুদীর্ঘ রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য বিবরণ অল্পই রেখে গেছেন ক্যাসাইট নৃপতিবৃন্দ, কেবল 'রাজন্যবর্গের নাম-তালিকা' (Kings Lists) ছাড়া। মাঝে মাঝে দু-একটি ঘটনার লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় সত্য, যেমন তৃতীয়

* প্রখ্যাত ইতিহাসতত্ত্ববিদ্ আরনল্ড্ টয়েনবির সিদ্ধান্ত এই যে হিক্সোসরা মূলত আর্য জাতি, ভারতীয় আর্যদের জ্ঞাতি। ভারত প্রবেশকালে আর্যদের একাংশ পশ্চিম এশিয়ায় এসে পড়েছিল, অন্যান্য স্থানীয় জাতির মিশ্রণ ঘটে তাদের সঙ্গে, এবং সেই মিশ্র জাতিই হিক্সোস। টয়েনবি ক্যাসাইটদের হিক্সোস ও ভারতীয় আর্যদেরই সহযাত্রী মনে করেন। তিনি বলেছেন : "While some Aryans crossed the Hindukush into India, others made their way across Iran and Iraq to Syria and thence overran Egypt towards the beginning of the 17th B. C.......The Hyksos, as the Egyptians called these barbarians warlords, ruled an empire embracing Egypt and Syria and perhaps Mesopotamia as well." (Toynbee's *Study of History*, Vol. I, p. 105)

ক্যাসাইট রাজা কাসতিলিয়াস (খৃঃ পূঃ ১৭২২-১৭০১)-এর ভ্রাতা উলাম-বুরিয়াশ কর্তৃক সাগর দেশ বিজয়। কিন্তু এই ঘটনাগুলি একান্তই সাময়িক, সুতরাং গুরুত্বহীন। প্রকৃতপক্ষে ক্যাসাইটদের নানান বিষয় জানতে পেরেছি আমরা ব্যাবিলোনিয়ায় তেমন নয়, যেমন মিশর ও এশিয়া মাইনর অঞ্চল থেকে। ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতি পূর্বাপর অব্যাহতভাবেই চলে আসছিল। ব্যাবিলোনীয় বাণিজ্য প্রসারের কল্যাণে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাবিলোনীয় লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে ব্যাবিলোনীয় ভাষাও সার্বভৌম ভাষায় পরিণত হয়েছিল। এমন কি, সাম্রাজ্যযুগের মিশরও ব্যাবিলোনিয়ার আন্তর্জাতিক ভাষা ও লিখন-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। এই কারণে, ব্যাবিলোনিয়ায় ক্যাসাইট রাজাদের লিখিত বিবরণের অভাব সত্ত্বেও এশিয়া মাইনর ও মিশরের প্রত্নতত্ত্ব থেকে তাদের সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আমরা অবগত হয়েছি। মিশরে ইখনাটনের রাজধানীর ধ্বংসস্তূপ টেল-এল-আমরনা থেকে যে সুবিখ্যাত 'পত্রাবলী' (Amarna Letters) আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে পশ্চিম এশিয়াব অন্যান্য রাজন্যবর্গের চিঠিপত্রের সঙ্গে ব্যাবিলনের ক্যাসাইট নৃপতিদের লেখা কয়েকটি লিপিও পাওয়া গেছে। তা ছাড়া, ক্যাপাডোসিয়ায় হিটাইট সাম্রাজ্যের রাজধানী খাট্টি নগরের সমীপবর্তী বোগাজ কিউই (Boghuz Kui) নামক স্থান খনন করে যেসব মৃন্ময় চাকতি উদ্ধার করা হয়েছে, সেই লিখনগুলি থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নানান তথ্য আমরা জানতে পেরেছি, যেমন হিটাইটদের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া অধিকার নিয়ে মিটানির সঙ্গে তাদের বিরোধ। সমসাময়িক কালের মিশর, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর প্রচুর আলোকপাত করেছে যেমন আমরনা-পত্রাবলী, তেমনি বোগাজ কিউই-র আবিষ্কারসমূহ।

'আমরনা-পত্রাবলী' : বুরনা-বুরিয়াশ

'আমরনা-পত্রাবলী'তে দেখা যায়, মিটানি আসিরিয়া ও ব্যাবিলন, এই তিনটি রাজ্যের নৃপতিরা মিশরের ফারাওর সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়ে সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় করতে যত্নবান হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে এই নৃপতিবৃন্দের হস্তে মিশরীয় রাজকুমারীদের কখনো সম্প্রদান করা হয় নি।

সেজন্য অভিমানভরে ব্যাবিলন-রাজ কাদাসমান-এনলিল তৃতীয় আমেনহটেপকে অনুযোগ দিয়ে লিখেছিলেন, মিশর-রাজ যেমন তাঁকে কন্যাদান করলেন না, তিনিও তেমনি একটি প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন—অর্থাৎ মিশর থেকে আপন দুহিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। আবার আসিরিয়া-রাজ আসুর-উবালিটও ফারাও ইখনাটনকে লিখেছিলেন একটি ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র বিশ 'মানে' (maneh) ওজনের স্বর্ণ উপঢৌকন দাবি করে। তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যাবিলন-রাজ বুরনা-বুরিয়াশ ফারাওকে পত্র দিলেন— "আপনার ও আমার পিতার আমল থেকেই আমাদের দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। তাঁরা পরস্পরকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করতেন, উভয় উভয়কে ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু অধুনা আমার ভ্রাতা (অর্থাৎ মিশর-রাজ) আমাকে মাত্র দুই 'মানে' স্বর্ণ উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। যে পরিমাণ স্বর্ণ প্রেরণ করতেন আপনার পিতা, আপনারও উচিত সেই পরিমাণ, অন্তত তার অর্ধেক পরিমাণ স্বর্ণ দান করা। কেন আপনি মাত্র দুই 'মানে' স্বর্ণ পাঠিয়েছেন? মন্দিরে বহু কার্য করবার আছে এবং আমি তা সোৎসাহে সম্পন্ন করছি। আমার রাজ্য মধ্যে যা কিছু অভীপ্সিত আপনার, তাই আপনি গ্রহণ করতে পারেন।" এমন অনেক পত্রে রাজারা লজ্জাকর অর্থ-গৃধ্নুতার পরিচয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু পত্রগুলি যে ব্যাবিলন ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক অবস্থার দর্পণবিশেষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিশরের বিরুদ্ধে ক্যানানে যখন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, তখন ক্যানানের সাহায্যে অগ্রসর হতে ব্যাবিলনকে প্রতিনিবৃত্ত করেছিল মিশর। স্বভাবতই ব্যাবিলন প্রত্যাশা করেছিল, মিশর আসিরিয়াকে ব্যাবিলনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবার সুযোগ দেবে না। কিন্তু তার সে আশা ফলবতী হয় নি। তখন ক্ষুব্ধ বুরনা-বুরিয়াশ ইখনাটনের কাছে এই অভিযোগ করলেন যে, আসিরিয়ার রাজদূতের সংবর্ধনা করেছেন ফারাও এমনিভাবে যেন সে দেশটি একটি স্বাধীন রাজ্য, অথচ আসিরিয়া ব্যাবিলনের অধীনস্থ রাজ্য বলেই তিনি দাবি করেন। ব্যাবিলনের এই ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে ইখনাটন তাঁর বিরুদ্ধাচারী হয়েছেন, এই কথা স্পষ্টরূপে জানিয়ে পত্র লিখলেন বুরনা-বুরিয়াশ, "আমার পিতা কুরিগাজলু-র কাছে একদা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিল ক্যানানাইটরা, 'মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে উভয়ে আমরা মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান

করি আসুন।' আমার পিতা সরাসরি জবাব দিলেন, 'তোমাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করা চলবে না আমার। তোমরা যদি আমার ভ্রাতা মিশরাধিপতির
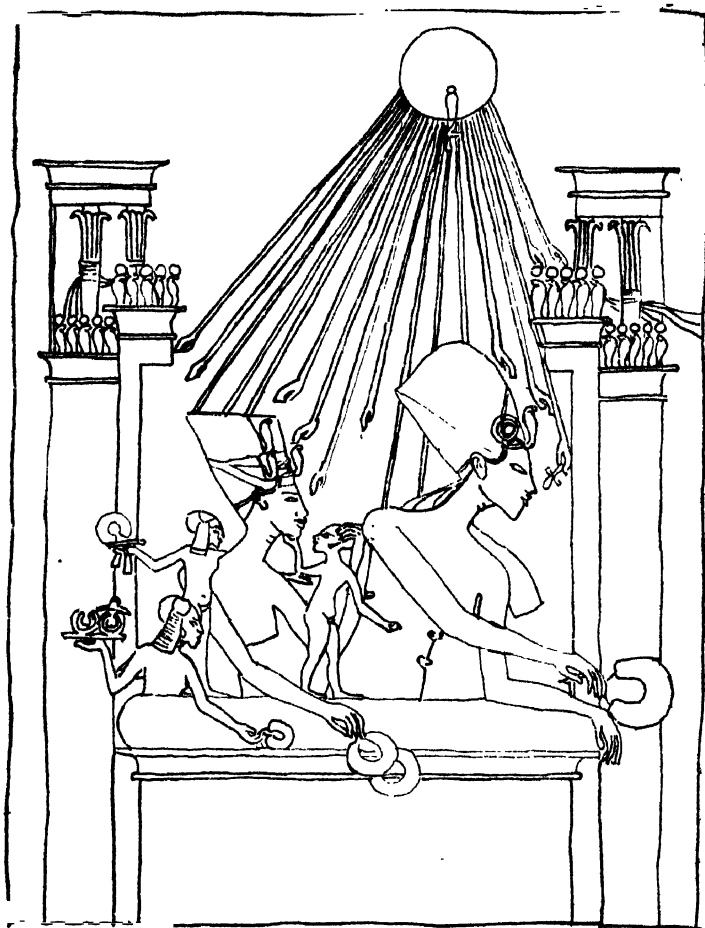
মিশরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ফারাও ইখনাটন, তাঁর মহিষী ও কন্যাগণ—রাজসভায় রাজ-দম্পতি অলংকার বিতরণ করছেন—ফারাওর একমাত্র উপাস্য দেবতা আর্টন (সূর্য) উর্ধ্বলোক থেকে সৌরকর প্রসারিত করে জীবনানন্দ দানে ভক্তকে আশীর্বাদ করছেন

বিরুদ্ধাচরণ কর, তা হলে তোমাদের রাজ্য কি আমি লুণ্ঠন করব না ভেবেছ? মিশর-রাজের সঙ্গে আমি যে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ।' এমনি করে আমার পিতা আপনাব পিতার ক্ষতিসাধনের কথায় কর্ণপাত করেন নি।" এই অভিযোগ

সত্ত্বেও কিন্তু বুরনা-বুরিয়াশ মিশররাধিপতির প্রীত্যর্থে বিস্তর প্রীতি উপহার পাঠিয়েছিলেন, যেমন তিন 'মানে' নীলা পাথর (lapis lazuli), পাঁচ জোড়া ঘোড়া, পাঁচটি কাঠের রথ। ক্যাসাইটদের কালে অশ্ব ও নীলা পাথরই ছিল ব্যাবিলোনিয়ার প্রধান রপ্তানির জিনিস, আর নিউবিয়া থেকে সংগৃহীত স্বর্ণ প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করত মিশর।

এই সময়ে রাজ্য সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগই করে নি ব্যাবিলন, কিন্তু আসিরিয়ার শক্তিবৃদ্ধি তাকে বিচলিত করে তুলেছিল, বিশেষত যখন প্রতিবেশী মিটানি রাজ্যের পতন ঘটল। প্রত্যন্তদেশ সুরক্ষিত করবার বন্দোবস্ত করতে হল ব্যাবিলনকে, বাণিজ্য-পথ নিরুপদ্রব করবার ব্যবস্থায় মনোযোগ দেবারও প্রয়োজন হয়েছিল। ক্যানানাইটগণ-কর্তৃক জনৈক ব্যাবিলোনীয় বণিকের ক্যারাভান লুণ্ঠনের সংবাদ পেয়ে বুরনা-বুরিয়াশ ক্ষতি-পূরণের দাবি করে পত্র লিখলেন ইখনাটনকে : "ক্যানান আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, ক্যানানের রাজা আপনার ভৃত্য।" এই সময়কার আমরনা-পত্রাবলী থেকে জানা যায় যে ইখনাটনের রাজত্বকালেই মিশরীয় সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়েছিল, সুতরাং সিরিয়া বা প্যালেস্টাইনে এমন সামর্থ্য ছিল না মিশরের যে আপন পক্ষপুট প্রসারিত করে বিদেশী বাণিজ্যকে রক্ষা করে।

হিটাইট সাম্রাজ্য

এই সময়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে হিটাইট সাম্রাজ্যের দিকে, তার বিপুল সমৃদ্ধির দিকে। এশিয়া মাইনর ছিল হিটাইট জাতির বাসভূমি।* বর্তমান

* সিরিয়ার ক্যানানাইটরা এবং প্যালেস্টাইনের হিব্রুগণ ছিল আরব-জাতীয় সেমেটিক, যেমন ছিল ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার অধিবাসীগণ কিন্তু সিরিয়ার উত্তরে ক্যাপাডোসিয়ার হিটাইটরা সেমেটিক-জাতীয় মানুষ ছিল না। হিটাইটদের অন্য নাম 'খেতা', অর্থাৎ খাট্‌টি নগরবাসী, বাইবেলের জেনেসিস্ গ্রন্থে (Gen. XXIII) তাদের 'হেথ-পুত্র' ('Sons of Heth') বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই জাতির উদ্ভব বিষয়ে কোন বৃত্তান্তই জানা নেই, তাদের লিখন 'পিকটোগ্রাফ' ধরনের, লিখনের পাঠোদ্ধার এখনো হয় নি। সম্ভবত তারা ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-ভাষী আর্য জাতি, ইউরোপের ড্যানিয়ুব নদীর নিম্নভাগ থেকে থ্রেস ও বসফোরাস হয়ে এ অঞ্চলে এসেছিল, এবং পরে সেমেটিকদের সঙ্গে রক্তের মিশ্রণের ফলে তাদের সংস্কৃতি সেমেটিকগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল।

আনকারা নগরের নিকটবর্তী বোগাজ কিউই নামক স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যের ফলে আমরা এই জাতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি, কিন্তু সাম্রাজ্যের উৎপত্তির কথা অজানাই থেকে গেছে। সম্ভবত হিটাইট জাতির কয়েকটি ছোট-ছোট রাজ্যের সমাহার (confederation) থেকে এই সাম্রাজ্যের উদ্ভব, টরাস পর্বতমালার উত্তরে সাত শ' মাইল লম্বা তিন শ' মাইল চওড়া সুবিস্তীর্ণ ভূমি, আর গিরিপ্রান্তের শ্যামল উপত্যকা জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য। মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিটাইট জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সামসু-দিতানার রাজত্বকালে (১৯৫৬-১৯২৬ খৃঃ পূঃ) হিটাইটগণ কর্তৃক ব্যাবিলন আক্রমণ প্রসঙ্গে। আততায়ীরা ব্যাবিলন দখল করে রাজাকে হত্যা করেছিল, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার ও ব্যাবিলোনীয় দেবদেবীদের সাথে নিয়ে দেশে ফিরেছিল, এসব বৃত্তান্ত পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সাম্রাজ্য পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল হিটাইট-রাজ সুবিলুলিউমার রাজত্বকালে (১৩৮৫-১৩৪৫ খৃঃ পূঃ)। তিনি ছিলেন একজন অদ্ভুত করিতকর্মা পুরুষ। বিনা যুদ্ধে কূটনৈতিক কৌশলে তিনি যে শুধু মিশর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের কিয়দংশ গ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা নয়, মিটানিকেও একটি অধীন রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত একটি সন্ধিপত্র দ্বারা। তাঁর বংশধরেরা কিন্তু পিতার তীক্ষ্ণ কূটনৈতিক দক্ষতার অধিকারী হন নি। মিশরের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল আর সেই সংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। তারপর হিটাইট-রাজ খাট্টুসিল ফারাও দ্বিতীয় রামেসিসের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিলেন। এই সুবিখ্যাত সন্ধির শর্তগুলি মিশরে কারনাকের প্রাচীর-গাত্রে লিখিত রয়েছে। আবার বোগাজ কিউইতেও পাওয়া গেছে কতগুলি ভগ্ন চাকতি যার ওপর কিউনিফরম হরফে ব্যাবিলোনীয় ভাষায় সন্ধিপত্রের কতক অংশ লিখিত। সন্ধিপত্রের শর্তগুলির কথা জানতে চেয়েছিলেন ব্যাবিলন-রাজ। জবাবে খাট্টুসিল মিশরের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা স্থাপনের উল্লেখ করে বলেছিলেন, "আমরা দুই ভাই শত্রুর বিরুদ্ধে একসঙ্গে সংগ্রাম করব, এবং একযোগে মিত্রতা রক্ষা করব বন্ধুর সঙ্গে।" এই পত্রে ব্যাবিলন-রাজকে এ কথাও বলেছিলেন তিনি যে, "মিশর-রাজ পূর্বে যখন খাট্টি আক্রমণ করেন আমি তখন আপনার পিতা কাদসমান-তুরগুকে সে কথা জানিয়ে-

ছিলাম।" এই পত্রখানি থেকে জানা যায় যে ব্যাবিলনের চতুর্বিংশতি ও পঞ্চবিংশতি ক্যাসাইট-রাজ কাদস্মান-তুরগু ও দ্বিতীয় কাদস্মান-এনলিল (খৃঃ পূঃ ১৩০৮-১২৯২ ও ১২৯১-১২৮৬) খাট্টি-রাজ খাট্টুসিলের সমসাময়িক ছিলেন। পত্রের বিবরণ থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারি যে, কাদস্মান-তুরগুর মৃত্যু ঘটে যখন কাদস্মান-এনলিল ছিলেন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক মাত্র, এবং সেই সময় খাট্টুসিল ব্যাবিলনে পত্র লিখে জানান যে কাদস্মান-এনলিল যদি রাজা বলে গৃহীত ও স্বীকৃত না হন, তা হলে ব্যাবিলনের সঙ্গে ইতিপূর্বে সম্পাদিত সন্ধিপত্র বাতিল করে দেবেন তিনি। ব্যাবিলনের রাজমন্ত্রী এই পত্রের সুর বিলক্ষণ অপমান-সূচক মনে করেছিলেন, সেজন্য দৃঢ়তার সহিত জানিয়েছিলেন খাট্টুসিলকে যে, ব্যাবিলন খাট্টি-রাজের তাঁবেদার (vassal) রাজ্য নয়। ফলে, উভয় রাজ্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তারপর যখন কাদস্মান-এনলিল সাবালক হয়ে সিংহাসনে অধিরোহণ করলেন তখন খাট্টুসিল পত্র লিখে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন যে ব্যাবিলনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার অভিপ্রায় তাঁর আদৌ ছিল না। এইরূপে উভয় রাজ্যের মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ পুনরায় স্থাপিত হয়েছিল। বস্তুত কাদস্মান-এনলিলের প্রতি হৃদ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ খাট্টুসিলের শীঘ্রই ঘটেছিল। দস্যুহস্তে কতিপয় ব্যাবিলোনীয় বণিক নিহত হয়েছে হিটাইট সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আমুরু ও উগারিট নগরে, এই অভিযোগ করে দস্যুদের তাঁর হস্তে সমর্পণ করবার জন্য খাট্টুসিলকে পত্র লিখলেন কাদস্মান-এনলিল। সেই পত্র পেয়ে খাট্টুসিল বণিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আইনের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। দেখা

খাট্টি-র প্রাসাদদ্বারে প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ প্রতিমূর্তি—সম্ভবত কোন হিটাইট রাজার

যায়, শুধু লিখন-পদ্ধতি নয়, ব্যাবিলোনিয়ার আইনকানুনও পশ্চিম এশিয়া গ্রহণ করেছিল।

উদীয়মান আসিরিয়া : ইলাম-রাজ শত্রুক-নাখ্-খুন্‌তে

উদীয়মান প্রতিবেশী আসিরিয়ার প্রতি হিটাইটদের সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে একখানি পত্রে। আসিরিয়ার নাম না করেও সুস্পষ্ট ভাষায় কাদস্‌মান-এনলিলকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন খাট্টুসিল যে, ব্যাবিলোনিয়া ও হিটাইট দেশ, উভয়েরই আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে আসিরিয়া। তিনি লিখলেন, "আসুন, উভয়ে মিলে একত্রে আমরা আততায়ীকে আক্রমণ করি।" এই প্রস্তাবটিকে কার্যে পরিণত করবার কোনরূপ উদ্যোগ করা হয়েছিল, এমন প্রমাণ নেই। অতীতকালে আসিরিয়ার সঙ্গে ব্যাবিলনের রাজ্যসীমানা নিয়ে বিরোধ বেধেছে, আবার সন্ধিও হয়েছে উভয়ের মধ্যে— যেমন, বুরনা-বুরিয়াশের সঙ্গে আসিরিয়া-রাজ পুজুর-আসুর-এর চুক্তি (খৃঃ পূঃ ১৩৮৫)। তিন শতাব্দী ধরে উভয় রাষ্ট্রের পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবকে বাধা দান করেছে একের ওপর অন্যের হানা, এবং এই দ্বন্দ্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাবিলনই অধিকতর। পরিশেষে ক্যাসাইট-রাজ দ্বিতীয় কাসতিলিয়াস-এর সময়ে (খৃঃ পূঃ ১২৬৩-১২৫৬) ব্যাবিলনের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল আসিরিয়া-রাজ টুকুল্‌তি-নিনিব-এর হস্তে। ইতিপূর্বেও আসিরিয়া ব্যাবিলনকে দুবার যুদ্ধে পরাজিত করে প্রত্যন্তের খানিকটা ভূমি দখল করেছিল সত্য, কিন্তু আসিরিয়ার এবারকার জয়লাভের বিশেষত্ব এই যে, ব্যাবিলন নগর দখলের পর সমগ্র ব্যাবিলোনিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন টুকুল্‌তি-নিনিব। শক্তির জাগৃতি সবে দেখা দিয়েছে, আসিরিয়া তখনো পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। তাই টুকুল্‌তি-নিনিব-এর রাজত্বকালে এবং তার অব্যবহিত পরে ব্যাবিলন যখন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, আসিরিয়া তখন সে বিদ্রোহ দমন করতে অসমর্থ হয়েছিল। বস্তুত, সুদীর্ঘ কালের দ্বন্দ্বযুদ্ধে, আসিরিয়ার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহই হয়েছিল ব্যাবিলনের সার্থক সংগ্রাম। ক্যাসাইট অভিজাতবর্গের সাহায্যে আদাদ-সুম-উসুর ব্যাবিলনের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছিলেন (খৃঃ পূঃ ১২৪৬)। তিনি আসিরিয়া-রাজ এনলিল-কুদুর-উসুর-কে যুদ্ধে নিহত করেন, এবং আসিরীয় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে

আস্থর নগর পর্যন্ত অগ্রসর হন। পরবর্তী দুইজন ক্যাসাইট নৃপতি আসিরিয়ার ওপর ব্যাবিলনের প্রাধান্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আসিরিয়া-রাজ প্রথম আস্থর-দান-এর রাজত্বকালে সে দেশ আবার গা-ঝাড়া দিয়ে জেঁকে বসেছিল। ক্যাসাইট-রাজ জামামা-স্থম-ইদ্‌দিন-কে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজ্যের হৃত অংশগুলির পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন আস্থর-দান। কিন্তু যে সাংঘাতিক আঘাত ব্যাবিলনকে ভূপাতিত আর ক্যাসাইট বংশের উচ্ছেদ সাধন করেছিল, সেই আঘাতটি হেনেছিল আসিরিয়া নয়, ইলাম। সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাসে দেখেছি আমরা ইলাম বারবার স্থমেরীয় নগরগুলিকে স্থযোগমত আক্রমণ করেছে, এখনও সেই ব্যাপারেরই পুনরাবৃত্তি হল। ইলাম-রাজ শক্রক-নাখ্‌-খুন্‌তে ব্যাবিলন আক্রমণ করে যুদ্ধে জামামা-স্থম-ইদ্‌দিন্‌কে নিহত করেন, এবং সিপ্‌পার নগর লুণ্ঠন করে বহু ধনরত্ন নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (খৃঃ পূঃ ১১৮৮)। এই দুর্বিপাকের পর ক্যাসাইট রাজ্য মাত্র তিন বৎসর টিঁকে ছিল। 'রাজার তালিকা'-য় ক্যাসাইট বংশের শেষ রাজার নাম যেখানে লিখিত আছে, চাকতির সেই জায়গাটি ভগ্ন, তা হলেও বুঝতে অস্থবিধা হয় না যে সর্বশেষ ক্যাসাইট নৃপতি ছিলেন বেল-নাদিন-আখি (খৃঃ পূঃ ১১৮৭-১১৮৫)। ইরানের পর্বতাঞ্চলের পূর্ব অধিবাসী ক্যাসাইটদের স্থদীর্ঘ শাসনের অবসানে ব্যাবিলন সেই ইরানেরই সমতটে অবস্থিত ইলামের পদানত হয়েছিল।

এমনি করেই যশ-কীর্তি বিবর্জিত ক্যাসাইট রাজাদের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বের অবসান ঘটেছিল। ইলামী হানাদার শক্রক-নাখ্‌-খুন্‌তের কাছে এক হিসাবে ঐতিহাসিকেরা কৃতজ্ঞ, যেহেতু ব্যাবিলন থেকে কতগুলি স্মৃতিস্তম্ভ, শিলালিপি ও সীমা-চিহ্নের পাথর তিনি ইলামের স্থসা নগরে চালান দিয়েছিলেন, এবং সেইজন্যই সেগুলি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। এইসব অমূল্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে নারাম-সিন-এর প্রস্তরস্তম্ভ (Stele of Naram-Sin), মনিসটুস্থর ওবেলিস্ক (Obelisk of Manishtusu), হাম্মুরাবির আইনের শিলালিপি এবং ক্যাসাইট রাজাদের কতিপয় সীমা-চিহ্নের পাথর (boundary-stones), যার নাম দিয়েছেন ক্যাসাইটরা 'কুদুরু' (kudurru)। সীমা-চিহ্নের এই পাথরগুলি ভূস্বামীর ভূমির সীমা নির্দেশ করত। শুধু তাই নয়, মালিকী স্বত্ব ও রাজগণের ভূদানের বিবরণ

রোখা হত প্রস্তরগুলির ওপর, আর অন্যায়ভাবে জমি আত্মসাৎকারীর প্রতি অভিশাপ লিপিবদ্ধ করে দেবতার চিহ্ন অঙ্কিত করা হত। হাম্মুরাবির যুগে দেবতার চিহ্নাঙ্কিত অভিশাপযুক্ত সীমা-প্রস্তর দেখা যায় না। অভিশাপোক্তির এই নব-প্রবর্তিত প্রথাটি দেখে স্বতই মনে হয় যে, প্রজার স্থাবর সম্পত্তি রক্ষা করবার সামর্থ্য রাষ্ট্রের আর নেই, তাই জমিগুলিকে এখন দেবতার রক্ষণাধীনে স্থাপন করতে হয়েছে, চৌহদ্দির ওপর দেবতার চিহ্নলাঞ্ছিত অভিশাপযুক্ত 'কুদুরুরু' প্রোথিত করে।

সীমা-চিহ্নের এইসব প্রস্তরখণ্ড থেকে আমরা ক্যাসাইট আমলের সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবগত হয়েছি। হাম্মুরাবির যুগে আমরা দেখেছি পূর্তকার্য প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠানে প্রজাদের বা দাসদের এক প্রকার বেগার শ্রমে নিযুক্ত করবার প্রথা (corvee) প্রচলিত ছিল। সেইরকম বেগার খাটুনি ক্যাসাইটদের আমলেও চলে আসছিল। বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া, জমির মালিককে রাষ্ট্রের বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে বেগার শ্রমের যোগান দিতে হত। রাজা ও শাসকবৃন্দের পশুপালের চারণ-ব্যবস্থা করতে হত ভূস্বামীকে, সেচের জল ব্যবহার ও শস্যোৎপাদনের জন্য নানাবিধ করও দিতে হত। তা ছাড়া, গাড়ি, লাঙল, গর্দভ ও ভৃত্যের ওপরও শুল্ক বসানো হত। এসব ক্ষেত্রে হাম্মুরাবির কালের ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন হয়েছিল সামান্যই, কিন্তু একটি বিষয়ের ওপর হাম্মুরাবির আইন-কানুন তেমন রশ্মিপাত করে না, যেমন ক্যাসাইটদের সীমা-প্রস্তরগুলি করে থাকে। এখানে আমরা দেখতে পাই, যে ভূমিগুলি রাজারা দান করেছেন তাঁদের অনুগৃহীত ব্যক্তি বা প্রিয় রাজকর্মচারীদের, সেগুলির পূর্বতন মালিক ছিলেন কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। 'বিতু' (Bitu) বা 'খণ্ডজাতি'রাই (tribes) জমির মালিক ছিল, আর অনেক ক্ষেত্রেই রাজা সেই খণ্ডজাতির নিকট থেকে ভূমি ক্রয় করে প্রিয়পাত্রকে দান করেছেন। প্রাচীন সুমের দেশের কিশ নগরাধিপ মনিসটুসু নির্মিত ওবেলিস্ক এই গোষ্ঠী-স্বত্ব প্রথার (primitive communism) অস্তিত্বকেই সমর্থন করে, এবং তাই থেকে এই সিদ্ধান্তে স্বচ্ছন্দে উপনীত হওয়া যায় যে, প্রাচীন সুমেরীয় যুগে ভূমির অধিকারী যেমন ছিল খণ্ডজাতীয় সমাজ, হাম্মুরাবির যুগে এবং পরবর্তী কালে ক্যাসাইটদের আমলেও সেই সুপ্রাচীন ভূ-স্বত্ব প্রথাই পূর্বাপর প্রচলিত ছিল, যদিও তখন

ব্যক্তির মালিকী স্বত্বের আবির্ভাব হয়েছিল, আর সেই ব্যক্তিস্বত্ব অবস্থান করত গোষ্ঠীস্বত্বেরই পাশাপাশি। অর্থাৎ, তখন দেখা দিয়েছিল গোষ্ঠী-বিত্তকে ব্যক্তি-বিত্তে রূপান্তরিত করবার একটা মাঝামাঝি অবস্থা। ব্যাবিলোনিয়ার সেই প্রাচীন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের পঞ্চায়েত-তন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। বিদেশীগণ কর্তৃক উপর্যুপরি দেশ অধিকার সত্ত্বেও ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত-তন্ত্র দীর্ঘকাল টিঁকে ছিল। ঠিক তেমনিভাবেই সুমেরীয় যুগের প্রাচীন গোষ্ঠী-স্বত্ব প্রথা হাম্মুরাবি ও ক্যাসাইটদের আমলেও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নি।

নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা

ক্যাসাইট রাজ্যের অবসানে ব্যাবিলোনিয়ার চিরাগত ধারামত নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই বংশের একজন প্রধান নৃপতি ছিলেন প্রথম নেবুকাড্‌নেজ্‌জার। খৃঃ পূঃ ১১৪০ অব্দ থেকে শুরু হয় তাঁর রাজত্বকাল। মনে রাখতে হবে, এই রাজা সেই বাইবেল-বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ নব-ব্যাবিলোনীয় নৃপতি নেবুকাড্‌নেজ্‌জার নন। এই শেষোক্ত নৃপতির রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৬০৪-৫৬১—অর্থাৎ প্রথম নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের ৫৩৬ বছর পর। প্রথম নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের প্রধান কীর্তি, ব্যাবিলনকে তিনি ইলাম কর্তৃক আক্রমণের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করেছিলেন। দুইটি স্মৃতি-ফলকে আমরা ইলামের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যপূর্ণ অভিযানের বিবরণ পাই। কেবল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেই ক্ষান্ত হন নি তিনি, পরন্তু শত্রুরাজ্যে সসৈন্য প্রবেশ করে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। একটি শিলালিপিতে ইলামের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অপরিসীম শৌর্য প্রদর্শনের জন্য রথীবৃন্দের অধিনায়ক রিত্‌তি-মারদুক-কে অভিনন্দিত করে নানান পুরস্কার দানের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের পরিষ্কার বর্ণনাও আছে : "নৃপতিরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হলেন। উভয়ের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। সেই ধূমায়মান বহ্নির উদ্গত ধূমে সূর্যের মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হয়ে উঠল। ঝঞ্ঝা বয়ে যায়, যুদ্ধের বিক্ষুব্ধ ঝটিকায় রথী তার পাশে উপবিষ্ট সহচরকেও দেখতে পায় না।······তিনি (রিত্‌তি-মারদুক) ইলাম-রাজকে বিধ্বস্ত করলেন। নৃপতি নেবুকাড্‌নেজ্‌জার যুদ্ধে জয়ী হলেন, ইলাম দেশ অধিকার ও লুণ্ঠন করলেন।"

বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না নেবুকাড্‌নেজ্‌জার—নূতন বংশের চতুর্থ নৃপতি ছিলেন তিনি—কিন্তু রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত তিনিই করেছিলেন। ইলাম অভিযানের পর উত্তর সীমান্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় যত্নবান হলেন তিনি। এই সময়ে আসিরিয়ার রাজা আস্থর-রেশ-ইশি ব্যাবিলোনিয়া আক্রমণ করেন। নেবুকাড্‌নেজ্‌জার আসিরীয় বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলেন বটে, কিন্তু পরাজিত সৈন্যের অনুসরণ করে তিনি যখন 'জাংকি-দুর্গ' (fortress of Zanki) অবরোধ করলেন, তখন আসিরিয়া-রাজের আক্রমণের চাপে তাঁকে অবরোধ তুলে নিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করতে হয়েছিল। সসৈন্যে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তিনি, কিন্তু এবারও ব্যাবিলোনীয় সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। বর্ণনায় আছে, ব্যাবিলোনীয় সেনাপতি করসত্তু-কে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল আসিরীয় বাহিনী দেখা যায় নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের বাহুশক্তি স্বীয় রাজ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হলেও রাজ্যপ্রসারকল্পে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনের উপযোগী হয়ে ওঠে নি।

তারপর রাজা মারদুক-নাদিন-আনখ-এর রাজত্বকালে ব্যাবিলনের দ্বিতীয়-বার বৃহৎ পরাজয় ঘটে আসিরিয়া-রাজ প্রথম টিগলাথ-পিলেসার-এর হস্তে (খৃঃ পূঃ ১১০০)। এই রাজাই সর্বপ্রথম আসিরিয়াকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্থায়ীভাবে ব্যাবিলন অধিকার করেন নি তিনি। কিন্তু এখন থেকে পশ্চিম এশিয়ার ঐতিহাসিক ভারকেন্দ্র সামরিক শক্তিবর্ধনে উদ্যোগী আসিরিয়ার দিকেই বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রভাবে আসিরীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তিন শতাব্দী পর, আর সেই আসিরীয় সাম্রাজ্যের বিস্তার-কাহিনীর সঙ্গেই ব্যাবিলোনিয়ার উত্তরকালের ইতিহাস জড়িত রয়েছে। আসিরীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন এবং ব্যাবিলনের পুনরভ্যুত্থান ও বিলুপ্তির কথা আমরা তৃতীয় খণ্ডে বিবৃত করব। কিন্তু তার পূর্বে সাংস্কৃতিক জগতের দিকে-দিকে যে বিচিত্র মহিমা-সমুজ্জ্বল গৌরবময় জ্যোতি বিকীর্ণ করে এসেছিল ব্যাবিলোনিয়া সেই অতীতকালের সুমেরীয় যুগ থেকে, তার কথঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া একান্তই আবশ্যক।

॥ চার ॥

ধর্ম : নীতি : পুরাণ

সুমের দেশে প্রথম সেমেটিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আক্কাডের রাজা সারগনের সময়। সারগন সেমেটিক জাতীয় হলেও বিদেশী ছিলেন না। আক্কাডীয় সেমেটিকগণের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবেই সুমেরীয় সংস্কৃতি। তাই, কি সমাজব্যবস্থা, কি ধর্মাচরণ, কোন বিষয়েই বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটে নি। কিন্তু দ্বিতীয় সেমেটিক অভ্যুত্থান হয়েছিল পশ্চিম দেশ থেকে বিদেশী আক্রমণের ফলে। এইসব বিদেশীর আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি বিভিন্ন ধরনের, তাদের সংস্কৃতিও ভিন্ন প্রকারের। স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই নূতন কৃষ্টির বিরোধ সত্ত্বেও সেমেটিক প্রভুত্ব প্রাচীন সুমেরীয় সংস্কৃতির পারম্পর্যকে ভঙ্গ করতে পারে নি দুই পক্ষের ভাব ও চিন্তার পরস্পর বিনিময় ঘটল যেমন, এবং একের অভ্যাস-প্রকৃতি যেমন অন্যের ধাতস্থ হতে লাগল, সুমেরের স্থবির মৃতকল্প সংস্কৃতিও তখন সেমেটিক শক্তির দৃপ্ত তেজে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, পুরনো আকার পরিবর্তন করে নূতন রূপ গ্রহণ করল, এবং সেই নব-সৃষ্ট রূপই বিজেতা ও বিজিতের সংস্কৃতিগত প্রভেদ ঘুচিয়ে ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতিকে সার্বজনীন করে তুলেছিল।

বিশ্ব দেব-মঞ্চে মারদুকের ও ইস্‌তারের আবির্ভাব

ধর্মের ক্ষেত্রে সেমেটিক আধিপত্যের প্রথম লক্ষণ, বিশ্ব-রাষ্ট্র পরিষদে দেবগণের স্থান নূতন করে নির্ধারণ। আমরা দেখেছি, সুমেরীয় পুরাণে আনু ও এনলিলই ছিলেন সর্বপ্রধান দেবতাদ্বয়। এখন ব্যাবিলনের প্রাধান্যের সঙ্গে ব্যাবিলনের নগর-দেবতা মারদুক-কে মঞ্চের সর্বোচ্চ স্থান দান করতে হল। মারদুকের অন্য নাম 'বেল' বা 'বেল-মারদুক'। এই অখ্যাতনামা দেবতাটির ওপর রুদ্র এনলিলের প্রচণ্ড শক্তি আরোপিত হয়েছিল। মারদুকের পিতা পৃথ্বীদেব ঈয়া বা এনকি। আনু, বেল ও ঈয়া—এই মহাদেবত্রয় ('the great Triad')-এর কল্পনা করা হয়েছিল অনেকটা মিশরীয় ত্রিশক্তি (trinity)-র ধাঁচে, অসিরিস-আইসিস-হোরাসের মতই। সৃষ্টি স্থিতি লয়—সৃজন পালন সংহার—প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের কল্পনা করা হয়েছে ভারতীয় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা

বিষ্ণু শিবের মধ্যে। সেই তিনটি গুণেরই প্রতীক-স্বরূপ আনুকে আদি-সৃষ্টির কর্তা, ঈয়াকে পালনকারী বিষ্ণু-শক্তি ও বেলকে শিব-শক্তি বলে মনে করলে কিছুমাত্র ভুল করা হবে না। প্রাক্-আর্য ভারতের এখন পর্যন্ত যতটুকু জ্ঞান লাভ করেছি আমরা, তাতে এমন কথা জোর করে বলা যায় না যে সেখানকার স্থানীয় ধর্মই ত্রিমূর্তির পরিকল্পনা করে নি, এবং তা যদি করে থাকে, তা হলে ভারতীয় ত্রিমূর্তিকে সেই প্রাক্-আর্য কল্পনারই পরিণতি বলে ধরে নিতে বাধা কি? সে যা-ই হোক, মিশরীয় ব্যাবিলোনীয় ও ভারতীয় ত্রিমূর্তির চমকপ্রদ সাদৃশ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। খৃষ্টীয় ত্রিমূর্তি যে মিশরীয় কল্পনারই সম্প্রসারণ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ব্যাবিলোনিয়ার প্রাচীন দেবতা ছাড়া অন্য দেশের দেব-দেবীকেও দেব-সমাজে সম্মানিত স্থান দেওয়া হয়েছিল। এমনি একটি দেবী আসিরিয়ার ঈস্তার। ব্যাবিলনের আরাধ্য দেব-দেবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি। মানুষের কল্পনা অসীম, দেবতার সংখ্যাও তেমনি অগণিত। আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক (physical and spiritual) প্রয়োজনবিশেষ থেকে মানুষের মনে দেবতার কল্পনা জাগরিত হয়। এই-সব প্রয়োজনের যখন শেষ নেই, দেবতার সংখ্যাও তখন অন্তহীন হবে বৈকি। খৃস্ট পূর্ব নবম শতকে দেবতাব সংখ্যা নির্ণযেব জন্য আদমসুমারি হয়েছিল, তাতে ৬৫০০০ দেবতার উল্লেখ আছে।

মন্দির, দেবতা, পূজা, আরাধনা সবই ছিল প্রাচীন সুমেরীয় ধরনের। তবে পুরাণ-কথা বিশেষত জগৎসৃষ্টি বিষয়ক কাহিনীগুলিকে নূতন করে ঢেলে সাজলেন তৎকালীন ব্যাবিলোনীয় পুরোহিতরা, মারদুকের জন্য একটি বিশেষ স্থান কবে দেবার জন্যে। ফলে নূতন মহাকাব্য, নূতন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে যা সুমেরীয় সাহিত্যের অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। সুমেরীয় জাতি মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল, তাদেব ভাষাও ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসতে লাগল। শাসক জাতির উৎসাহ লাভ করে অনুবাদ-সাহিত্য বিশেষরূপে বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যেমন ধর্ম বিষয়ে তেমনি আইন-কানুন ও ব্যবসাক্ষেত্রে মূল সুমেরীয় ভাষা অন্তর্হিত হয় নি দীর্ঘকাল পর্যন্ত। কাহিনী রচনায় প্রাচীন পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হত। দেশটি বাহ্যত সেমেটিক রূপ ধারণ করলেও সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পূর্বাপর একই ধারায় বয়ে চলেছিল।

মারদুক ছিলেন দেবাদিদেব—আদিকালে সম্ভবত তিনি সূর্য-দেবতাই ছিলেন। কাহিনী রচিত হয়েছিল যেমন মারদুককে নিয়ে, তেমনি নায়িকার ভূমিকায় পুরাণ-কথার মঞ্চে অবতীর্ণ হতে ইস্‌তারকেও দেখা যায়। ইস্‌তার প্রেমের দেবতা—গ্রীকদের আফ্রোডাইট (Aphrodite), রোমানদের ভিনাস (Venus)। রূপ-সৌন্দর্য ও প্রেম-ভালবাসার মধ্যেই এই দেবীর গুণ-ধর্ম নিঃশেষিত হয় নি। মাতৃত্ব ও উর্বরতার শক্তিরূপিণী, গণিকাবৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী—নিজেকে তিনি 'দয়াশীলা গণিকা' ('compassionate courtesan') বলে অভিহিত করেছেন। আবার রণচণ্ডী করালীও তিনি, যাঁর নামে 'ভীত ত্রস্ত দেবকুল'। তাঁর প্রতিমূর্তিও একরকমের ছিল না—কখনো পুরুষ-স্ত্রী উভয়-লিঙ্গ শ্মশ্রুযুক্ত দেবতা, আর কখনো বা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, সন্তানকে স্তন্য দান করছেন। তিনি ছিলেন নিরতিশয় কামুকা, একটি সিংহের সঙ্গে প্রেম হয়েছিল তাঁর, পরে সেই প্রেমাস্পদকেই হত্যা করেছিলেন। 'গিলগামেশ-মহাকাব্যে' (Epic of Gilgamesh) বর্ণিত আছে, ইস্‌তারের প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলেন গিলগামেশ, যেহেতু এই দেবী চঞ্চলপ্রকৃতি ও অবিশ্বাসিনী। চরিত্রের এই কুখ্যাতি সত্ত্বেও, তাঁর প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার কোন অভাব ছিল না ব্যাবিলোনীয়দের। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রয়েছে এই স্তবটিতে :

ইস্‌তার স্তোত্র

দিব্য জ্যোতি ধরণীর স্বর্গের কিরণ,
সর্ব দেবতার ঊর্ধ্বে তোমার আসন।
সর্বশক্তিময়ী তুমি—কোথা নাই তব নিদর্শন ?
স্বর্গ মর্ত্য সব তুমি কর নিয়ন্ত্রণ
গৃহস্থের গৃহ, গুপ্ত কক্ষের মন্ত্রণ।
দিশি দিশি ভ্রমে তব আদেশের বাণী—
তুমি দেবী ইস্‌তার, তুমি মহারানী।

দেবকুলত্রাস তুমি, তব নামে ত্রিভুবন কাঁপে,
ত্রস্ত তব শক্তির প্রতাপে—

দেবতার দর্প দেবী তুমি চূর্ণ কর,
সকল রাজার শক্তি তুমি করে ধর,
শক্তিধর শাসকেরে করি অতিক্রম
শক্তিবলে। জ্যোতি তব কি বা অনুপম!
আঁখি যেদিকে ফিরাও—
চকিত নিমেষে তুমি মৃতেরে বাঁচাও।
নারীগর্ভ কর মুক্ত—পরা শক্তি তুমি যে শিবানী,
মহাদেবী ইস্‌তার, জগতের রানী।

এই রণচণ্ডী প্রেম-দেবতার গুণ-ধর্মের সংগতি রক্ষা করতে হলে বিশ্বের কারণ-রূপিণী জীবনদায়িনী আদ্যা-শক্তির কল্পনা না করে উপায় নেই। কিন্তু আমরা এখন দেবী-মাহাত্ম্যের আধ্যাত্মিক মার্গ ছেড়ে আখ্যায়িকার ক্ষেত্রে অবতরণ করব।

ইস্‌তার-তামুজ উপাখ্যান

উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু পুনরুজ্জীবনের দ্যোতক এই কাহিনী। গ্রীসের 'ডিমিটার-পারসিফোন' (Demeter-Persephon) অথবা 'ভিনাস-এডনিস' (Venus-Adonis) প্রভৃতি মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের কাহিনীগুলি এই উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। প্রাচীন সুমেরীয় পুরাণ-কথায় তামুজ ইস্‌তারের কনিষ্ঠা ভগিনী বলে বর্ণিত, ব্যাবিলোনীয় কাহিনীতে কিন্তু কখনও সে ইস্‌তারের প্রেমাস্পদ, কখনও বা পুত্র। পৃথিবীর দেবতা ঈয়া-র পুত্র তামুজ একজন রাখাল যুবক। সে যখন একদিন পশুচারণ করছিল তখন তার সুন্দর সুঠাম দেহের সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে প্রেমের দেবী ইস্‌তার এমনি বিমুগ্ধ হয়ে পড়লেন যে তৎক্ষণাৎ তিনি তাকে পতিত্বে বরণ করতে চাইলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হল না। হঠাৎ কোথা থেকে একটি বন্য বরাহ এসে শিং দিয়ে আক্রমণ করে তামুজকে বধ করল। মৃত তামুজ 'আরালু' নামে অন্ধকার পাতালপুরীতে প্রবেশ করল। পাতালপুরীর শাসনকর্ত্রী ছিলেন ইস্‌তারের ভগিনী এরেশকিগাল। শোকার্তা ইস্‌তার পাতালপুরীতে গিয়ে উৎসের পূত জলে তামুজের ক্ষতস্থান ধৌত করে তাকে সঞ্জীবিত করতে কৃতসংকল্প হলেন। ইস্‌তার পাতালপুরীর দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন শুনে ভগিনী

এরেশকিগাল উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। মৃৎ-চাকতির ওপর লিখিত এই কাহিনীটির বর্ণনায় সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় আছে :

কাটে যদি কেউ তিন্তিলিকা
তেমনি কম্পিতা এরেশকিগাল ·
(ভাবলেন) কিসের তরে মর্মবেদনা ইস্‌তারের, কেন বা যাতনা ?
খাদ্য যেখানে কাদামাটি, মদ্য ধূলিকণা,
কোন সুখে সে আসে হেথায়, আমার সকাশে ?
পত্নী যারা ধরাধামে ফেলে আসে,
স্বামী-আলিঙ্গনপাশমুক্ত যত নারী,
শিশু যারা মৃত্যুগ্রাসে কবলিত—সকলের তরে কাঁদি আমি।
খোল দ্বার, প্রতিহার—কর কাজ প্রথামত।

প্রথা এই যে, পাতালপুরী আরালুতে প্রবেশ করতে হয় উলঙ্গ অবস্থায়, প্রত্যেকটি ফটকে এক একটি অঙ্গবাস ও আভরণ পরিত্যাগ করাই নিয়ম। ইস্‌তারকেও তাই করতে হল। কর্ণাভরণ, কণ্ঠহার, বলয়, মেখলা, নূপুর একে একে ত্যাগ করে শেষে তাকে বিবসনা হতে হযেছিল। নিরাভরণা রিক্তবসনা ইস্‌তারের মূর্তি দেখে এরেশকিগালের ক্রোধেব অবধি রইল না। ইস্‌তারকে নির্মমভাবে ভৎর্সনা করলেন তিনি, ইস্‌তারও ক্রোধান্ধ হয়ে ভগিনীকে আক্রমণ করলেন। তখন এরেশকিগাল তাঁর অনুচর নামতারকে আদেশ দিলেন :

যাও নামতার, ওই যে ইস্‌তার,
বন্দী কর তারে প্রাসাদ-কাবায়
মুক্ত কর ব্যাধিকুল—ষষ্টিতম সংখ্যা যার—
অভিযানে যাক তারা, আক্রমণ করুক ইস্‌তারে।
চক্ষু-ব্যাধি বিঁধে যেন আঁখি,
হৃদ-রোগে বিকল পিণ্ড,
শিরোরোগ তোলপাড় করুক মস্তক।

ইস্‌তারকে কারারুদ্ধ করা হল, রোগযন্ত্রণাও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে একটি নূতন বিপদ দেখা দিল, ইস্‌তারের নয়—ধরাবাসী

জীবজন্তু ও উদ্ভিদকুলের। ইস্‌তারের অভাবে পৃথিবীতে প্রেমের উদ্দীপনা লুপ্ত হয়ে গেল। ফুল আর ফোটে না, ফল আর ফলে না, চারাগাছও আর গজায় না। প্রাণীদের মিথুন-প্রবৃত্তি, নরনারীর যৌন মিলনাকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত হল। জনসংখ্যা হ্রাস পেল। সৃষ্টি ধ্বংসোন্মুখ, দেবতারা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা তখন এরেশকিগালকে আদেশ দিলেন, ইস্‌তারকে মুক্তি দিতে। এরেশকিগাল করলেন সেই আদেশ পালন, কিন্তু তামুজকে সঙ্গে না নিয়ে ইস্‌তার পৃথিবীতে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। শেষে তাঁর জেদই বজায় রইল, তামুজ পুনর্জীবন লাভ করল, তাকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ধরায় প্রত্যাবর্তন করলেন। পাতালপুরীর সাতটি ফটকে যে অঙ্গবাস বা আভরণ রেখে গিয়েছিলেন তিনি, ফিরবার সময় সেই জিনিসগুলি ফেরত পেলেন। ধরাতলে যেমন অবতীর্ণা হলেন তিনি, অমনি ফুল ফুটল, ফল ফলল, চারাগাছও গজিয়ে উঠল। প্রাণী-কুলের প্রজনন-কার্য আবার চলতে লাগল, মানুষের প্রেম আবার দেখা দিল। জীবনের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য, বিশেষত ভূমিজাত উদ্ভিদজাতির মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের এই কাহিনীতে প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তি সুন্দররূপে পরিস্ফুট। আধুনিক মানুষের দৃষ্টিতে এই কথিকাটি শুধু কবিত্বময় বলেই উপভোগ্য, কিন্তু সেকালের ব্যাবিলোনিয়ার অধিবাসীদের কাছে এর মূল্য ছিল 'কাব্যামৃত-রসাস্বাদে'র চেয়ে ঢের বেশি। তার কারণ সেখানকার অতিপ্রাচীন স্মৃতি ও ঐতিহ্য প্রচ্ছন্ন ছিল এই কাহিনীটির মধ্যে, এবং তা-ই সত্যরূপে প্রতিভাত হত তাদের মানসপটের সম্মুখে। তখন প্রতি বছর তারা তামুজের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করত, আর উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদে প্রকৃতির প্রজনন-শক্তির নববোধন-বার্তা ঘোষণা করত।

বিশ্ব-সৃজন ও বিশ্ব-শৃঙ্খলার উৎপত্তি-কাহিনীই সৃষ্টিতত্ত্ব (cosmology, cosmogony)। ব্যাবিলোনিয়ায় সর্বপ্রথম যে রচনায় সৃজন-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার নাম এনুমা-এলিস উপাখ্যান। সাতটি চাকতির ওপর লিখিত আছে এই কাহিনী, প্রতিদিনের সৃষ্টি ব্যাপার বর্ণিত রয়েছে প্রতিটি চাকতির ওপর। চাকতিগুলি উদ্ধার করা হয়েছে নিনেভে নগরে আসিরীয় রাজা আসুরবানিপালের বিখ্যাত গ্রন্থাগারের ধ্বংসস্তূপ থেকে। কাহিনীটি লিখিত সুমেরীয় ভাষায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝা যায় এমন সময়ের রচনা সেটি যখন

ব্যাবিলন ছিল সমগ্র রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের কেন্দ্র। কাহিনীর নায়ক ব্যাবিলনের নগর-দেবতা মারদুক। পরবর্তী কালে আসিরিয়া যখন ব্যাবিলনের ওপর আধিপত্য আরম্ভ করেছিল, তখন কাহিনীটিতে মারদুকের পরিবর্তে আসিরীয় দেবতা আসুরের নাম বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলকথা, সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাহিনীটি সুমেরীয় যুগ থেকেই চলে আসছিল, আসিরিয়ার মত ব্যাবিলনও বোধ করি শুধু নামেরই পরিবর্তন করেছিল। কৃষি-দেবতা—সম্ভবত সূর্য-দেবতা—মারদুক, তার ওপর যেসব গুণধর্মের আরোপ করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেই গুণাবলীর অধিকারী নিপ্‌পারের দেবতা এনলিল। মারদুকের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটি কর্ম, প্রবল ঝঞ্ঝার দেবতারূপে আত্মপ্রকাশ—আসলে কিন্তু সে কাজ করেন বাত্যার দেবতা এনলিল। চামড়ার থলিকে ফুৎকারে স্ফীত করা হয় যখন, তার ভিতর থাকে বায়ু, পৃথিবী ও আকাশকেও তেমনি পৃথক করেছিল প্রচণ্ড ঝড়—এই বিবরণটির মধ্যে পবন-দেবের যে কল্পনা রয়েছে, তাই থেকেই উপাখ্যানের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হয়।

এনুমা-এলিস উপাখ্যান

কথিকাটির দুই অংশ—বিশ্ব-সৃষ্টি ও বিশ্ব-শৃঙ্খলার উৎপত্তি। মূলত এই দুটি বিষয়বস্তু পৃথক নয়, দ্বিতীয়টি প্রথমটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের অবস্থা কিরূপ ছিল তার বর্ণনা পদ্যে দেওয়া হয়েছে :

নাম নাই ছিল উর্ধ্বে আকাশের,
নাম নাই ছিল নিম্নে ধরিত্রীর।
শুধু আদি আপ্‌সু—জনক তাদের—
আর মুম্মু আর তিয়ামত,
যার গর্ভে জন্ম উভয়ের—
একাধারে জলরাশি ঢালে সবে।
পঙ্ক জলে জমে নাই,
দ্বীপ জলে ভাসে নাই,
দেবতার আবির্ভাব হয় নি তখনো।
জন্ম নিল দেবতারা অন্তরে তাদের
নাম যবে নিল তারা—হল কর্মের বিভাগ।

বর্ণনায় জল-রূপী আদি পদার্থের বিশৃঙ্খলা কল্পনা করা হয়েছে। জল তিন রকমের—আপ্‌সু বা নদীর জল, তিয়ামত বা সমুদ্রের জল, মুম্মু সম্ভবত ঘনীভূত মেঘ ও কুয়াশা। এই তিন প্রকার জল ছিল মিশে—আকাশ নেই, মাটি নেই, জলাভূমি বা দ্বীপ গঠিত হয়ে ওঠে নি তখনো। দেবতাদের জন্ম হয় নি। কালক্রমে দুটি দেবতার উৎপত্তি হল, নদী-জল আপ্‌সু ও সমুদ্র তিয়ামত থেকে। এই দুটি দেবতার নাম লামু ও লাহামু। বেশ বোঝা যায়, এরা পলিমাটি—যে মাটির উদ্ভব হয় নদীর সাগর-সংগমে। লামু ও লাহামু থেকে জন্মাল আর দুটি দেবতা, আনসার ও কিসার, সম্ভবত এরা দিক-চক্রবালের দুটি অংশ। বৃত্তের ঊর্ধ্বাংশ পুরুষ, আকাশকে ঘিরে আছে, নিম্নাংশ স্ত্রী, ঘিরে আছে পৃথিবীকে। আনসার ও কিসার জন্মদান করলেন আকাশ-দেবতা আনু-কে, আর আনু থেকে জন্মাল ঈয়া বা এনকি অর্থাৎ পৃথিবী। এনকি বা ঈয়ার আর একটি নাম নুদিম্মৎ। আনসার আনুকে সৃষ্টি করেছিলেন 'নিজের অনুরূপ করে', আকাশের গোলাকৃতি দিক্‌চক্রবালেরই মতন। তেমনি আনুও নুদিম্মৎকে সৃষ্টি করেছেন নিজের মত আকার দিয়ে, অর্থাৎ পৃথিবীকে অর্ধবৃত্তাকার বাটির মত করেছেন।

সৃষ্টির রহস্যকে ভেদ করবার জন্য যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে তার উপাদান যুগিয়েছে দুই নদী-উপত্যকার ভূ-তত্ত্ব। পলিমাটি জমে জমির 'সিকস্তি' (alluvion) হয় এখানে, যুগে-যুগে ঘটেছে এই অভিজ্ঞতা উপত্যকাবাসীদের। প্রতি বছর নূতন চরের সৃষ্টি হয়, বিস্তৃত চরভূমি পারস্য উপসাগরের দিকে ক্রমাগত এগিয়ে চলে। সাগর-সংগমে মিশেছে নদী ও সমুদ্র, সেখানে ঝুঁকে পড়েছে দিগ্‌বলয়ের কৃষ্ণ মেঘের পুঞ্জ—এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে চর-সৃষ্টিকে যোজনা করেই যে সৃষ্টিতত্ত্বটি রচনা করা হয়েছে, তা বুঝতে বেগ পাবার কথা নয়।

এই তো গেল আকাশ, পৃথিবী ও দেবগণের সৃষ্টির কথা। কেমন করে বিশ্ব-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এইবার আরম্ভ হল সেই কাহিনী। দীর্ঘ উপাখ্যান, নানা ভঙ্গিতে পদ্যে বলা হয়েছে—আমরা শুধু সারমর্ম নিয়েই আলোচনা করব এখানে, যদিও তাতে কবিত্বের রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা আছে। দেবতাদের সৃষ্টির সঙ্গে দেখা দিল এক নূতন উৎপাত। যেখানে ছিল নিথর নিস্পন্দ জড়তা সেখানে দেখা দিল ক্রিয়াশীল গতির

চাঞ্চল্য। নূতন দেবতারা গতি-চাঞ্চল্যের প্রতীক, তাণ্ডব শুরু করে দিলেন তাঁরা, এবং তাই দেখে জগতের মূল কারণ জল-ত্রয়—আপ্সু, মুম্মু ও তিয়ামত—ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা দেবতাদের ধ্বংস করবার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। সেই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে দেবতারা হলেন উদ্বিগ্ন, তখন পৃথিবীর দেবতা ঈয়া জলরূপ আপ্সুকে মন্ত্র দ্বারা অভিভূত করে তাঁর মুকুট ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করলেন এবং সেই জ্যোতির্ময় পোশাকে নিজেকে ভূষিত করলেন। তারপর নিদ্রিত আপসুকে হত্যা করে তাঁর ওপর নিজের বাসস্থান নির্মাণ করলেন। মন্ত্রবলে মুম্মুকেও নাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেন। মন্ত্র শব্দের এই অর্থ করতে পারি আমরা : আদেশের মধ্যে নিহিত কর্তৃত্ব। অর্থাৎ, ঈয়ার কর্তৃত্ব-পূর্ণ আদেশ বিশৃঙ্খল শক্তিপুঞ্জকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে। ঈয়ার একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল, যাঁর নাম মারদুক—যিনি এই আখ্যায়িকার প্রকৃত নায়ক। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, তড়িদ্গতি-সম্পন্ন, ভীষণদর্শন পুরুষ, চারটি চক্ষু তাঁর, চারটি কর্ণ, অধরোষ্ঠ তাঁর নড়া মাত্র আগুন জ্বলে উঠত। এ-হেন দেবকুমার মারদুক যখন দেব-সমাজে বর্ধিত হয়ে উঠছিলেন, সেই সময়ে বিশ্বের বিশৃঙ্খল শক্তিরা আবার নূতন অনর্থ সৃষ্টির উদ্যোগ করতে লাগল। আপ্সু ছিলেন তিয়ামতের স্বামী—স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করল তিয়ামত, এবং সেই বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হলেন ঈয়া। উত্তাল সাগর-তরঙ্গে পৃথিবী ভেসে গেল—ঈয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ হয়তো এইরূপ—তাঁর মন্ত্রের আদেশ এবার ব্যর্থ হল। ভীত, ত্রস্ত দেবকুল তখন মারদুকের শরণাপন্ন হলেন। প্রভূত বলশালী এই দেবকুমার, তিনি পারবেন বিশ্বে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে স্বীকার করলেন মারদুক, কিন্তু এই শর্তে যে সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁকেই দিতে হবে। তখন দেবতাদের বৈঠক বসল, এবং সেই সমিতির সিদ্ধান্ত-মত মারদুকের ওপর অর্পণ করা হল সর্বময় কর্তৃত্ব, অর্থাৎ আদেশ পালন করতে বাধ্য করবার ক্ষমতা, শান্তি স্থাপনের ভার, যুদ্ধকালীন নেতৃত্ব এবং কুকর্মের শাস্তি বিধানের অধিকার।

আমরা দিয়েছি তোমায় রাজপদ, সর্বময় কর্তৃত্ব,
দেব-সংসদে তোমার স্থান, শিরোধার্য আদেশ তোমার।

শত্রুঘাতী অস্ত্র তোমার ব্যর্থ না হয় যেন—
যে দেবতা বিশ্বাস রাখে তোমার 'পরে তাকে দিও প্রাণ,
কুকর্ম করে যে দেবতা, কেড়ে নিও তার প্রাণ।

উৎফুল্ল দেবতারা করল বন্দনা—জয় মারদুক রাজার!

নৃপতির নিদর্শন—রাজদণ্ড, সিংহাসন, রাজপরিচ্ছদ তাঁকে দেওয়া হল। মারদুকের প্রহরণ বাত্যা-দেবতার অস্ত্র, বজ্র। [এই থেকেই বোঝা যায়, কাহিনী মূলত বাত্যা-দেবতা এনলিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট] মারদুক নির্মাণ করলেন আকাশের রামধনু, বিদ্যুতের শরযোজনা করলেন সেই ধনুকে, আর প্রস্তুত করলেন চারদিকের বায়ুর দ্বারা বিধৃত একটি জাল, তিয়ামতকে ঘিরে ফেলবার জন্য। সাতটি ভীষণ ঝটিকা সঙ্গে করে উঠলেন তিনি রথে, হাতে নিলেন গদারূপী বন্যা। যুদ্ধ-যাত্রা করলেন তিনি, শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল, কিন্তু সাগরিকা তিয়ামত পরাজয় মানল না। মারদুক তাকে জালে জড়িয়ে ফেললেন, আর তিয়ামত যখন মুখ-ব্যাদান করে তাকে গিলতে এল, মারদুক অমনি বাতাস দিয়ে স্ফীত করলেন তার দেহ চামড়ার থলির মত, এবং সেই বিবৃত মুখের ভিতর শরসন্ধান করে তাকে বধ করলেন। তারপর তিয়ামতের দেহ দ্বিখণ্ডিত করলেন তিনি—উপরকার স্ফীত অর্ধ হল আকাশ, আর নীচের অর্ধই পৃথিবীর সমুদ্র। আকাশ ও পৃথিবী দুটি গোলার্ধ, বাতাসই তাদের পৃথক করে রেখেছে,

মারদুক-দেব ও তাঁর বাহন ড্রাগন—
অর্ঘ্যপাত্রে খোদিত

বিশ্ব চামড়ার থলির মত স্ফীত, উপরে নীচে সর্বত্রই জলরাশি—এই ছিল ব্যাবিলোনিয়ার বিশ্ব-কল্পনা।*

বিশ্ব-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করলেন মারডুক প্রথমেই তিথি-নক্ষত্রের নিয়ম-মত পঞ্জিকা (calender) তৈরি করে। আকাশকে নক্ষত্রখচিত করলেন মারডুক, তাদের উদয়, অস্ত, বর্ষ ও মাস গণনার বিধান করলেন। তারপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন, দেবগণকে কর্মশ্রম থেকে মুক্তি দেবার জন্য। কবিতার বর্ণনা এইরূপ :

> দেবতার কথা শুনে বিচলিত মারডুক হৃদয়ে জপেন,
> কল্পনার নব-সৃষ্টি মনে যত জাগে—সব ঈয়ারে বলেন :
> মানবের দেহ-উপাদান,
> রক্ত অস্থি শিরা-গ্রন্থি—জীবন-নিধান—
> জড় করি মানুষেরে করিব সৃজন,
> দেবতার স্তব স্তুতি করিবে সে সাধন ভজন,
> মন্দির ভরিয়া যাবে দেব মহিমায়,
> কীর্তিমুখরিত গানে, পূজা-অর্চনায়।
> দেবতার কর্ম নর শিরে লবে তুলে,
> ভারমুক্ত করিবে সে শ্রান্ত দেবকুলে।

কিন্তু সেই সঙ্গে দেবতাদেরও কর্মপদ্ধতি বেঁধে দিলেন মারডুক। আনুকে করলেন দেবতাদের পরিচালক—তিন শ' দেবতাকে করলেন স্বর্গের প্রহরী, পৃথিবীর কাজের ভার রইল তিন শ' দেবতার উপর। যে আদিম গণতন্ত্র

* এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস নদী-উপত্যকার আদিম বিশৃঙ্খলা, যার সঙ্গে জড়িত রয়েছে মহাপ্লাবনের স্মৃতি, সেই প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে আদিকালের সুমেরীয়দের সংগ্রাম, ফলে সিনার-ভূমির প্রতিষ্ঠা, এসব বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। টয়েনবি বলেন, "The slaying of the dragon Tiamat by the God Marduk and the creation of the world out of her mortal remains signifies the subjugation of the primeval wilderness and the creation of the land of Shinar by the canalization of the waters and the draining of the soil." (*Study of History*, Vol. I, p. 316-17)

(primitive democracy) আমরা দেখেছি সুমেরীয় বিশ্ব-রাষ্ট্রের কল্পনায়, এখন তার রূপের পরিবর্তন হয়েছে। সংসদটি যে নেই, তা নয়, কিন্তু দেবগণের ক্রিয়াকর্ম সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। দেব-সমাজের সর্বেসর্বা হলেন মারদুক—আনুকে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে হল।

আমরা এখন এমন স্থানে এসেছি ধর্ম-বিবর্তনের পথে, যেখানে চোখে পড়ে বিশ্বের বাহ্য রূপ মাত্র নয়, রূপের মধ্যে যে শক্তি নিহিত রয়েছে সেই শক্তি প্রকট হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। প্রাচীন সুমেরীয় চিন্তাধারায় এইসব শক্তিকে দেখেছি আমরা বিচ্ছিন্নভাবে, একটি শ্লথ গণতান্ত্রিক সমাজের অংশ-রূপে। সেই আদিম গণতন্ত্রের স্থান অধিকার করেছে রাজতন্ত্র (monarchy), যা বিশ্বরাজ্যে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। মারদুককে রাজপদে অভিষিক্ত করা হয়েছে যেসব শর্তে, তা আধুনিক সমাজ-চুক্তিবাদের (Social Contract Theory) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।* সংকটকালে আসন্ন যুদ্ধের মুখে বিশ্বরাষ্ট্রের সেই আদিম সমাজ-সংস্থার স্থানে এখন একটি সুনিয়ন্ত্রিত এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুমেরের পুরাণ-কথায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও শৃঙ্খলার বিষয় ছিল না, এমন নয়। টিলমুন উপাখ্যানে উদ্ভিদ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, আমরা তা পূর্বে দেখেছি। প্রাচীন কাহিনীগুলিতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর সৃষ্টি পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির মূল কারণের সন্ধান করা হয় নি। এনুমা-এলিস উপাখ্যানে সারা বিশ্বের সৃষ্টি ও শৃঙ্খলার কথা সমগ্রভাবে বলা হয়েছে, সৃষ্টিতত্ত্বের এইটেই হল একটি অভিনব অধ্যায়। আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দেবতারা এখনো সকলেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির প্রতীক, শক্তিসমূহের একত্ব কল্পনা, অর্থাৎ যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তি একমাত্র বিরাট সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ, এরূপ বোধ তখনো জাগে নি।

* ফরাসী দার্শনিক Jean Jacques Rousseau তাঁর *Social Contract* গ্রন্থে এই চুক্তি-বাদ প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মতবাদের মর্মার্থ: শাসকের সঙ্গে সমাজের চুক্তিমতই রাজা বা শাসক জনগণের ওপর আধিপত্য করবার অধিকার লাভ করেন। এই অধিকার তাঁকে জনগণই অর্পণ করেছে, সুতরাং শাসিতের সম্মতির ওপরই প্রশাসনের সকল দাবি নির্ভর করে। অষ্টাদশ শতাব্দের ফরাসী বিপ্লব এমন কি আমেরিকার বিপ্লবের ওপরও রুসোর চুক্তিবাদ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই চুক্তিবাদের প্রাচীনত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সুমের ও ব্যাবিলনের পুরাণ-কাহিনীগুলিতে।

ঋগ্‌বেদে (৩-৫৫-১) বলা হয়েছে : মহদ্ দেবানাম্ অসুরত্বম্ একম্—অর্থাৎ সকল দেবতার মধ্যে একই ঐশী শক্তি বিরাজ করেন।* এই একত্ববোধের অভাবে ব্যাবিলোনিয়ার ধর্ম একেশ্বরবাদের পর্যায়ে উঠতে পারে নি।

চিন্তাধারায় আর একটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। ধর্মজগতে দেবতা ছিল, আবার অপদেবতাও ছিল। মনুষ্যসমাজে যেমন দস্যু-তস্কর, দেব-সমাজে অপদেবতারাও ছিল তাই। ব্যাধি, অনর্থ প্রভৃতি মানুষের যত দুর্ভোগ অপদেবতার কোপদৃষ্টি থেকে সমুৎপন্ন, এই ছিল প্রাচীন যুগের বিশ্বাস। তেমনি পাপও কিছু আত্মার একটি অবস্থা মাত্র নয়, আধিব্যাধির মত পাপ দেহের একটি অবস্থা, এবং সেই অবস্থার সঞ্চার হয় অপদেবতা যখন শরীরে প্রবেশ করে। মহাভারতে নল উপাখ্যানে আছে, পাপরূপী কলি নল রাজার শরীরে কৌশলে প্রবেশ করলেন। এমনি করে অপদেবতার অনুপ্রবেশের ফলেই যখন দেহে পাপের সঞ্চার হয়, তখন ভূত তাড়াবার জন্য দরকার হয় ওঝার ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র। স্তবস্তুতি মন্ত্রের সূত্রপাতও ঐখানে। মাদুলি তাবিজও ধারণ করা হয়েছে অপদেবতাকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য। কিন্তু শাসনব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে দস্যুভীতি কমতে থাকে। ব্যাবিলোনিয়ায় এতকাল অপদেবতারা ছিল নিরঙ্কুশ, দেবকুলের আয়ত্তের বাইরে, এখন তাদের প্রভাব কতকটা হ্রাস পেয়ে আসছিল। এইরূপ বিশ্বাস দেখা দিল যে, দেবশক্তি অনায়াসে ভূতপ্রেতের উপদ্রব নিরসন করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস সত্ত্বেও মন্ত্র-তন্ত্র পারে না মানুষকে ব্যাধি ও অনর্থের হাত থেকে মুক্তি দিতে, তাই আধিব্যাধির নূতন কারণের সন্ধান করতে হয়। সেই কারণটি হল এই যে, ইষ্টদেবতা বিমুখ বা রুষ্ট হয়েছেন বলেই এরূপ অনিষ্ট ঘটতে পেরেছে, আর দেবতা অপ্রসন্ন হন মানুষেব স্বকৃত অপরাধ, তার

* 'অসু'-শব্দের অর্থ প্রাণশক্তি। 'মহৎ দেবানাম্ অসুরত্বমেকম্' অর্থাৎ সকল দেবতার মধ্যে একই প্রাণশক্তি বিরাজ করে, এই বাক্যটি ঋগ্‌বেদের অনেক স্থানেই আছে। 'ত্বম্ বরুণ উত মিত্রো অগ্নে'—হে অগ্নি, তুমিই বরুণ, তুমিই মিত্র—প্রাকৃতিক দেবগণের প্রাণশক্তির এই একত্বকল্পনার আগেকার ধাপে, এলোমেলো বিশৃঙ্খল লীলাখেলার মধ্যে প্রাক্-বৈদিক ভারতের শিব-শিবানী প্রভৃতি দেবদেবীর আবির্ভাব হয়েছিল ঠিক সেইভাবে যেমন দেখা দিয়েছিলেন ব্যাবিলোনিয়ার দেবকুল, এরূপ ধারণা করলে ভারতে ধর্মচিন্তার বিবর্তনধারা বোঝা বোধ করি কঠিন হবে না।

নৈতিক ও চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য। নীতিজ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত মানুষের মনের এই অনুভূতিবোধ থেকে। সমাজ কখনো স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করতে পারে না, কেননা নীতির অনুশাসন (moral order) দ্বারাই সমাজ বিধৃত। নীতিজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হয়েছিল ইহুদিদের ধর্মে বহু শতাব্দী পরে। কিন্তু তাদের সেই সর্বজনীন নীতি-সংস্থার (moral organisation of the world) শিকড় নিহিত রয়েছে ব্যাবিলোনীয় সংস্কৃতির মধ্যে। সে যুগের সাহিত্যের বহু মূল্যবান জিনিস নষ্ট হয়ে গেছে, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের যে কয়টি অবশেষ এখনো বিদ্যমান, তার মধ্যে মারদুকের উদ্দেশে রাজা নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের একটি স্তব বিশেষ প্রশংসনীয়। দেবতার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব স্তবটিতে বিলক্ষণ ফুটে উঠেছে। স্তবটি এই :

প্রভু তুমি প্রীত যার 'পরে
তোমার কৃপায় যে বা রাজা নাম ধরে,
সাথী যদি নাহি হও তার,
কি থাকে রাজার ?
তোমার আদেশ আমি বহি নিরন্তর,
তুমি মোর সৃজন-ঈশ্বর—
যে রূপ দিয়েছ মোরে ওগো দেব, শিল্পী রূপকার,
আমি তাই, তাই আমি—সে তো মোর রূপ সত্যকার।
প্রজা-শাসনের ভার করেছ অর্পণ,
মম পরে দেছ ঢেলে কৃপা অকৃপণ......
(তব) রুদ্র তেজ শান্ত কর, স্নিগ্ধ প্রেম জ্বালো,
ভক্তির নির্ঝর-বারি চিত্তে মোর ঢালো,
তুমি যা-ই দেবে মোরে সেই মোর ভালো।

ব্যাবিলোনীয় পরিতাপ-স্তোত্র

আত্মধিক্কারে ভরা এইসব স্তবস্তুতি। সেমাইটদের এইরূপ অনুশোচনা হয়ে উঠেছিল তাদের অন্তরের গর্বকে সংহত ও গোপন করবার একটি উপায়-বিশেষ, কেবল 'পাপোঽহম্ পাপকর্মাহম্' বলে দম্ভকে প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রচেষ্টা।

অন্য কথায়, সেই দম্ভই তীব্র অনুশোচনার ভাষার ছদ্মবেশে প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাবিলোনিয়ায় এমনি ধারা অনেক 'পরিতাপ-স্তোত্র' (Babylonian Penitential Psalms) রচিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে প্যালেস্টাইন থেকে হিব্রুদের যখন বন্দীদশায় ব্যাবিলনে আনা হয়েছিল তখন তারা 'সাম' (Psalm) নামে অপূর্ব স্তবমালা রচনা করেছিল, সেগুলি রাজা ডেভিডের রচনা বলে প্রকাশ। আসলে কিন্তু 'সাম'-এর গীতাঞ্জলির মূল উৎসধারা ব্যাবিলোনীয় 'পরিতাপ-স্তোত্র', এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 'সাম' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন, 'সাম'-এর অগ্রণী ও পথ-প্রদর্শক হিসাবে 'পরিতাপ-স্তোত্র'গুলির মূল্যও অকিঞ্চিৎকর নয়। ভাব, ভাষা ও রচনা-শৈলীর নিদর্শন-স্বরূপ একটি ব্যাবিলোনীয় পরিতাপ-স্তোত্রের কয়েক ছত্র নিম্নে দেওয়া গেল :

প্রভুর অন্তরে ক্রোধ শান্ত হোক,
অজানা দেবতার ক্রোধ শান্ত হোক,
অজানা দেবীর ক্রোধ শান্ত হোক,
জানা ও অজানা দেবতার ক্রোধ শান্ত হোক,
জানা ও অজানা দেবীর ক্রোধ শান্ত হোক।
আমার আরাধ্য দেবতার অন্তর প্রশান্ত হোক
আমার আরাধ্য দেবীর অন্তর প্রশান্ত হোক।

অন্তরের ক্রোধে প্রভু চেয়েছেন আমার পানে,
অন্তরের ক্রোধে দেবতা ঘিরে ফেলেছেন আমাকে,
আমার প্রতি যে দেবী ক্রুদ্ধা তিনি আমায় যন্ত্রণা দিয়ে বিদ্ধ করেছেন।
জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কোন দেবতা আমায় নির্যাতিত করেছেন।

আমি চেয়েছি সাহায্য, কেউ আমার হাতখানি ধরে নি।
আমি কেঁদেছি, কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায় নি।
শোকে আর্তনাদ করেছি, কেউ কর্ণপাত করে নি।······

আমার দয়াশীল আরাধ্য দেবতার কাছে দুঃখ নিবেদন করি।
আমার আরাধ্যা দেবীর পদ চুম্বন করি।
জানা অজানা দেবতার কাছে দুঃখ নিবেদন করি।
জানা অজানা দেবীর কাছে দুঃখ নিবেদন করি।······

দুর্মতিগ্রস্ত মানব, কারো নেই বোধশক্তি,
যারা (বেঁচে) আছে, তাদের মাঝে কেহ কি জানে কিছু ?
ভাল কি মন্দ করে তারা, সে জ্ঞান তাদের নেই।
প্রভু, তোমার ভৃত্যকে পরিহার ক'রো না।
ক্লেদকর্দমে শায়িত সে, তাকে তুলে নাও হাত ধরে।
যে পাপ করেছি আমি, তাকে দাক্ষিণ্যে ভরে তোল।
কদাচার উড়িয়ে দাও বায়ুর ফুৎকারে,
অপরাধ খণ্ড খণ্ড কর ছিন্ন বসনের মত।

প্রাচীন সুমেরীয় রচনায় 'ধুয়া' (refrain) বা পুনরাবৃত্তির ব্যবহার একটি বিশেষত্ব, উর ধ্বংসের বর্ণনায় আমরা তা দেখেছি। ব্যাবিলোনীয় স্তবমালায়ও সেই 'ধুয়া' পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আর যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল 'অজানা দেবদেবী'র আরাধনা। যে দেবতার বিরাগভাজন বা ক্রোধদৃষ্টি পতিত হবার দরুন মানুষের ভোগান্তির থাকে না অন্ত, সেই দেবতাকে স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন করতে হলে তার নামের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজন। আর নাম যদি জানা না থাকে তবে 'যা দেবী···নমস্তস্যৈ নমো নম' করেই কাজটা সারতে হয়। দলিলপত্রে আইন-ব্যবসায়ীরা omnibus clause অর্থাৎ 'সর্বাত্মক ধারা' ব্যবহার করেন, কেউ যেন সেই ধারার আওতা থেকে বাদ না যায়। ব্যাবিলোনীয়দের স্তবে অজানা দেবতার উল্লেখ আইনের সর্বাত্মক ধারার অগ্রদূত, এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে না।

ব্যাবিলোনীয় সমাজে নীতির প্রতিষ্ঠা প্রথমত পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে, পরিবারের বাইরে রয়েছে গোষ্ঠী-সমাজ ও রাষ্ট্র। পরিবার মধ্যে যেমন পিতার কর্তৃত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতার প্রতিষ্ঠাও তেমনি। সামাজিক মানুষের লক্ষ্য—সুশৃঙ্খল, সুষ্ঠু, শিষ্ট জীবন যাপন। প্রথম ধাপে পিতামাতা, বড় ভাইবোনদের

প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তারপর যে মুনিবের কাজ করে কারিগর তার বাধ্য থাকাই নৈতিক বিধান। মোড়লের বাধ্য থাকতে হয় কৃষিজীবীকে। এই মর্মে কতগুলি বচন প্রচলিত আছে :

রাখাল বিনা মেষপাল যেমন, রাজা বিনা সৈন্যরাও তেমনি।

খাল-পরিদর্শক না থাকলে জলের অবস্থা যেমন, পরিচালক না থাকলে কারিগরদের অবস্থাও তেমনি হয়।

দেবাদিদেব আনুর আদেশের মত রাজার হুকুম অনড়। রাজার বাক্যই সত্য। দৈববাণীর মত রাজার বাণী অপরিবর্তনীয়।

রাজা, পিতামাতা প্রভৃতি নমস্য ব্যক্তি ছাড়াও কর্মফলদাতা-রূপে একজন গৃহ-দেবতার প্রয়োজন হয়। দেবসমাজে একটি ছোটখাট স্থানও আছে এই গৃহ-দেবতার। সিদ্ধিদাতা তিনি, কর্মে সাফল্য অর্জন করে মানুষ তারই প্রভাবে। ব্যাবিলোনিয়ার সভ্যতা ছিল বাণিজ্যিক, সিদ্ধিদাতার ভক্ত আমাদের দেশের বণিক সম্প্রদায় যেমন, সেখানকার অধিবাসীরাও ছিল তেমনি—কার্যে সিদ্ধি ঘটলে তারা বলত 'দেবতাকে লাভ করা গেছে' (acquired a god)। 'গৃহ-দেবতার অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ পারে না রোজগার করতে, যুবক পারে না যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে।' প্রত্যেক বাড়িতেই ছিল পূজার ঘর, সেখানে গৃহ-দেবতা অধিষ্ঠিত থাকতেন। ষোড়শোপচারে অর্ঘ্য নৈবেদ্য দিয়ে দেবতার পূজা করা হত।

লুড্‌লুল-বেল-নেমেকি বা 'আরাধনা করি আমি প্রজ্ঞা-দেবতার'

ইষ্টদেবতা তুষ্ট হলে ব্যক্তির মঙ্গল, আর রুষ্ট হলে তার সমূহ অমঙ্গল। দেবতার কোপ কি শুধু দুরাচার, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির ওপরই পড়ে থাকে? তা যদি হত, তা হলে আদর্শ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন দেবতারা। কিন্তু সংসারে সচরাচর দেখতে পাই আমরা, পুণ্যবান সাধুপ্রকৃতির মানুষের অশেষ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। "ঐ দেখ, দুরাচারী ব্যক্তিরাই জগতে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তাদের ধনদৌলত বৃদ্ধি পায়" (Psalm 73)। দেবতার এই অন্যায় বিচার দেখে বাইবেলের 'সাম'-গ্রন্থের প্রণেতা গর্জন করে উঠেছেন, "কতকাল হে প্রভু, আত্মগোপন করে থাকবে তুমি? তোমার ক্রোধ কি আগুনের মত দীপ্ত হয়ে উঠবে না?" (Psalm 89)। হাম্মুরাবির যুগে আমরা

দেখেছি, ন্যায়বিচার রাজার অনুগ্রহ মাত্র ছিল না, প্রজার একটি স্বতঃসিদ্ধ অধিকার হয়ে উঠেছিল। ঠিক তেমনি করেই এখন দেবতার কাছে ন্যায়-বিচার লাভ মানুষের স্বতঃসিদ্ধ অধিকার-রূপে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু দেবতার নিকট ন্যায়-বিচারের প্রত্যাশা যদি স্বতঃসিদ্ধই হয়, তবে সংসারে অসাধুর জয় আর সাধু ব্যক্তির পরাভব হয় কেমন করে? বাইবেলের 'জব' (Job) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করে সেটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু 'জব' রচনার বহু পূর্বে ব্যাবিলোনিয়ায় মানুষের মনে এই পরিপ্রশ্ন জেগে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টাও দেখা দিয়েছিল। 'লুড্‌লুল-বেল-নেমেকি'—অর্থাৎ 'আরাধনা করি আমি প্রজ্ঞা-দেবতার' ("I will praise the lord of wisdom")—নামক কবিতাটিতে এ বিষয়ে একটি সংগত মীমাংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'জব'-এর মত এই রচনার নায়কও ছিলেন একজন পরম সাধু নীতিপরায়ণ ব্যক্তি। দেবদেবীর পূজা করেছেন তিনি, রাজভক্তিরও অভাব ছিল না তাঁর—দেবতার ও রাজার প্রিয় অনুষ্ঠানগুলি যথাসাধ্য সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু পুণ্য কর্ম সত্ত্বেও তাঁর দেহটি ব্যাধিগ্রস্ত অসাড় নিস্পন্দ, চক্ষু দৃষ্টিহীন ও কর্ণ শ্রুতিহীন হয়েছিল। তিনি নিরন্তর বিলাপ করেন, তাঁর ইষ্টদেবতা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন ('His god has abandoned him')। সংগতভাবেই প্রশ্নটি করা হল: যে শাস্তি পাষণ্ড ভোগ করে, ঠিক সেই সাজা দিলেন দেবতা একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে—এ কেমনধারা বিচার? চটপট জবাব এল: মূঢ় তুমি! তাই, সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে দেবতার কার্যের বিচার করতে চাও। মানুষের ভালমন্দর মান দিয়ে দেবতাকে বিচার করা চলে কি?

প্রিয় যাহা তুমি মনে কর
তার প্রতি দেবতা বিমুখ,
দেবতার কাছে যাহা ভাল
তুমি তায় নাহি পাও সুখ।
দ্যুলোকের গভীর কন্দরে—
কে বুঝিবে দেবতার মন?
দেবতার মানস-জলধি
পশিবারে পারে কোন জন?

মানুষের দৃষ্টি অন্ধ,
দেবতার প্রতি সন্দ
দেবতা-রহস্য ভেদ অসাধ্য সাধন।

আর তা পারবেই বা কিরূপে মানুষ? সে যে ক্ষণিকের জীব। পদ্মপত্রে জলের মত টলমল করে সে, ক্ষণে ক্ষণে তার পরিবর্তন। কবিতায় মানুষের এই অবস্থাটির বর্ণনা এইরূপ :

কাল জন্ম মৃত্যু আজ, শিরে ভেঙে পড়ে বাজ—
মুহূর্তে বিষাদ-ছায়া, মুহূর্তে বিনাশ,
গান গায় মহানন্দে, কভু বা করুণ ছন্দে
কেঁদে ওঠে, কখনো বা প্রসন্ন সহাস।
মতি গতি ঠিক নাই, ক্ষুধা পেলে খাই-খাই,
ভরিলে জঠর—আর দেব-ভক্তি নাই।
(আবার) ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে, জোরে গলাবাজি চলে,
ত্রিদিবে চড়িতে চায় ধরার মানব।
আর যদি দৈববশে, অনর্থ চাপিয়া বসে,
রুখে বলে—দেব নয়, ওটা যে দানব !

ক্ষণভঙ্গুর মানব সদা পরিবর্তনশীল, অস্থিরমতি, আর দেবতা চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। দেব-প্রজ্ঞা গভীর, মানুষের সাধ্য নাই যে তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের বুদ্ধি যেখানে অচল, সেখানে আশা ও বিশ্বাসই তার পরম আলম্বন। দুর্গতির চরম অবস্থায় কবিতার নায়ক যখন বিশ্বাস ও ভরসাকেই শেষ সম্বল রূপে গ্রহণ করল, তখন হল মারদুকের দয়া। তিনি তার স্বাস্থ্য ও সুখ ফিরিয়ে দিলেন। মানুষের হতাশার কারণ নেই, মেঘের অন্তরালে আছে রজত-রেখা। দেবতার কৃপায় ঘনায়মান অন্ধকার কেটে গিয়ে দিব্য জ্যোতি ফুটে ওঠে।

নীতিজ্ঞান দেখা দিয়েছে—সর্বজনীন নীতি-সংস্থা কল্পনারও উদয় হয়েছে। রাজ-শাসনের মত দেব-শাসনের দণ্ড-পুরস্কারকেও শিরোধার্য করেছে মানুষ। কিন্তু জীবনের অন্তে সর্ব-মানবের জন্য অপেক্ষা করে দেবতার চরম অভিশাপ

—মৃত্যু। ভাল নাই, মন্দ নাই—সমগ্র মানবজাতিকে নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন নিষ্ঠুর দেবতা। এই বিধান কি নীতিসম্মত, না ন্যায়সংগত? পরিপ্রশ্নটি জেগে উঠতে সুদীর্ঘ সময় লেগেছিল, যেহেতু দেবতার কাজের সমালোচনা রাজদ্রোহেরই নামান্তর। যখন জাগল সেই বিদ্রোহ, তখন তা দেখা দিল মৃত্যুর বিরুদ্ধে অভিযান রূপে। রাজা গিলগামেশ বেরুলেন অভিযানে—ঐশ্বর্য সম্পদ, রাজার সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি সবই বৃথা—যেনাহম্ নামৃতম্ স্যাম্ কিমহম্ তেন কুর্যাম্ (বৃহদারণ্যক উপনিষদ)। চাই অমৃতত্ব—কোথায় রয়েছে অনন্ত জীবনের সেই গোপন রহস্যটি, যা আবিষ্কার করতে পারলে মানুষ হবে মৃত্যুঞ্জয়? 'গিলগামেশ মহাকাব্যে' বর্ণিত হয়েছে অমরত্বের সন্ধানে গিলগামেশের অভিযানের কথা।

গিলগামেশ মহাকাব্য ও প্লাবন-কাহিনী

বারোখানা মৃৎ-চাকতির ওপর লিখিত ৩০০০ পংক্তি সমন্বিত গিলগামেশ মহাকাব্য উদ্ধার করা হয়েছে, তার কতগুলি পাওয়া গেছে নিনেভের ভগ্নস্তূপ মধ্যে আসুরবানিপালের গ্রন্থাগারে। সম্পূর্ণ মহাকাব্য নয়, মহাকাব্যের কিয়দংশ মাত্র আমরা সেই চাকতি-লিখনগুলিতে দেখতে পাই। আর যে বিষয়টি বিশেষভাবে নজরে পড়ে তা এই যে, মহাকাব্যটি একটি মাত্র কাহিনীর সুসম্বদ্ধ ধারাবাহিক বিবরণ নয়, তিন হাজার খৃস্ট পূর্বাব্দ থেকে যুগ-যুগ ধরে যেসব কথিকা জাতীয় ঐতিহ্যের স্মৃতিভাণ্ডে স্থান পেয়েছিল, সঞ্চিত সেই কথাসমূহ নিয়ে একটি মালা গাঁথা হয়েছে এই মহাকাব্যে, আর সেই মালার অনুবিদ্ধ সূত্ররূপে বিরাজ করছেন পরম যশস্বী কীর্তিমান জাতীয় বীর গিলগামেশ। অন্যান্য দেশে জাতীয় মহাকাব্য যেভাবে রচিত হয়েছিল, এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। গ্রীসে যেমন ইলিয়াড ওডেসি, ভারতবর্ষে তেমন মহাভারত রামায়ণ, এসবই সংকলন গ্রন্থ, কয়েক শত বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে ও কালে প্রচলিত কথিকাগুলির সংকলন। গিলগামেশ মহাকাব্যে কয়েকটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরপর্যায়ের সাক্ষাৎ মেলে, যার সঙ্গে মূল কাহিনীর সম্পর্ক সামান্যই। তেমন একটি স্তরপর্যায় এনকিদু কাহিনী, বন্যমানব এনকিদু, তার অবতারণা করা হয়েছে মূল উপাখ্যান থেকে বিচ্ছিন্নভাবেই। দ্বিতীয় স্তরে পাই আমরা উৎনাপিসতিম ও মহাপ্লাবনের কাহিনী,

কথিকাটি যেন একটু অপ্রাসঙ্গিক, মনে হয় সেটি মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া এই মহাকাব্যে নিসর্গ-প্রকৃতি নিয়ে রচিত কয়েকটি 'মিথ'ও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে অসমঞ্জসরূপে, এবং পরিশেষে যে ধর্মতত্ত্বের আবরণে উপাখ্যানের পরিশিষ্ট-ভাগ সযত্নে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, সেই ধর্মতত্ত্ব এক শ্রেণীর ব্যাবিলোনীয়দের দার্শনিক মতবাদ, জীবনে যা তারা সত্য বলেই উপলব্ধি করেছিল।

গিলগামেশ ছিল প্রাচীন এরেক নগরের পৌরাণিক রাজা। তার আকৃতির বর্ণনা অনেকটা এডনিস বা স্যামসনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘ শক্তিমান সুশ্রী অপরাজেয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষ, অপূর্ব ধীশক্তি দিয়ে সে রহস্য ভেদ করত, ঝঞ্ঝা প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণীও করতে পারত। অক্লান্ত শ্রমশীল মানুষ, প্রজাদের কাছে নিজের মত অমানুষিক পরিশ্রম প্রত্যাশা করত, সেজন্য তাদের কঠোর শ্রমসাধ্য কর্ম করতে বাধ্য করত। প্রজারা ইস্‌তার দেবীর কাছে অভিযোগ করলে, প্রার্থনা করলে তারা যেন কঠোর শ্রম থেকে অব্যাহতি পায়। দৈবানুগ্রহে তখন গিলগামেশের সহকর্মী হবার যোগ্য একজন 'জুড়িদার' সৃষ্টি করা হল, কারণ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দুই মহাকর্মীর মধ্যে কর্ম বিভক্ত হলে প্রজাদের শ্রমের লাঘব হবে। জুড়িদারটি ছিল এক রাক্ষস, বন্য শূকরের শক্তি তার দেহে, মাথায় সিংহের কেশর, তার নাম এনকিদু। সে মানুষের সংসর্গ পছন্দ করে না, পশুর সঙ্গে থাকে। 'সে মৃগের সঙ্গে বিচরণ করে, জল-জন্তুর সঙ্গে করে জলক্রীড়া'। একজন ব্যাধ ফাঁদ পেতে তাকে ধরতে চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থ হয়ে গেল গিলগামেশের কাছে। বললে, আমায় দাও রাজা একটি যুবতী দেবদাসী, প্রেমের ডোরে যে পারবে ওকে বেঁধে ফেলতে। গিলগামেশ বললে, বেশ, দেবদাসীকে নাও তোমার সাথে। ঝরনার ধারে সে যেন তার শোভা-সৌন্দর্য অনাবৃত করে।

ব্যাধ যায় দেবদাসীকে সঙ্গে নিয়ে। বনানীর অন্তরাল থেকে নির্ঝরের কলতান ভেসে আসে, সেখানে পশুপাল পরিবৃত এনকিদু এসেছে জলপান করতে। তরুরাজির ফাঁকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ব্যাধ চুপিচুপি বলে সুন্দরীকে :

ওই যে সেথায় দাঁড়িয়ে সে, ওদিক পানে চাও—
কটির বসন নীবির বাঁধন শিথিল করে দাও।
আনন্দের সে মুক্তধারা
ছুটবে যখন পাগল-পারা,
ভয় পেও না, অই ললনা,
পালিয়ে এসো না কো—
বরণ করে লও কামনা,
মগ্ন সুখে থাকো।

রাজা কর্তৃক প্রেরিত বারাঙ্গনা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বিমোহিত করেছিল তার যৌবনোচ্ছল রূপের আকর্ষণে—সেই কাহিনীরই পূর্বাভাস পাওয়া যায় যেন দেবদাসীর ভূমিকায়। ঋষ্যশৃঙ্গের মতই নারীর ভুজপাশে বাঁধা পড়ল এনকিদু, কিন্তু এই সরল প্রকৃতির স্বভাব-মানবকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখবার জন্য দেবদাসীর মনে কোন অনুশোচনা জাগে নি, রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র মত সে প্রভুর কাছে গিয়ে কেঁদে বলে নি—

"চরণপদ্মে নমস্কার
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা
লও ফিরে তব পুরস্কার।

অনুতাপ করেছিল এনকিদু, যখন বিস্মরণীর সলিলে সাত দিন নিমগ্ন থাকার পর মোহ কেটে গিয়ে দেখল সে, যারা ছিল তার প্রিয় সহচর সেই জীব-জন্তুরা তাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। মনোবেদনায় সে পরিতাপ করতে লাগল, কিন্তু দেবদাসী তাকে ভর্ৎসনা করে বললে, কেন দুঃখ করছ? তুমি দেবতার মত মহীয়ান, কেন তুমি পশুর সঙ্গে থাকবে? আমি তোমাকে নিয়ে যাব এরেকের অধিপতি গিলগামেশের কাছে। তখন হল গিলগামেশের সঙ্গে তারই 'জুড়িদার' এনকিদুর মিলন। দেবতা ও মানব সকলেই অপেক্ষা করছিল এই শুভ মিলনের জন্য।

উদার হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে এনকিদুকে বশীভূত করল গিলগামেশ, দুজনের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব জন্মাল। একসঙ্গে তারা যুদ্ধযাত্রা করল ইলাম দেশের বিরুদ্ধে, বিজয়ী হয়ে ফিরে এল। যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে রাজার

পরিচ্ছদ, বহুমূল্য মণিরত্ন পরিধান করল গিলগামেশ। কী চোখ-ঝলসানো রূপ! প্রেমের দেবী ইস্তার নিজেই তার প্রেম কামনা করলেন। বললেন, সসাগরা ধরণী তোমার পদচুম্বন করবে, পৃথিবীর নৃপতিরা মাথা নত করবে, উপহার রূপে নানান ঐশ্বর্য বহন করে আনবে তোমার কাছে। এসো তুমি—আমি তোমায় পতিত্বে বরণ করছি।

ইস্তারের প্রেম প্রত্যাখ্যান করল গিলগামেশ। মায়াবিনী এই দেবী—তাঁর প্রেম যে পদ্মপত্রে জলের মতই চিরচঞ্চল। ইস্তারের ক্রোধ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। দেবাদিদেব আনুকে ধরে বসলেন তিনি—এমন একটি ভয়ংকর শক্তিশালী 'স্বর্গীয় বৃষ' (bull of heaven) সৃষ্টি করতে বললেন যে করবে গিলগামেশকে বধ। আনু কিছুতেই স্বীকার করলেন না। তখন ইস্তার তাঁকে এই বলে ভয় প্রদর্শন করলেন যে, জীবের কামোদ্দীপনা বন্ধ করে দিয়ে তিনি প্রাণীকুল ধ্বংস কববেন। অগত্যা আনু মত্ত বৃষ সৃষ্টি করতে বাধ্য হলেন, কিন্তু এই ভীষণদর্শন জানোয়ারটিও নিহত হল দুই বন্ধুর সঙ্গে সংগ্রামে। ইস্তার অভিশাপ দিলেন গিলগামেশকে। ক্রুদ্ধ হয়ে এনকিদু একটি অস্থিখণ্ড নিক্ষেপ করে ইস্তারকে আঘাত কবল। গিলগামেশ বন্ধুর প্রশংসা করল। লাঞ্ছিতা ইস্তার দেবী তখন এনকিদুর শরীর ব্যাধি দিয়ে ভরে দিলেন এবং তারই ফলে তার মৃত্যু হল।

বন্ধুবিয়োগ অত্যন্ত অধীর করল গিলগামেশকে। কোন নারীকে এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসে নি সে, যেমন বেসেছে এই বন্ধুটিকে। মর্মবেদনা বাঁশীর করুণ সুরে ফুকরে উঠল :

সখা মোর, ভাই মোর, মোরা দুই জনে
পর্বতশিখরে উঠি 'স্বর্গ-বৃষ' সনে
যুঝি তারে বধিযাছি। অবণ্যে শিকার
বন্য পশুযূথ আর শার্দুল দুর্বার
করিয়াছি এক সাথে—মৃত্যু অভিযান।
এ কি, সুপ্ত? বন্ধু, কেন মুদিত নয়ান?
কথা নাহি পশে কানে, চোখে নাই আলো,
প্রাণের স্পন্দন নাই, মুখখানি কালো।

নববধূর মত বন্ধুর মৃতদেহ দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ করলে সে অত্যন্ত আবেগভরে—তারপর সিংহের মত গর্জন করে উঠল।

দিবারাত্র বিলাপ করলে সে বন্ধুর জন্য, কিন্তু অন্তর তার কিছুতে শান্ত হল না। মৃত্যু? সে তো কোন দিন তাকে চিন্তায় আমল দেয় নি, মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে জীবনের অপরিহার্য পরিণাম রূপে। সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে সংগ্রামে যেন তার মৃত্যু হয় এই ছিল তার হৃদয়ের বাসনা। হোক মৃত্যু, বেঁচে থাক কীর্তি। যার কীর্তি আছে সে-ই তো অমর।

মানুষের আয়ু ক্ষীণ—গোনা তার দিন—
হোক কর্মবীর—সেও বুদ্বুদে বিলীন!...
যুদ্ধ কর প্রাণপণে নাহি কর ভয়,
ধরা মাঝে রবে কীর্তি, মৃত্যু যদি হয়।
সকলের মুখে-মুখে ফিরিবে সুনাম,
মরিয়াছে গিলগামেশ বিপুল-সংগ্রাম।

মৃত্যুর বাস্তব রূপের সংঘাতে মানস-কল্পনার কীর্তিসমুজ্জ্বল এই সুন্দর ছবিটি কোথায় মিলিয়ে গেল। কিসের কীর্তি? কি বা তার মূল্য, যদি জীবনের উৎস-মূল চিরদিন চোখের আড়ালেই থেকে গেল? প্রশ্ন জাগল, কোথা আছে মৃত্যুহীন প্রাণ, অনন্ত জীবন? সেই অফুরন্ত প্রাণের সন্ধানকেই গিলগামেশ করলে তার জীবনের মহাব্রত। খ্যাপার মত বেরিয়ে পড়ল, দেশে-বিদেশে সেই স্পর্শমণির খোঁজ করতে লাগল। দুর্গম পর্বত মরু-কান্তার পার হয়ে সে গেল সেই দেশে যেখানে সূর্য পরিভ্রমণ করেন নিশীথ রাত্রির অন্ধকারে, দিবালোক আবার দর্শন করবার আশা পরিত্যাগ করেই যেন। পথে-পথে জিজ্ঞাসা করে, তোমরা জান কি, কোথা আছে অনন্ত জীবন? তারা বলে:

কোথা যাও গিলগামেশ? বৃথা খোঁজ প্রাণ-উৎস-মূল,
যে জীবন চাও তাহা নহে লভিবার—ক'রো না কো ভুল।
মুঠা ভরি দেবতারা রাখি হাতে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মানুষের সাথীরূপে মরণেরে করেছেন দান!

ভোজ খাও গিলগামেশ, নিশিদিন আনন্দে কাটাও,
প্রমোদ উৎসবে মাতো, বেশভূষা পর—নাচো গাও।
চেয়ে দেখ শিশু তব স্নেহমাখা হাতখানি ধরে,
আলিঙ্গন-ডোরে বাঁধে পত্নী তব অনুরাগ ভরে।
মর্ত্য মানবের কর্ম—নিয়তি যে তাই,
ইহা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই।

কিন্তু এও কি সম্ভব? অজ্ঞান নির্বোধ মানুষের মত সে কি শুধু আমোদ-প্রমোদের ঊষর মরুমাঝে তার জীবন নিঃশেষিত করবে? যবনিকার অন্তরালে যে চিরপ্রীতি, চিরতৃপ্তি, চির-অমরতার নিত্য-স্বরূপ বিরাজমান, তার আবিষ্কার-অভিযান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হবে সে কেমন করে? তার এক পূর্বপুরুষের কথা মনে পড়ল—তিনি উৎনাপিস্‌তিম। অজর অমর এই মহাপুরুষ, জগতের প্রান্তদেশে মৃত্যুসাগরের পরপারে অবস্থান করেন। তিনি জানেন মৃত্যুর রহস্য। গিলগামেশ চলল সেই মহাপুরুষের কাছে। মৃত্যু-নদী পার হল সে পাটনীর নৌকায়। তারপর উৎনাপিস্‌তিমের সকাশে এসে নিবেদন জানাল—জিজ্ঞাসা করল, কিরূপে লাভ করা যায় অনন্ত জীবন। উৎনাপিস্‌তিম তখন তাঁর নিজের অমরত্ব লাভের কাহিনী বললেন। সুদূর অতীতে দেবতারা মানবজাতিকে ধ্বংস করবার সংকল্প করে পৃথিবীতে প্লাবন সৃষ্টির জন্য দেব-সেনাপতি এনলিলকে আদেশ দিয়েছিলেন। দৈবানুগ্রহে পূর্ব থেকে সংবাদ পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য উৎনাপিস্‌তিম একটি নৌকা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তারপর বাত্যা-দেবতা এনলিল যখন প্লাবন দ্বারা পৃথিবী নিমজ্জিত করলেন, তখন উৎনাপিস্‌তিম ও তাঁর পত্নী সেই বজরায় উঠে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। জীবকুলের বংশরক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতির এক-এক জোড়া পশুপাখী নৌকায় তুলে নিয়েছিলেন তাঁরা, এবং সেজন্যই প্রাণীজাতি ধ্বংস পায় নি।* পরে এনলিল তাঁর হঠকারিতার জন্য বিলক্ষণ অনুতপ্ত

* 'গিলগামেশ মহাকাব্যে'-র এই প্লাবন-কাহিনীর স্মৃতিকেই জিইয়ে রেখেছে বাইবেলের 'জেনেসিস' গ্রন্থ মহাপ্লাবনের ('The Deluge') বর্ণনায়। সেই বর্ণনা পড়লে বুঝতে কষ্ট হয় না যে নোয়া (Noah) আর কেউ নয়, স্বয়ং উৎনাপিস্‌তিম, তিনিও বজরা তৈরি করেছিলেন যাকে বলা হয়েছে Noah's Ark, আর প্লাবন-কালে সেই বজরায় এক-এক জোড়া পশুপক্ষী তুলে নিয়ে

হয়েছিলেন, এবং উৎনাপিস্‌তিমের মহৎ কার্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে দিয়েছিলেন অমরত্ব। কাহিনীটির বর্ণনা করে গিলগামেশকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি, যে ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার ফলে তিনি লাভ করেছিলেন অমরত্ব, সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হবার নয়। মর্ত্য-মানবকে তার মর-জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অমরত্বের সন্ধান বৃথা।

কিন্তু গিলগামেশ ক্ষান্ত হল না। সে মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকল্প করল। মৃত্যু মহানিদ্রা—নিদ্রা মৃত্যুর ক্ষুদ্র সংস্করণ। নিদ্রাকে জয় করতে পারলে তবে না গিলগামেশ মহানিদ্রাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। নিদ্রার ইন্দ্রজাল দিয়ে তাকে আচ্ছন্ন করলেন উৎনাপিস্‌তিম। কিন্তু নিদ্রাকে জয় করা দূরে থাক, গিলগামেশের নিদ্রা ক্রমে মহানিদ্রায় ঘনীভূত হতে বসেছিল, যা থেকে আর সে কখনো জেগে উঠত না। ঠিক সেই জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে উৎনাপিস্‌তিম-পত্নী দয়াপরবশ হয়ে তাকে নিদ্রা থেকে জাগরিত করলেন। হতাশ মনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল গিলগামেশ। তখন পত্নীর অনুরোধে সেই মহাপ্রবীণ তাকে একটি সঞ্জীবনী লতার কথা বললেন, যার জন্ম সমুদ্রগর্ভে, এবং যার রস পান করলে মানুষ পুনর্যৌবন লাভ করে। জীবনের উদ্দীপনা আবার জেগে উঠল গিলগামেশের মনে। উৎনাপিস্‌তিমের পাটনী উর্‌শনবীকে সঙ্গে নিয়ে গিলগামেশ চলল সেই সঞ্জীবনী লতার সন্ধানে, তারপর নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে বের করে সমুদ্রে ডুব দিয়ে লতা তুলে আনল। আবার চলল তারা নৌকায় রাজধানীর দিকে। পারস্যসাগরের উপকূলে নৌকা থেকে অবতরণ করে পদব্রজে চলল। দিনটা ছিল গরম, গিলগামেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তখন দেখল সে একটি সরোবর, শীতল জল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে, তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। লতাটি তীরে রেখে জলে নামল গিলগামেশ। মনের আনন্দে সন্তরণ করছে সে, তখন লতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে একটি সর্প এল সেখানে, এবং লতাটি মুখে তুলে নিয়ে অদৃশ্য হল। সেই লতার রস পান করেছিল বলে সর্পের মৃত্যু নেই, বৃদ্ধ হলে খোলস বদলিয়ে নবীন শক্তি লাভ করে। যে নবজীবন মানুষের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল গিলগামেশ, দৈব-বিড়ম্বনায় সেই অমূল্য নিধি মানুষের

পৃথিবীর প্রাণীকুলকে রক্ষা করেছিলেন। মহাপ্লাবনের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বিষয় সম্বন্ধে এই ইতিহাসের গোড়াতেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

অদৃষ্টে না জুটে সাপের ভোগে লাগল। গিলগামেশের মন বিষাদে ভরে উঠল। হায় রে, তার একনিষ্ঠ কঠোর ব্রতের পরিসমাপ্তি হল—ব্যর্থতার হাহাকারে!

বসি পড়ে গিলগামেশ
বেদনার নাহি শেষ
গণ্ড বেয়ে ঝরে আঁখিজল।
… …
মথিয়া দেহের পেশী
হৃদয়-শোণিত নাশি'
উর্‌শনবী, কি লভিনু ফল?

বিয়োগান্ত কাহিনী—কিন্তু ট্র্যাজেডির বিয়োগ-দশাকে অপরিহার্য রূপে গ্রহণ করবার প্রবৃত্তি নেই এখানে। সকল অনুভূতিকে বিদ্রূপ করেই যেন মর্মের অতৃপ্ত অসন্তোষ তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠছে—বৃথা, বৃথা এই জীবনের অভিযান!

জীবনের অভিযানই যখন একটা ব্যর্থ উদ্যম, তখন জীবনের নৈতিক মূল্য সম্বন্ধেও যে সংশয় দেখা দেবে তার আশ্চর্য কি? জীবনের অনিত্যতা বা অসারতার চিন্তা মানুষের মনে নানান বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি করে—যেমন 'এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম্' বা চার্বাক-বাদ, সংসার-বৈরাগ্য ইত্যাদি। সম্ভোগ-প্রবৃত্তি ও বৈরাগ্যভাব সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী প্রকৃতি, কিন্তু উভয়ের উৎপত্তির মূল কারণ একই—জীবনের নৈতিক মূল্যকে অস্বীকার করাই সেই কারণ। খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দে ব্যাবিলোনিয়ায় জীবনের অসারতা বোধ থেকে এমনি একটি নৈরাশ্যবাদ (pessimism) দেখা দিয়েছিল, যা ভাল মন্দ সব কিছুকেই আপন খুশি-খেয়ালমত সমর্থন করবার জন্য যুক্তির অবতারণা করেছে। 'নৈরাশ্যবাদীর সংলাপ' (Dialogue of a pessimist) বিষয়ক রচনাটি একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

'নৈরাশ্যবাদীর সংলাপ'

সংলাপটি প্রভু ও দাসের মধ্যে। প্রভু যেমন দাসের কাছে তার কোন একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, দাস অমনি নানান যুক্তি দ্বারা প্রভুর ঈপ্সিত

কর্মের সমর্থন করে। কিন্তু প্রভুটি অত্যন্ত খামখেয়ালী, দমকা হাওয়ার মত তাঁর মনের গতি—মনের ভাব ব্যক্ত করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবের পরিবর্তন ঘটে। দাসও তখন বিপরীত যুক্তি দিয়ে পূর্ব-সমর্থিত মত খণ্ডন করে, এবং প্রভুর নূতন মতের সমর্থনে নূতন যুক্তির অবতারণা করে। এমনি করে দেখানো হয়েছে, কোন বস্তুই স্বভাবত ভাল বা মন্দ নয়, বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিতও নয়। একই বস্তুর বিভিন্ন মূল্য ক্ষেত্র-বিশেষে দেখা যায়, সুতরাং কোন বস্তুরই সত্যকার মূল্য নাই। রচনাটি পদ্যে। কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

প্রভু বলে, 'শোন ভৃত্য—বাসিবারে চাই
ভাল এক ললনারে।'
'বাসিবেন তাই',
দাস কহে, 'দুঃখতাপ সব ভুলে নর,
সর্বজয়ী প্রেম যার কাঁধে করে ভর।'
'রাখ রাখ, দাস তব অলীক বচন',
প্রভু কহে, 'ভাল নাহি বাসিব কখন।'
দাস কহে, 'কভু নয়, ও পথে যেও না—
ফাঁদ পাতে নারী আর করে প্রবঞ্চনা।
লোহা দিয়ে গড়া নারী শাণিত কৃপাণ,
এক কোপে যুবকের নেয় সে গর্দান।'

এই তো গেল প্রেম। ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে এইরূপ :

প্রভু বলে, 'আন বারি পূত শুদ্ধাচারে,
করি আচমন দিব অর্ঘ্য দেবতারে।'
দাস বলে, 'বেশ কথা, কর অর্ঘ্য দান—
অন্তরে পাইবে শান্তি, হবে লাভবান,
ঋণ দিয়ে পাবে সুদ।'
'বাজে কথা রাখো',
প্রভু কন, 'শোন বলি, অর্ঘ্য দিব না কো।'
দাস কয়, 'ঠিক, অর্ঘ্য নাহি দিও কভু,
দেবতা হউক দাস, তুমি হয়ো প্রভু।

ছুটিবে তোমার পিছে দেবগণ যত
উচ্ছিষ্ট ভোজন তরে, কুকুরের মত।'

ধর্মাচার যেরূপ নিরর্থক, দানের মূল্যও তদ্রূপ :

প্রভু বলে, 'শোন কথা, ভরিয়া অঞ্জলি
কৃষকে সঁপিয়া দিব ঐশ্বর্য সকলি।'
দাস মাথা নেড়ে কয়, 'বেশ কর তাই—
দানে তুষ্ট দেবতারা, থাকে না বালাই।'
প্রভু কন, 'না, না, আমি দান করিব না।'
দাস কয়, 'কভু নয়, কিছুই দিও না।
ঐ যে ওখানে ছিল প্রাচীন নগর—
সেথা গিয়ে ওঠ ধ্বংসস্তূপের উপর।
কত না দেখিবে নর-কপাল করোটি,'
বলিতে কি পার কে বা দুষ্ট কে বা খাঁটি?'

মৃত্যুর পর সদাচারী ন্যায়নিষ্ঠ দানশীল মানুষ আর পাষণ্ড ব্যক্তির দশা একরূপ। ভাল-মন্দ কাজের স্মৃতি কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যায়—তখন শ্রেয়ের আর কোন মূল্যই থাকে না।

প্রভু কন, 'শ্রেয় নাই—বাঁচিয়া কি লাভ?
এস মোরা দুই জনে জলে দেই ঝাঁপ।'

নির্বিকারভাবে ভৃত্য বলে—

'স্বর্গ পরশিতে পারে কে বা দীর্ঘাকার?
বৃষ-স্কন্ধ কে বা লবে পৃথিবীর ভার?'

অর্থাৎ, মানুষ নিতান্তই দুর্বল, শক্তিবলে প্রকৃতির সমকক্ষ হবার যোগ্যতা তার নেই। এরূপ অবস্থায়, অনিবার্য নিয়তির হস্তে আত্মসমর্পণই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রভুর মত বদলে গেছে :

প্রভু কন, 'দাস মোর মরে কাজ নাই—
তুমিই মরিবে শুধু আমি তাই চাই।'
দাস কয়, 'হুজুরালি, তা তো চলিবে না,
আমি ম'লে তিন দিন তুমি বাঁচিবে না।'

জীবন একটা অর্থহীন মায়া-মরীচিকা—ফাঁকা শূন্য মাত্র। সত্যের মূল্য নাই, নিষ্ঠার মূল্য নাই, সৎকর্মের মূল্য নাই। এমনি নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিন্তা নীতিধর্মের মূলোচ্ছেদ করে ব্যাবিলোনীয় সভ্যতাকে আত্মহত্যার তমসাচ্ছন্ন অন্ধ পথে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। সে পথ অভিমন্যুর চক্রব্যূহের পথ, যার মধ্যে প্রবেশ করা যায় সহজেই, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে যে দার্শনিক দৃষ্টির প্রয়োজন হয়—যে দৃষ্টি-বলে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি বলেছিলেন 'অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়'—দর্শনতত্ত্বের সেই মহান উপলব্ধি জাগ্রত হয় নি ব্যাবিলোনিয়ায়। তথাপি সেখানকার নিস্তরঙ্গ অনুদ্বেল মৃতকল্প জীবন নব-নব সংস্কৃতির অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এক দিকে যেমন বলা যেতে পারে যে হিব্রুদের ধর্ম-কল্পনা ও নীতির বিকাশ ব্যাবিলোনিয়ার কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী, তেমনি এখানকার প্রভাব পারসীকদের জরথুস্ত্র ধর্মের উপরও পড়েছিল, এরূপ মনে করবার কারণ আছে।

॥ পাঁচ ॥

জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প

ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি বাণিজ্যিক সভ্যতার ফল, এবং সেই সভ্যতার সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবও জেগে ওঠে। তাই ব্যাবিলোনিয়ায় দেখি আমরা, ধর্মের চিরন্তন ধারার সঙ্গে অর্থ-লোভের আপস-রফার প্রচেষ্টা। বাণিজ্যের প্রয়োজনে গণিত সৃষ্টি হয়েছিল সেখানে, অঙ্কের তালিকা সুমেরীয় যুগেও পাওয়া গেছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। সেই গণিতকে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করে জ্যোতির্বিজ্ঞানেব ভিত্তি পত্তন করা হয়েছিল। কিন্তু গণিতের সৃষ্টি ও সংবৃদ্ধি সুমেরীয় যুগে হলেও তার পরিপূর্ণ সৌষ্ঠব দেখা গেছে খৃঃ পূঃ ২০০০ হতে ১২০০, এই আট শ' বছরের মধ্যে। গণিতের অধিকাংশ মাটির চাকতিগুলি এই সময়ে লেখা হয়েছিল। শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র ছিল ধর্মমন্দির, সেখানেই হত গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা। অক্ষর-পরিচয়, গণিত ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত ছাত্রদের। খনন-কার্যে একটি বিদ্যালয় আবিষ্কৃত হয়েছে, সেখানে দু হাজার বছরেরও আগেকার ছাত্রছাত্রীদের লেখা কয়েকটি মৃন্ময় চাকতি উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের স্কুলের শ্লেটের মতই চাকতিগুলিকে ব্যবহাব করা হয়েছিল শিক্ষার্থীদের লিখন অভ্যাসের জন্য। চাকতির ওপর কতগুলি ধর্মকথা কপি করা রয়েছে।

হাম্মুরাবির আইন উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা বিষয়ে ছিল বিশেষ সজাগ। মধ্যম শ্রেণীর দাবিকে পূর্ণ করবার একটি উপায় গণিতের চর্চা। উত্তরাধিকার-সূত্রে যে বিষয়সম্পত্তি লাভ করা যায়, সেই বিষয়কে বণ্টন করতে হলে, অথবা যখন অংশীদারদের সঙ্গে বা অন্য প্রকারে কারবার পরিচালনা করতে হয়, গণিতের প্রয়োজন দেখা দেয় তখনই। অতীত যুগের সুমেরীয় সংখ্যা-প্রণালীর (system of numerals) উদ্ভব হয়েছিল পুরোহিত বা 'পটেশী'দের তেমনি কোন বাণিজ্যিক বা বৈষয়িক বিভাগের প্রয়োজন থেকে। এই গণনা-প্রণালী একটু বিচিত্র ধরনের। আমাদের দেশে এক সময়ে হিসাব করা হত গণ্ডা বা কুড়ি হিসাবে—যেমন এক গণ্ডা, দু গণ্ডা, এক কুড়ি, দু কুড়ি। সুমেরীয় হিসাব ছিল তেমনি ষাট (৬০) সংখ্যাকে একক সংখ্যা (unit)-রূপে ধরে—যেমন দু ষাট (১২০), তিন ষাট (১৮০)

ইত্যাদি। এই সুমেরীয় 'ষষ্টিক গণনা-পদ্ধতি'ই (sexagesimal) বরাবর চলে এসেছিল ব্যাবিলোনিয়ায়। শুধু তাই নয়, সারা জগতেই এই পদ্ধতির একটি রকমফের চালু হয়ে গেছে—যেমন বৃত্তকে করা হয় ছয়টি ষাট ভাগে বিভক্ত, ঘণ্টাকে ষাট মিনিটে এবং মিনিটকে ষাট সেকেণ্ডে। তেমনি আবার সুমেরীয় ওজন 'মিনা' (mina) ছিল ষাট 'সেকেল' (shekel)-এ বিভক্ত। মিনার ওজন ঠিক এক পাউণ্ড। পাশ্চাত্য জগতে মিনাই শেষে পাউণ্ড নামে পরিচিত হয়েছিল, আর পাউণ্ড এখন সারা বিশ্বে ওজনের একটি পরিমাণ।

ব্যাবিলোনীয় লিখনে একক দশক ও শতকের স্বতন্ত্র আঙ্কিক চিহ্ন ছিল, যেমন এক অঙ্কের চিহ্ন V, দশকের চিহ্ন <, শতকের চিহ্ন V—। কিন্তু ষষ্টিক গণনা-পদ্ধতিমত এই একক চিহ্ন ৬০ সংখ্যাকে বোঝাত, অর্থাৎ একটি একক চিহ্ন ১×৬০, দুটি একক চিহ্ন ২×৬০ ইত্যাদি। ষাট সংখ্যার নিচের দিকটা ভগ্নাংশ, আর উর্ধ্বদিকে সংখ্যাকে ষাটের গোছায় আঁটি বাঁধা হল, আঙুল দিয়ে গুনবার প্রয়োজনকে বাতিল করে দিয়ে। গুণের নামতা (multiplication table) আবিষ্কৃত হয়েছিল সুমেরীয় যুগে। খৃঃ পূঃ চতুঃসহস্রাব্দের চিত্রলেখনাঙ্কিত একটি মৃৎখণ্ডে জরিপ দ্বারা কিরূপে ভূমির আয়তন নির্ধারণ করা যায়, সেই পদ্ধতির উল্লেখ আছে। হাম্মুরাবির যুগে উচ্চাঙ্গ গণিতশাস্ত্রের আরও উন্নতি হয়েছিল। বিভাজক সংখ্যাকে কোন সংখ্যার সঙ্গে গুণ করলে (reciprocal of the divisor) বিভাজ্য সংখ্যাটি পাওয়া যায় তারও একটি নামতা রচিত হয়েছিল (tables of reciprocals expressed as sexagesimal fractions)। কিন্তু গণনা-প্রণালী তখনো ত্রুটিশূন্য হয় নি। দশমিক ও শূন্যের ব্যবহার ছিল অপরিজ্ঞাত, তবে অনস্তিত্বব্যঞ্জক একটি কীলক-চিহ্নের ব্যবহার দেখা গেছে খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় অব্দের কয়েকটি লিপিখণ্ডে। বীজগণিতের আবির্ভাব হয় নি, কিন্তু বীজগণিতের কতগুলি ফরমুলার ফলের সঙ্গে ব্যবহারিক পরিচয় ছিল, এরূপ মনে করবার কারণ আছে। কতগুলি ভগ্ন চাকতি পাওয়া গেছে যা থেকে বোঝা যায় জ্যামিতির চর্চা ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃত্ত ও চতুর্ভুজ রেখা অঙ্কিত আছে, ফলাফল লেখা নেই। এরকম কতগুলি চাকতি বৃটিশ মিউজিয়মে রাখা হয়েছে, যার ওপর জ্যামিতির নানান উদাহরণ ধারাবাহিকভাবে

অঙ্কিত রয়েছে। গণিততত্ত্ববিদরা যাকে বলেন "Theorem of Pythagorus" তাও ব্যাবিলোনিয়ায় জানা ছিল বলে মনে হয়।

দিবারাত্রি নিয়মিতভাবেই আসে যায়, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, নদীর জোয়ার-ভাঁটা নিয়মিতভাবেই হয়ে থাকে। ঋতুর পর্যায় ও বর্ষের আবর্তনের মধ্যে যে বাঁধা-ধরা নিয়ম আছে, সেই নিয়মকেই ব্যাপকতরভাবে আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতির মধ্যে লক্ষ্য করেছে মানুষ দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণের ফলে। এইরূপ পর্যবেক্ষণের একটি বিশেষ অর্থনৈতিক কারণও ছিল। কৃষির ওপর নির্ভরশীল সমাজে শস্যবীজ বপন, শস্য সংগ্রহ, ভূমির জলসেচন প্রভৃতি বিষয়ে কাল নিরূপণের জন্য জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। দেব-দেবী কৃষিনির্ভর সমাজের অঙ্গবিশেষ, তাই পূজা-পার্বণের সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। যুগ যুগ ধরে অক্লান্তভাবে আকাশের পানে চেয়ে গ্রহনক্ষত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন ব্যাবিলোনীয় পণ্ডিতেরা। যন্ত্রপাতি ছিল না তাঁদের, তবু অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা, এবং সেই আবিষ্কারগুলিকে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। খৃঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দের চাকতি-লেখনগুলি থেকে জানা যায়, সেই অতিপ্রাচীন কালেও আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পর্যবেক্ষণ-কার্য ভালরূপেই চলেছিল। জিগগুরাট বা মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া প্রেক্ষণাগার (observatory)-রূপে ব্যবহার হত। খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দেও নক্ষত্রগুলিকে রাশিচক্রের দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্র ও গ্রহাদির পথেই সূর্য বিচরণ করে এবং এই পথটি দ্বাদশ রাশির চক্রের মধ্যে ৩০° ডিগ্রি হিসাবে বিভক্ত—এ তথ্যও তখন অজানা ছিল না। খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে ব্যাবিলোনীয়রা বুধ গ্রহের উদয়াস্তের কাল নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাম্মুরাবির যুগের পর ক্যাসাইটদের আক্রমণ জ্যোতির্বিদ্যার প্রগতিকে প্রায় হাজার বছর কাল আটকে রেখেছিল। কিন্তু নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের রাজত্বকালে ব্যাবিলোনীয় জ্যোতির্বিদ্যা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। পুরোহিত-বৈজ্ঞানিকেরা তখন সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ প্রভৃতির গতি, গ্রহণের ক্ষণ নির্ধারণ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। নক্ষত্র ও গ্রহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য তখন যেমন পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি হয়েছে এমনটি পূর্বে কখনো হয় নি। ব্যাবিলোনিয়ায় জ্যোতির্বিদ্যার

অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারগুলির উল্লেখ করে অধ্যাপক টয়েনবি বলেছেন: "This exciting Babylonic discovery had much the same effect as the recent Western Scientific discoveries have had upon the discoverer's conception of the Universe." অর্থাৎ এইসব চাঞ্চল্যকর ব্যাবিলোনীয় আবিষ্কারের ফল হয়েছিল, যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি আবিষ্কারকের বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে ধারণার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, ঠিক তেমনি। এখানে বলে রাখা দরকার যে পরবর্তী কালে গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন করেছিল জ্যোতির্মণ্ডলের এই ব্যাবিলোনীয় আবিষ্কারসমূহ।

'সপ্ত গ্রহ-পর্যায়'—মাস সপ্তাহ বার

মিশরের মত এখানকার বৃহৎ মন্দিরগুলির মুখ খুব সম্ভব পূর্ব দিকে ফিরানো ছিল, অর্থাৎ যে দিকে সূর্যের উদয় হয় সেই দিকে। প্রবেশ-দ্বারের মুখ পূর্ব দিকে নির্মাণ করা—যাকে বলা হয় 'orientation'—তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে বলেই অনেকে মনে করে থাকেন। সূর্য ও বিবিধ নক্ষত্রের সঙ্গে মন্দিরস্থ দেবতাদের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশেই ঐরূপ নির্মাণপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল। আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধির সঙ্গে মন্দিরস্থ দৈবশক্তির কোন রহস্যাত্মক সম্বন্ধ অথবা ঐন্দ্রজালিক সংযোগের (magical association) কল্পনা করেছিলেন ব্যাবিলোনীয় পুরোহিতেরা। বরসিপ্‌পা নামক স্থানে যে বৃহৎ সাততলা জিগ্‌গুরাট বা মন্দির ছিল তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সপ্ত গ্রহ-পর্যায়' (The Stages of the Seven Spheres)। সাততলার প্রত্যেকটি তলাকে সপ্তগ্রহের এক একটি গ্রহের নামে উৎসর্গ করা হয়েছিল। সাতটি বিভিন্ন বর্ণ ছিল সাতটি গ্রহের দ্যোতক বা চিহ্ন—যেমন সর্বনিম্নতলা ছিল কৃষ্ণবর্ণ, শনি গ্রহের প্রতীক; দোতলা শ্বেতবর্ণ, ধ গ্রহের প্রতীক ইত্যাদি। সাতরঙা সাতটি তলা রবি সোম প্রভৃতি সাতটি দিনেরও দ্যোতক। মন্দিরে জলের ঘড়ি বা water-clock (clepsydra) অথবা সূর্য-যন্ত্র (sun-dial) রাখা হত, যেমন দেখা যায় আমাদের দেশের মানমন্দিরসমূহে।

সুমেরীয়রা কাল নিরূপণের যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল, পরবর্তী কালেও

তার বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় না। মাসের গণনা করা হত চন্দ্রের তিথি ধরে (lunar month)। প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা, পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা —অর্থাৎ অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা এক মাস রূপে গণ্য হত। এমনি করে চন্দ্রের তিথি ধরে মাসের গণনা বৎসরের সমাবর্তন-কালের সঙ্গে সংগতি রেখে চলতে পারে না, কেননা চান্দ্রমাসিক দিবসের সংখ্যা অল্প হবার জন্য বর্ষ পূরণে স্বভাবতই কয়েকটি দিন ঘাটতি পড়ে থাকে। সেই ঘাটতিকে পূরণ করতে হয় যথাসময়ে বছরের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত মাস জুড়ে দেবার ব্যবস্থা করে। হাম্মুরাবি একটি পরোয়ানায় গোটা মাসকে বাতিল করে বৎসরের দ্বিতীয় মাস থেকে বছর শুরু করবার আদেশ দিয়েছিলেন, সেই পরোয়ানা এবং খৃস্ট পূর্ব ২০০০ অব্দেরও আগেকার ব্যাবিলোনীয় পঞ্জিকা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সৌরমাসিক গণনা, অর্থাৎ ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বৎসর, স্থূলভাবে এই তথ্যটি সেখানে অজানা ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন চান্দ্রমাসিক গণনাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সুমেরীয়দের ভ্রমত্রুটিপূর্ণ এই গণনাপ্রণালী যেমন চলেছিল ব্যাবিলনে, তেমনি ইহুদি ও পারসীকরাও পেয়েছিল তা উত্তরাধিকার-সূত্রে। প্রাচ্য দেশের ইহুদি ও মুসলমানেরা আজও এই প্রণালীরই অনুসরণ করে থাকে। এই প্রণালীমত বৎসর গণনার নাম 'চান্দ্র বাৎসরিক প্রথা'। বৎসর নির্ধারণ করি আমরা খৃস্টের জন্ম-বর্ষের পূর্বের বা পরবর্তী বৎসরগুলি গণনা করে। খৃস্টীয় জগতের বহির্ভাগে রাজার রাজ্যাভিষেকের কাল থেকে বর্ষ গণনার প্রথা প্রচলিত ছিল, যেমন আমাদের বিক্রম সংবৎ। ব্যাবিলোনিয়ায় অতিপ্রাচীন সুমেরীয় যুগ থেকেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার নাম করে বৎসরের নামকরণ হত—আমরা যেমন এখনো বলি দামোদর বন্যার বছর, মন্বন্তর আকালের বছর।

মাসকে সপ্তাহে ও সপ্তাহকে বারে বিভক্ত করবার কৃতিত্ব সর্বপ্রথম দেখা যায় ব্যাবিলোনিয়ায়। সাত দিনে সপ্তাহ, প্রতিটি দিনের সঙ্গে এক একটি গ্রহকে সংযুক্ত করা হল, এবং প্রত্যেকটি গ্রহ হলেন কোন-না-কোন দেব-দেবীর প্রতীক, যেমন শনি গ্রহের সঙ্গে যুক্ত হলেন ব্যাবিলোনীয় মড়ক-দেবতা নিনিব, বৃহস্পতির সঙ্গে ব্যাবিলোনীয় দেবতা মারদুক (রাজা), রবির সঙ্গে ব্যাবিলোনীয় দেবতা সামাস (সূর্যদেব), শুক্রের সঙ্গে ব্যাবিলোনীয় দেবী

ইস্‌তার ইত্যাদি। গ্রহনক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করে ব্যাবিলোনীয় জ্যোতির্বিদরা সঠিকভাবে নানান তথ্য নিরূপণ করেছিলেন, এমন কি ১৮ বৎসর ১১⅓ দিন অন্তর এক একটি সূর্যগ্রহণ ঘটে, 'সারোনিক পর্যায়কাল' (Saronic Cycle) নামে এই বৃত্তান্তটি তাঁরাই আবিষ্কার করেছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছিল গ্রীকরা ব্যাবিলোনীয়দের কাছ থেকে, এবং তারই ফলে গ্রীক দার্শনিক থালিস (Thales) সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে।*

'সামুদ্রিক বিদ্যা'—অদৃষ্ট গণনার বিবিধ প্রণালী

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে আর একটি শাস্ত্র দেখা দিয়েছিল, আমাদের দেশে যাকে বলে জ্যোতিষ বা 'সামুদ্রিক বিদ্যা' (astrology)। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ পূর্ব থেকে গণনা করে বলা চলে, তার কারণ জ্যোতির্মণ্ডলে সব রকম গতিবিধিই একটি অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলার অনুসরণ করে—তেমনি জীবন্ত ও জড়জগৎকে সমানভাবেই বেঁধে রেখেছে সেই শৃঙ্খলা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মত মানুষের জীবনও নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, সে নিয়মের নড়চড় হয় না কখনো। ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে প্রত্যেক জিনিস অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়ানো রয়েছে—একই সুরে বাঁধা সব, একটি তার বেজে উঠলে অন্য তারগুলিও সব ঝংকার দিয়ে ওঠে। এই যখন প্রকৃতিজগতের অবস্থা, তখন নক্ষত্রের আবির্ভাব তিরোধান, জন্মকালের রাশি-নক্ষত্র মানুষের সারা জীবনকে প্রভাবান্বিত করে—মানুষের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মানো স্বাভাবিক। জ্যোতির্মণ্ডলের চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির সঙ্গে অদৃষ্ট-বাদকে জড়ানো হয়েছিল এই বিশ্বাসের ফলে। মানুষকে মোহাবিষ্ট করে

* গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের আদিগুরু থালিস (৬৪০-৫৪৮ খৃঃ পূঃ) ছিলেন ভূমধ্যসাগর-তীরবর্তী মিলেটাস নামক গ্রীক উপনিবেশের নাগরিক। তাঁর সম্বন্ধে জার্মান দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর এডোয়ার্ড জেলার তাঁর *History of Greek Philosophy* গ্রন্থে লিখেছেন, "His mathematical and astronomical knowledge, acquired in Phoenicia and Egypt and transplanted to Greece are likewise celebrated, among the proofs given of this, the most famous is that he predicted the solar eclipse which occurred in 585 B. C."

রেখেছে অদৃষ্টবাদ তিন হাজার বছরেরও ঊর্ধ্বকাল, সে মোহ আজও সম্পূর্ণ কাটে নি। কুসংস্কার বিষয়ে ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার সমান হতে আর কোন সভ্যতাই পারে নি। অদৃষ্ট গণনার নানান রকম অদ্ভুত প্রণালী বের করেছিল ব্যাবিলোনীয় পুরোহিতরা। স্বপ্নের বিচিত্র ব্যাখ্যাসমূহ আধুনিক মনস্তত্ত্বের অনেক আজগুবি আবিষ্কারকেও হার মানায়, গুডিয়ার স্বপ্ন-বিবরণে তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। বলিদান করা হয়েছে যে জন্তুকে, সেই জন্তুর যকৃত পরীক্ষা করে কর্মের শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা হত। যকৃতে নাকি কতগুলি দাগ দেখা যায়, সেই দাগই শুভাশুভ সূচনা করে। যকৃতের দাগগুলি দেখে ফলাফল বিচার না করে কোন রাজাই যুদ্ধযাত্রা করতেন না। দীর্ঘকাল পরেও এই প্রথা রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রথাকে বলা হয় Hepatoscopy—এ ছাড়া আর একটি পদ্ধতি ছিল, তৈল দ্বারা ভবিষ্যৎ-দর্শন, divination by oil. এক পাত্র জলে এক ফোঁটা তেল ঢেলে দেখা হত, তেল ছড়িয়ে পড়ে কিরূপ আকার ধারণ করে। এইরূপে অতিপ্রাকৃতিক বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাখ্যার দ্বারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সকল দশাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছিল। ব্যাবিলোনিয়ার অনেক কুসংস্কার আজ আমাদের কাছে কৌতুকপ্রদ মনে হতে পারে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, কি প্রাচীন কি আধুনিক সকল প্রকার সভ্যতার পিছনে রয়েছে ইন্দ্রজালের ব্ল্যাক আর্ট, আর কুসংস্কার ও যাদুমন্ত্রের পুতুলনাচ, যা থাকবে মানুষের চিরসহচর হয়ে।

যেমন মিশর তেমনি ব্যাবিলোনিয়ায়ও চিকিৎসা-বিদ্যার বিলক্ষণ প্রসার ঘটেছিল। ব্যাধি সম্বন্ধে আদিম বিশ্বাস এই যে, মানুষ ব্যাধিগ্রস্ত হয় ভৌতিক উপদ্রবের ফলে—মানুষের রোগ দেখা যায় যখন তাকে ভূতে পায়—অর্থাৎ কোন অপদেবতা তাকে আশ্রয় করে। সেই অপদেবতার দূরীকরণের জন্য ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা আছে আদিম সমাজে। এইরূপ ইন্দ্রজাল থেকেই চিকিৎসা-বিদ্যার জন্ম। প্রাচীন সুমেরীয়দের ধারণা ছিল এই যে, প্রত্যেকটি ব্যাধি নিজেই একটি অপদেবতা—যেমন বলা হয়েছে 'চক্ষুর ব্যাধি বলে না আমি চক্ষু-ব্যাধি' 'জ্বরের হাতে বন্দী হয়েছি আমি যাদুবলে, জ্বরমুক্ত কর আমায়'। ব্যাধির অপদেবতাকে দূর করবার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা

করত চিকিৎসকেরা (medicine-men), কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে মন্ত্র-শক্তিকে অস্বীকার করা হয়েছে। বস্তুত চিকিৎসা-বিদ্যাকে তখনো ওঝাগিরি বা ইন্দ্রজাল (magic) থেকে পৃথক করা হয় নি। প্রত্যেকটি রোগেরই একটি ঔষধের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যাকে এমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত করা হয়েছিল ধর্ম-চর্চার সঙ্গে যে, দ্রব্যগুণের চেয়ে ওষধির ভূত-তাড়ানো ঐন্দ্রজালিক শক্তির ওপরই অধিকতর জোর দেওয়া হত। অপদেবতার প্রকোপ থেকে ব্যাধির উৎপত্তি, এই যে আদিম বিশ্বাসটি ব্যাবিলোনীয়দের মনে ছিল বদ্ধমূল তার কবল থেকে আধুনিক যুগেও সভ্য সমাজ উদ্ধার পায় নি—এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

ভাস্কর্য

সুমেরীয়দের আর্ট—ভাস্কর্য ও স্থপতি বিদ্যা—সেই অতি প্রাচীন যুগেও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাদের আর্ট ছিল জীবন্ত ও মৌলিক, কিন্তু অসম্পূর্ণ ও সৌষ্ঠববিহীন। পরবর্তী কালে ব্যাবিলোনিয়ায় সেমেটিকদের যে আর্ট দেখা দিয়েছিল, তার ওপর সুমেরীয় প্রভাব ছিল প্রচুর। তেমনি প্রভাব যুগের পর যুগ অতিক্রম করে আসিরীয় আর্টের জন্মাবধি তার ওপরও বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কি ব্যাবিলোনীয় কি আসিরীয় আর্ট—এ দুটির কোনটিই সুমেরীয় যুগের উৎকৃষ্ট প্রস্তরমূর্তিগুলির সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিপুণ শৈলী-পর্যায়ে উঠতে পারে নি। স্থূল প্রারম্ভ থেকে কারুশিল্পের অতিসূক্ষ্ম চমৎকার পরিণতি পর্যন্ত ক্রমবিকাশের সবগুলি ধাপই সুমেরীয় শিল্পে দেখা যায়। সুমেরীয় আর্টে ছিল সূক্ষ্ম নিপুণ রেখাঙ্কনের খোদাই, কিন্তু তার মধ্যে সাজের শোভা (decorative) ছিল না তেমন, যেমন ছিল আসিরীয় আর্টে।

সুমেরীয় আর্ট চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল লাগাসের নৃপতি গুডিয়ার রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৪৫০)। এই প্রজানুরক্ত রাজার কীর্তিমুখর শাসনের অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। তাঁর রাজত্ব শেষ হবার অল্পকাল পরেই ব্যাবিলনের সাম্রাজ্যবিস্তার-পর্ব আরম্ভ হয়েছিল। সমৃদ্ধি ও শিল্পের উৎকর্ষ বিচার করে উত্তরপুরুষেরা তাঁর রাজত্বকালকেই লাগাসের ‘স্বর্ণযুগ’ বলে গেছেন। একখানা শিলালিপিতে লেখা আছে, সিরিয়ার সাগরকূলের পাহাড় এবং আরব দেশ থেকে পাথর ও

কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হত, তাম্র আনা হত ইলামের তাম্রখনি থেকে। পাথরের খোদাই মূর্তি তৈরি করা হত, তেমনি তামা গালিয়ে ঢালাই (casting) করে মূর্তি তৈরি করেছে ধাতু-শিল্পীরা, আর সেই মূর্তিকে মন্দিরের ভিতের তলে প্রোথিত করে রাখা হয়েছে (foundation figures)। তামার ঢালাই-করা বৃষ ও ছাগ-মুণ্ডের মূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলিতে ঝিনুক (mother of pearl) ও নীলা-পাথরের (lapis lazuli) কাজ করা। নিনগিরসুর মন্দিরে গুডিয়া একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন, তার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান। এই পাত্রের চার কোনায় এক একটি প্রস্তরনির্মিত সিংহমস্তক। শিল্প-সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা এই মূর্তি, যা দেখে অশোকস্তম্ভের সিংহমূর্তিকে মনে পড়ে। তবে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার, এই অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিলেন গুডিয়া অশোকের দুই হাজার বছরেরও ঊর্ধ্বকাল পূর্বে। গুডিয়ার কালে নির্মিত মনুষ্যমূর্তিগুলি কি আকারে কি ভাবের ব্যঞ্জনায় ব্যাবিলোনীয় ও আসিরীয় শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশে মঙ্গলঘট বা মঙ্গলকলসকে সহকার-শাখা দিয়ে সাজিয়ে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। সুমেরীয় মন্দির-ভাস্কর্যে তেমনি পত্রশোভিত ঘট বা কলস (vases of sprouting water) বহু স্থানে খোদিত দেখা যায়।

আক্কাডীয় সেমেটিক যুগের কয়েকটি ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে সুসা নগরে সারগনের একটি স্মৃতিস্তম্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যোদ্ধৃ-বেশে সারগনের একটি প্রতিমূর্তি দেখা যায় সেই স্তম্ভের ওপর খোদাই করা, দীর্ঘবিলম্বিত শ্মশ্রু সারগনের, পরিচ্ছদ কর্তৃত্বেরই পরিচায়ক। লাগাসের রাজা এয়ানাটুমের নির্মিত শকুনি-স্তম্ভ বা Stele of the Vultures-এর বিবরণ পাঠকের স্মরণ থাকতে পাবে। সারগনের স্তম্ভটি সেই জাতীয়, এবং এখানেও আমরা দেখতে পাই দেবতা জাল বিস্তার করে শত্রুদের ধরেছেন আর তাদের মাথায় গদাঘাত করছেন। এইসব স্তম্ভের প্রতিকৃতিগুলি ছিল মামুলি ধরনের (conventional), কিন্তু সারগনের পুত্র নারাম-সিন যে জয়স্তম্ভটি নির্মাণ করেছিলেন তার মূর্তিগুলির বিন্যাস ও ভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য সুমেরীয় ভাস্কর্যে পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। তবে চোঙাকৃতি সিলমোহরে (cylindrical seals) রেখাঙ্কন-পদ্ধতির মধ্যে অমনধারা বিশেষত্বপূর্ণ শৈলীর ইতিপূর্বেই আবির্ভাব হয়েছিল।

সুমেরের প্রাচীন শিল্পের বিবরণ একটু বিস্তারিতভাবেই দেওয়া হল এখানে,যেহেতু পরবর্তী কালের শিল্পশৈলী পূর্বেকার সেই আঙ্গিকেরই পরিণতি। শিল্পের ধারার পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে এবং সেইজন্য এখানে ইতিহাসের অবতারণা করতে হয়। ব্যাবিলন নগরের ধ্বংসস্তূপগুলি খনন করে শিল্পের নমুনা-স্বরূপ যেসব বস্তু উদ্ধার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, তার কোনটিই ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য-যুগের নয়। বহু শতাব্দী পর ব্যাবিলনে যখন আসিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেই সাম্রাজ্য-ধ্বংসের পর ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের যখন নবজন্ম হয়েছিল, এখানকার আর্টের নিদর্শন-গুলিও সব সেই সময়কার। আসিরিয়ার সম্রাট সেন্‌নাচেরিব (খৃঃ পূঃ ৭০৫-৬৮১) প্রাচীন ব্যাবিলন শহরটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলেন। তিনি সেখানকার একখানা ইট বা এক টুকরো পাথরও অবশিষ্ট রাখেন নি, খালের
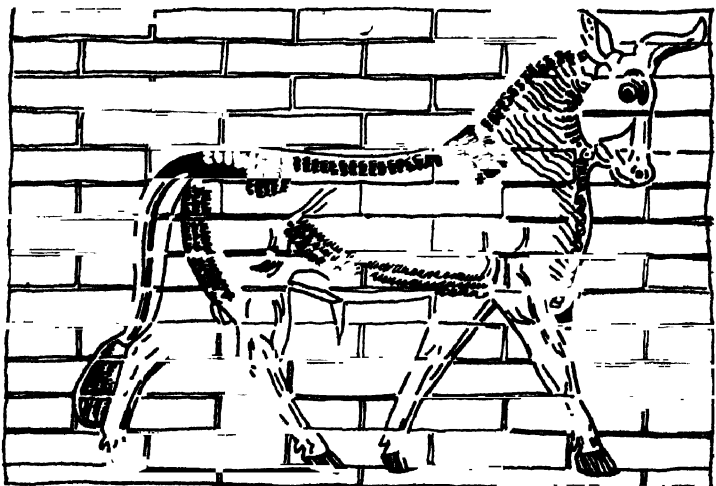
ইস্‌তার ফটকে এনামেল-করা ইঁটের ওপর অঙ্কিত বৃষ-মূর্তি

মুখ ঘুরিয়ে নদীর জলধারায় শহরটিকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আসিরিয়ার প্রবল পরাক্রম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। সে শক্তি যখন ভেঙে পড়ল এবং সেমাইটরা আবার দক্ষিণাঞ্চল ক্যালডীয়া (Chaldea) থেকে এসে ব্যাবিলোনিয়ায় একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করল—যার নাম ক্যালডীয় বা নব-ব্যাবিলোনীয় (Chaldean or Neo-Babylonian) রাজ্য—তখন ব্যাবিলন নগর আবার

রাজধানীর গৌরব লাভ করল, আর সেই সঙ্গে নগরটিকেও নূতন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। নগরের পুনর্নির্মাণের কাজ ক্যালডিয়ান রাজা নেবুকাড্-নেজ্জার-এর আমলেই (খৃঃ পূঃ ৬০৪-৫৬১) খুব জোরের সঙ্গে চলেছিল। যেসব কারুশিল্প দিয়ে নগরকে ভূষিত করেছিলেন তিনি, তার অনেক বস্তুই আসিরীয়ার নকল, কিন্তু জাঁকজমক ও চাকচিক্যে তাঁর সেই নকল সৃষ্টি আসলকেও অতিক্রম করেছিল। ইস্‌তার দেবীর নামে ব্যাবিলনের নগর-তোরণ নির্মাণ করেছিলেন তিনি (Ishtar Gate)। সেই তোরণের প্রাচীরে এনামেল-করা ইঁটের ওপর সিংহ, বৃষ ও মকরের চিত্র দেখতে
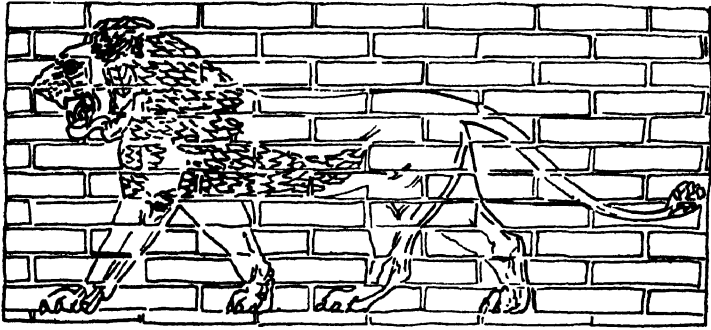
এনামেল-করা ইঁটের ওপর অঙ্কিত সিংহ-মূর্তি—
ইস্‌তার ফটকের উত্তরে গোপন পথের পাশে

পাই আমরা। হিসাব করে দেখা গেছে যে, ওরকম ৫৭৫টি জীবের চিত্র অঙ্কিত ছিল তোরণের প্রাচীরের ও চূড়ার ওপর এবং সেগুলি এমন-ভাবে সাজানো যে, যেমন কেউ নগরে প্রবেশ করেছে অমনি তার মনে হয়েছে যেন তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যই সকল জন্তু একসঙ্গে এগিয়ে আসছে।

স্থাপত্য

স্থাপত্য বা গৃহনির্মাণ বিদ্যা (architecture) সুমেরীয় যুগ থেকে শুরু করে আড়াই হাজার বছর নিরবচ্ছিন্ন ক্রমোন্নতির পথে চলেছিল। কিউনি-ফরম বা বাণমুখো লিখনপদ্ধতির সৃষ্টিকর্তা যেমন সুমের, তেমনি গৃহ ও

মন্দিরকে সুনির্দিষ্ট রূপদান, আর স্তম্ভ, খিলান (vault), তোরণ (arch) নির্মাণও আরম্ভ করেছিল সেই দেশ। নিপ্‌পারে একটি খিলান-করা ড্রেন আবিষ্কৃত হয়েছে ৫০০০ বছর আগেকার। উরের রাজকীয় সমাধির খিলান-গুলি খৃঃ পূঃ ২৫০০ অব্দের। আদিযুগের ইমারত রোদে শুকানো কাঁচা ইঁটে তৈরি, পরে চুল্লীতে পোড়ানো ইঁটের ব্যবহার দেখা গেছে। ব্যাবিলনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নগরপ্রাকার সুদৃঢ় করা ও দুর্গনির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ব্যাবিলনের বেষ্টনী-প্রাচীরের বর্ণনা গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস লিখে গেছেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্ণনায় আছে, প্রাচীরের মাথায় দুই সারি ছোট ঘর মুখোমুখি সাজানো ছিল, মাঝের স্থানটি এতই প্রশস্ত যে সেখানে চারটি রথ ঘুরতে পারত। প্রাকারটিকে প্রশস্ত করার উদ্দেশ্য সামরিক। প্রাচীরের যে-কোন স্থানে আক্রমণ হলে সেখানে দ্রুত সৈন্য পাঠানো সম্ভব হত।

ব্যাবিলোনিয়ার নদীতীরের নগরগুলিতে প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজন ছিল, শুধু যে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তা নয়। আর একটি ভয়ংকর শত্রু ছিল যার নাম প্লাবন। মানবিক শত্রুর মত প্লাবন থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও স্থাপত্যের আদর্শের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিল্পীর দৃষ্টি স্থাপত্যের শোভা-সৌন্দর্যের দিকে তেমন ছিল না, বৃহৎ আকার ও উচ্চতাই ছিল লক্ষ্য। সে তৈরি করত সু-উচ্চ মেঝের ওপর প্রতিষ্ঠিত 'পাহাড়ের মত' (like a mountain) জিগ্‌গুরাট। ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের যুগে যেসব দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলিও ছিল বিরাট। দুর্গ কেবল সৈন্যদের বাসস্থানরূপেই ব্যবহার হত না, সপরিষদ রাজন্যবর্গের আশ্রয় ছিল দুর্গ। নগরের বহিঃপ্রাচীর শত্রুর আক্রমণে যদি কখনো ভেঙে পড়ত, তা হলে রাজা পরিবার-জন সঙ্গে নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতেন। এই দুর্গেই ছিল রাজকীয় ভাণ্ডার ও তোশাখানা এবং জাতীয় অস্ত্রাগার (national armoury and arsenel)। দুর্গের প্রাকার কিরূপ সুদৃঢ় করে নির্মাণ করা হত, ধ্বংসস্তূপ থেকে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই ছিল এক সারি পোড়া ইঁটের দেয়াল, তারপর পরিখা (moat), পরিখা-প্রান্তে পাকা দেয়াল, তারপর ইঁট-পাথর প্রভৃতির কুচি (rubble) এবং সর্বশেষে ভিতর দিকের দেয়াল।

'ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান' ও 'ব্যাবেলের টাওয়ার'

ব্যাবিলোনীয় শিল্পের পূর্ণ পরিণতি দেখা দিয়েছিল আসিরিয়ায়, বিপুলায়তন সিংহ-বৃষ মূর্তি পরিশোভিত প্রাসাদগুলির মধ্যে। সেই শিল্পের কথা আমরা আসিরিয়া প্রসঙ্গেই বলব। আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংসের পর নব-ব্যাবিলোনীয় রাজ্যে শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়ে নূতন রূপে দেখা দিয়েছিল—নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের ইস্‌তার ফটকের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের আর একটি কীর্তি 'ব্যাবিলনের ঝুলন্ত বাগান' (Hanging garden of Babylon)। এই 'ঝুলন্ত বাগান' সম্বন্ধে কিছু না বললে শিল্প-বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইস্‌তার ফটকের পিছন দিকে ছিল বিশাল রাজপ্রাসাদ ও সরকারী অফিসসমূহ। তার পরেই দেখা যেত নগরদেবতা মারদুকের মন্দিরের সু-উচ্চ চূড়াদেশ—সম্ভবত এই চূড়াকেই বাইবেলে 'ব্যাবেলের টাওয়ার' (Tower of Babel) বলা হয়েছে।* ইস্‌তার ফটকের সামনেই অর্ধাচন্দ্রাকৃতি খিলানের সারি ধাপে ধাপে উঠে গেছে রাজপ্রাসাদের গগনস্পর্শী ছাদের ওপর। সেই ঢালু খিলানের সারি পুরু পলিমাটি দিয়ে সমাচ্ছন্ন করে তার ওপর জন্মানো হয়েছিল নানান রকমের গাছগাছড়া একেবারে প্রাসাদের ছাদের সমতল পর্যন্ত। বিটপী লতা-মণ্ডপের পত্রপুষ্পের শোভায় স্থানটি ছিল মনোরম। এখানকার সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায় রাজা তাঁর মহিষী ও সখীদের নিয়ে অবসর বিনোদন করতেন। এই বাগানের খ্যাতি ছিল এমন যে গ্রীকরা এটিকে পৃথিবীর 'সপ্তম আশ্চর্য' বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন কিন্তু বাগানের নির্মাণকৌশলকে অসাধারণ বলে প্রতিপন্ন করতে পারে নি।

---

* বাইবেলের 'জেনেসিস' গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে 'ব্যাবেলের টাওয়ার' কি অবস্থায় ও কিরূপে নির্মিত হয়েছিল তার বর্ণনায় বলা হয়েছে : সারা বিশ্বজনের ছিল একই ভাষা। বাসের জন্য সিনার-ভূমিতে এসে তারা স্থির করল একটি নগর প্রতিষ্ঠা করবে, আর পাকা ইঁটের এমন একটি মিনার (tower) নির্মাণ করবে যার ওপর চড়ে স্বর্গারোহণ কাজটি সহজেই নিষ্পন্ন হবে। ঈশ্বর মানুষের এই দম্ভ চূর্ণ করবার জন্য তাদের মধ্যে যোগসূত্র-স্বরূপ এক ভাষাকে ভেঙে দিয়ে বহু ভাষার সৃষ্টি করলেন। তখন ভাষা-বিভ্রাটের দরুন একের কথা অন্যের পক্ষে হল দুর্বোধ্য। নির্মাণ-কার্যে বিষম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ফলে 'টাওয়ার'টি শেষ হয় নি, মানুষের অদৃষ্টেও আর টাওয়ারে চড়ে স্বর্গলাভ ঘটে নি!

তৃতীয় খণ্ড

আসিরিয়া ও ক্যালডিয়ান বা নব-ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য

॥ এক ॥

আস্থর ও নিনেভের আদিপর্ব

প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে আসিরীয় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ব্যাবিলোনীয় ইতিহাসের একটি ক্রোড়-অঙ্ক রূপেই বর্ণনীয়। কারণ, আসিরিয়ার অভ্যুত্থানের পূর্বে আক্কাডীয় ও হাম্মুরাবির যুগে আসিরিয়া যেমন ছিল একটি অধীন রাজ্য,* তেমনি পতনের পর আসিরিয়ার যখন অস্তিত্বই লুপ্ত হয়ে গেল, তখন ক্যালডীয় (Chaldean) রাজগণের অধিনায়কত্বে ব্যাবিলন আবার একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্যাবিলোনিয়ার দীপ্তি ছিল নক্ষত্রের মতই স্তিমিত, কখনো জ্বলে কখনো বা নিবে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে ছিল একটি পূর্বাপর ধারাবাহিকতা, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সাংস্কৃতিক জগতেও তেমনি, এবং তারই অভাব আসিরিয়ার উত্থানকে উল্কার রূপ দান করে মহাশূন্যে বিলীন করেছিল এমনভাবে যে পতনের পর তার আর চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না।

ব্যাবিলনের তিন শ' মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর উপকূল ও জাগ্রোস পর্বতের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডের নাম আসিরিয়া। এই ভূখণ্ডটির আয়তন ৭৫০০০ বর্গমাইল, ৩৫০ মাইল দীর্ঘ আর ১৭০ থেকে ৩০০ মাইল পর্যন্ত চওড়া। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম ভাগে টাইগ্রিস নদীর দক্ষিণ তীরে 'আস্থর' নামে একটি নগর স্থাপিত হয়েছিল, যা থেকে দেশের নাম হয়েছে আসিরিয়া। 'আস্থর' শব্দটির অর্থ, 'সুজলা সমতল ভূমি' ('well-watered plain')। সিরিয়া ও আসিরিয়া নাম দুটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও দেশ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক,

* "Assyria (Asshur) was the northernmost of the city-states into which the homeland of the Sumeric Society came to be articulated...... In this age (third millennium B. C.) when the Assyrians were pioneers and traders, Assyria was not a military power......The militarism of which Assyria has become a by-word belongs to a later phase of Assyrian history which did not begin until long after the history of the Sumeric Society had come to an end." (A. J. Toynbee's *Study of History*, Vol. I, p. 111)

সে কথা বোধ করি বলা অনাবশ্যক। আসিরিয়ার পশ্চিম দিকে সিরিয়া অবস্থিত—পূর্বকালে সে অঞ্চলের নাম ছিল খাটটি-ভূমি (Land of Khatti)। এখন যেখানে মোসুল-এর তৈলখনি তারই নিকট টাইগ্রিস নদীর পরপারে নিনেভে নামে আর একটি নগর গড়ে তোলা হয়েছিল—তা ছাড়া আরও দুটি প্রধান শহর ছিল কালা ও আরবেলা। আসিরিয়ার উত্তরে ও আরারাট পর্বতের দক্ষিণে দুইটি বৃহৎ হ্রদ, একটির নাম ভ্যান, অপরটি উরুমিয়া। আরমেনিয়ার এই অঞ্চল ইতিহাসে নাইরি-ভূমি (Land of Nairi) ও উরারটু নামে পরিচিত। এখানকার প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের সঙ্গে আসিরিয়ার দ্বন্দ্বকলহ বরাবর চলে আসছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন-কার্যে আসুরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গেছে, যা থেকে এখানকার সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। নিনেভের নিকট টেপি-গওরা (Tepi Gawra) নামক স্থানে একটি সাম্প্রতিক খনন-কার্যে খৃঃ পূঃ ৩৭০০ অব্দের প্রাচীন শহর আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেখানে পাওয়া গেছে মন্দির ও সমাধি ছাড়াও সভ্যতার বিবিধ উপকরণ, যেমন কারুখচিত চোঙাকৃতি সিলমোহর (cylindrical seals), অলংকার আর পৃথিবীর প্রাচীনতম দ্যূতক্রীড়ার পাশা (dice)। ভস্মীভূত নগর আসুরের অঙ্গারস্তূপের তলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, আসিরিয়ার আদিম অধিবাসীরা সেমেটিক জাতীয় মানুষ ছিল না, তারা ছিল সুমেরীয়দেরই জ্ঞাতি মেডিটারেনিয়ান জাতীয়, এবং তাদের সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ সুমেরীয়। সুমের দেশের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে, প্রস্তরযুগের শেষে সেখানে নূতন সংস্কৃতির বর্তিকা হাতে নিয়ে এক নব আগন্তুক দলের আবির্ভাব হয়েছিল। সমসাময়িক কালের আসিরিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হতে পারে, সুমের দেশের সংস্কৃতি এখানে না এসে হয়তো বা এখানকার সংস্কৃতিই সুমের দেশে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু এরূপ অনুমানের বিশেষ প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে সিন্ধু দেশে ও পাঞ্জাবের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহ প্রাগ্-ইতিহাসের ওপর যে রশ্মিসম্পাত করেছে, তা থেকে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে, সিন্ধু-সভ্যতাই জগতের প্রাচীনতম সভ্যতা, এবং এই অঞ্চল অথবা কোন নিকটবর্তী স্থান থেকে সুমের দেশে তাম্রযুগের নূতন সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল। তা-ই যদি হয় তবে আদিকালের আসিরীয়

সংস্কৃতিরও উৎপত্তি-স্থান যে সিন্ধু-পাঞ্জাব অঞ্চল, সে বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

স্থমের দেশের মত আসিরিয়ায়ও নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আস্থর ছিল তেমনি একটি নগর-রাষ্ট্র, 'পটেশী' বা 'পূজারী রাজা' কর্তৃক শাসিত। সেখানকার মন্দিরগুলির ভগ্নস্তূপ থেকে পটেশীদের নামাঙ্কিত ইঁট খুঁড়ে বের করা হয়েছে। প্রাচীনতম নাম খৃঃ পূঃ ১৮০০ অব্দের ইস্‌মি-দাগন ও তাঁর পুত্র সামাস-আদাদ, এই দুইজন পটেশীর। নাম দুটি সেমেটিক। ব্যাবিলন ও আক্‌কাডের মত এখানেও সিরিয়ার মরু অঞ্চল থেকে যাযাবর সেমেটিকদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এবং কালক্রমে এই জাতির প্রাধান্য ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংমিশ্রণ সমগ্র আসিরিয়াকে একটি সেমেটিক দেশে রূপান্তরিত করেছিল। এই হিসাবে আসিরিয়াকে ব্যাবিলোনীয় কাহিনীরই প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, সেমেটিক প্রাধান্য সত্ত্বেও প্রাচীন সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয় নি, বরঞ্চ সেমেটিকরা দেশীয় আচারপদ্ধতিকে গ্রহণ করে পুরাতন সংস্কৃতির জীর্ণ দেহে বলের সঞ্চার করেছিল।

আসিরিয়া ও ব্যাবিলন—দীর্ঘ দ্বন্দ্ব-বিরোধের কাহিনী

আততায়ী পরিবৃত আসিরিয়া—উত্তরে ও পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য উপজাতিগণের উপদ্রব, পশ্চিমে মরুবাসী যাযাবরদের হানা, আর দক্ষিণে পরাক্রান্ত ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য—চার দিকের অসহনীয় চাপে পড়ে নিতান্তই আত্মরক্ষার জন্য সামরিক শক্তির চর্চা নিরন্তর করতে হয়েছিল আসিরিয়াকে। তথাপি পরাক্রান্ত শক্তিরূপে অভ্যুত্থানের প্রথম সোপানে আরোহণ করতে তার দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে মিশরের ফারাও দিগ্বিজয়ী বীর তৃতীয় থাটমোস প্যালেস্টাইনে মেগিড্‌ডোর যুদ্ধে জয়লাভ করবার পর, 'আস্থর-সর্দার' ('Chieftain of Assur')-এর নিকট ৫০টি সিডার বৃক্ষ, ১৯০টি অন্যান্য গাছ, কয়েক শত রথ প্রভৃতি নানা দ্রব্যসম্ভার কর-স্বরূপে (tribute) গ্রহণ করেছিলেন। থাটমোসের এই বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, আসিরিয়ার অধিপতি তখন একজন 'সর্দার' মাত্র, এবং তিনি ছিলেন এতই দুর্বল ও হীনবীর্য যে স্থদূর আস্থরের আপেক্ষিক নিরাপত্তা সত্ত্বেও প্রতাপ-প্রবল ফারাওর আধিপত্য বিনা যুদ্ধে শিরোধার্য করেছিলেন।

কিন্তু পরবর্তী তিন শ' বছরের মধ্যে আসিরিয়ার এই নির্বীর্য শক্তিহীনতা প্রভূত পরিমাণে দূরীভূত হয়েছিল। ব্যাবিলনের ক্যাসাইট রাজা কারা-ইন্দাস-এর রাজত্বকালে আসিরিয়ার সঙ্গে ব্যাবিলনের একটি সীমানা-বিরোধ দেখা দিয়েছিল (খৃঃ পূঃ ১৪২৫), আর সেই সূত্রে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয় ব্যাবিলন-রাজ কারা-ইন্দাস ও আসুর-রাজ আসুর-রিম-নিসেসু-র মধ্যে। তারপর খৃঃ পূঃ ১৩৮৫ অব্দে আসুরাধিপ পুজুর-আসুর-এর সঙ্গে অনুরূপ আর একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন ব্যাবিলন-রাজ বুরনা-বুরিয়াস। এইভাবে তিন শতাব্দ ধরে মাঝে মাঝে দেখতে পাই আমরা ব্যাবিলনের সঙ্গে আসিরিয়ার পর্যায়ক্রমে বিরোধ, কখনো বা সামরিক সংঘর্ষ, আর তার পরক্ষণেই মীমাংসা —এবং সেই সঙ্গে যখন লাভ-ক্ষতির ওজনে আসিরিয়াকেই অধিকতর লাভবান হতে দেখা যায়, তখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে আসিরিয়ার সামরিক শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করছিল।

আসিরিয়া-রাজ পুজুর-আসুরের উত্তরাধিকারী আসুর-উবালিট মিশরের ফারাও ইখনাটনের সমসাময়িক। ফারাওর কাছে বিশ 'মানে' (maneh) ওজনের স্বর্ণ দাবি করে পত্র দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র থেকে আসিরিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে মিশরের অবনতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। বুরনা-বুরিয়াসের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন আসুর-উবালিট। বুরনা-বুরিয়াসের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রের সিংহাসন আরোহণকালে বিদ্রোহ দেখা দিল, এবং তার ফলে নবাভিষিক্ত রাজা যখন নিহত হলেন, তখন আত্মীয়-নিধনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আসুর-উবালিট সামরিক অভিযান দ্বারা ব্যাবিলন অধিকার করলেন। তারপর বুরনা-বুরিয়াসের অন্য একটি পুত্র তৃতীয় কুরিগজলু-কে সিংহাসনে স্থাপন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু আসিরিয়ার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন বা হৃদ্যতা দীর্ঘকাল অটুট রাখেন নি কুরিগজলু। আসুর-উবালিটের মৃত্যুর পর আসিরিয়া আক্রমণ করলেন তিনি, কিন্তু যুদ্ধে আসিরিয়া-রাজ প্রথম এনলিল-নিরারি-র কাছে পরাজিত হয়ে নিজ রাজ্যের কিয়দংশ তাঁকে সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। কিছুকাল পর ব্যাবিলন রাজ্যের আরও কিছু অংশ খসে পড়েছিল যখন কুরিগজলুর পুত্র নাজি-মারুতাসকে পরাভূত করেছিলেন আসিরিয়াধিপ প্রথম আদাদ-নিরারি। কিন্তু ব্যাবিলনের সব চেয়ে বড় পরাভব ঘটেছিল দ্বিতীয় কাসটেলিয়াস-এর

রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ১২৬৩-১২৫৬), আসিরিয়া-রাজ টুকুল্‌তি-নিনিব যখন রাজধানী অধিকার করেছিলেন। টুকুল্‌তি-নিনিবের মৃত্যুর পর ব্যাবিলন কিরূপে আবার স্বাধীন হয়ে উঠেছিল, আর কিরূপেই বা আসিরিয়া-রাজ এনলিল-কুতুর-উস্থর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিহত হয়েছিলেন—ব্যাবিলনের ইতিহাস আলোচনার শেষ পর্যায়ে সেই বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, স্থতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বস্তুত আসিরিয়ার ইতিহাসে পট পরিবর্তন হয়েছে ঘন ঘন। কখনো রাজা কখনো দাসরূপে দেখা দিয়েছে আসিরিয়া, যুদ্ধে কখনো হয়েছে তার রুধিরাক্ত বিজয়, কখনো বা মোক্ষম পরাজয়। আক্‌কাডের সারগন ও ব্যাবিলনের হাম্মুরাবি আসিরিয়াকে রেখেছিলেন পদানত করে, সে তো প্রাচীন কালের কথা। তার ছয় বা সাত শতক পরেও দেখা যায়, হিটাইটরা একাধিকবার আসিরিয়া আক্রমণ করেছে, সে দেশ ছিল তখন দুর্বল। এমন কি, নিকট প্রতিবেশী মিটানির আর্য রাজাদের উপদ্রব থেকেও অব্যাহতি পায়নি আসিরিয়া। মিটানির রাজা দুশরত্ত (Dushratta) বা দশরথ এক সময় নিনেভে নগর অধিকার করেছিলেন, তার ইঙ্গিত আছে মিশরীয় ফারাও তৃতীয় আমেনহটেপের নিকট লিখিত একটি পত্রে। নিনেভের নগর-দেবী ইস্‌তারের মূর্তি উপহার-স্বরূপে ফারাওকে প্রেরণ করেছিলেন মিটানি-রাজ। পত্রে বলা হয়েছে : "পূজনীয়া ইস্‌তার দেবী আমার পিতৃপুরুষের রাজত্বে বসবাস করেছিলেন। তখন দেবীকে বিপুলভাবে সম্মানিত করা হয়েছিল। ফারাও যেন সেই সম্মানের দশগুণ সম্মান প্রদর্শন করে দেবীর সংবর্ধনা করেন।" নানান ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে একরকম দোলাচল অবস্থা হয়েছিল আসিরিয়ার ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জাতীয় জীবনের মৃত্যু তো ঘটেই নি, বরঞ্চ উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করে আসিরিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন করতে সক্ষম হয়েছিল তিন শতক কালের মধ্যে।

নগর-রাষ্ট্রগুলির একীকরণ : প্রথম সালমানেসার ও প্রথম টিগলাথ পিলেসার

আসিরিয়ার নগর-রাজ্যগুলিকে একীকরণের কৃতিত্ব প্রথম সালমানেসার-এর। তাঁর রাজত্বকাল ১৩০০ খৃস্ট পূর্বাব্দের কিছু পূর্বে। আস্থর ও নিনেভের

নিকটেই কালা নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। তাঁর পুত্র ব্যাবিলন-বিজয়ী টুকুল্‌তি-নিনিব, তাঁর সেই বিজয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে ব্যাবিলন অধিকার করে সাম্রাজ্যবিস্তারের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করেন তিনিই। একটি অঙ্গুরীয় প্রস্তুত করেছিলেন তিনি, তার ওপর খোদাই করা হয়েছিল এই কটি কথা—"কার তুনিয়াস (অর্থাৎ ব্যাবিলোনিয়া) বিজয়ী" (Conqueror of Kar-Duniyash)। এই আংটিটি তিনি ব্যাবিলনে রেখে এসেছিলেন। অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাবিলন সেটিকে স্মৃতিচিহ্নরূপে রক্ষা করে। ছয় শতাব্দ পরে আসিরিয়া-রাজ সেন্‌নাচেরিব অঙ্গুরীয়টি উদ্ধার করেন। পূর্বপুরুষের কীর্তির এই প্রাচীন অভিজ্ঞানটিকে এতই মূল্যবান মনে করেছিলেন তিনি যে তার ইতিবৃত্ত বিশদভাবেই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

আসিরিয়ার উত্তর-পূর্বে দুটি বৃহৎ হ্রদ—ভ্যান ও উরুমিয়া। এখন এই প্রদেশটির নাম খুর্দিস্তান, পৃথিবীর শীতপ্রধান স্থানের অন্যতম। সমুদ্র থেকে ৪০০০ ও ৫০০০ ফুট উচ্চে হ্রদ দুটি অবস্থিত। ভ্যান হ্রদের পশ্চিমে টাইগ্রিস নদীর দুরধিগম্য উৎপত্তি-স্থানে পাহাড়ের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি সহ একটি রাজার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপির বিবরণ এইরূপ : "আসুর সামাস রমান মহৎ দেবগণের কৃপায়, আমি আসুরাধিপ টিগলাথ পিলেসার পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত নাইরি-ভূমি তিনবার জয় করেছি।" এই শিলালিপিই আসিরিয়া কর্তৃক উত্তরাভূমি বিজয়ের প্রথম নিদর্শন, মূর্তিটিও প্রস্তরে উৎকীর্ণ আসিরীয় শিল্পের প্রথম নমুনা। প্রথম টিগলাথ পিলেসারের রাজত্বের (খৃঃ পূঃ ১১২০-১১০০) প্রথম পাঁচ বৎসরের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে এই শিলালিপিতে। তিনি বলেছেন, "যুদ্ধে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। আমি আসিরিয়ার ভূমির আয়তন ও প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি।" দেখা যায়, ইতিপূর্বেই আসিরিয়া রাজ্য টাইগ্রিসের পশ্চিম কূল অতিক্রম করে বহু দুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। টিগলাথ পিলেসার হিটাইট উপজাতিদের বিশ সহস্র সৈন্য সমেত পাঁচজন নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ইউফ্রেটিসের উর্ধ্বদেশ পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলসমূহে কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন তিনি। অলংকারবর্জিত ভাষায় দৃঢ় গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন : "রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ অবধি বেয়াল্লিশটি দেশের অধিপতি-

গণকে আমার হস্ত পরাজিত করেছে। আমি তাদের এক ভাষায় কথা বলতে বাধ্য করেছি, তাদের জামিন (hostages) গ্রহণ করেছি, এবং তাদের ওপর কর স্থাপন করেছি।" উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল জয় করবার পর রাজত্বের শেষভাগে দুইটি যুদ্ধ অভিযানে তিনি ব্যাবিলন ও অন্যান্য শহর অধিকার করেছিলেন।

টিগলাথ পিলেসার ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ শিকারী। ৯২০টি সিংহ শিকার করেছিলেন তিনি। দিগ্বিজয় ও শিকারই তাঁর একমাত্র কীর্তি নয়। তিনি বলেন, "আমি প্রজাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করেছি, শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে তারা।" পার্বত্যভূমির বন্য ছাগ, মৃগ প্রভৃতি সংগ্রহ করে পশু প্রজনন-কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন তিনি, আর অরণ্যজাত সিডার ও অন্যান্য গাছগাছড়া রোপণ করে রাজপ্রাসাদ ও উদ্যানসমূহের শোভা বর্ধন করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই চমৎকার একটি চিড়িয়াখানা নির্মাণ করেছিলেন। জীব-জন্তু সংগ্রহের দিকে তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল এমনি যে মিশরের ফারাও যখন তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিদর্শন-স্বরূপ উপহার দিতে চাইলেন, তিনি তখন তাঁকে একটি বৃহৎ জল-জন্তু—অর্থাৎ নীল নদীর কুমীর— প্রেরণ করতে বলেছিলেন।

বিজিত দেশসমূহ নির্মমভাবে ধ্বংস করবার যে বর্বর পদ্ধতি আসিরীয় সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস দুরপনেয় কালিমায় কলঙ্কিত করেছে, সেই অপকীর্তির প্রথম অভিব্যক্তি টিগলাথ পিলেসারের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। দিগ্বিজয়ের বর্ণনায় তিনি এইরূপ দম্ভোক্তি করেছেন, "নগর বিধ্বস্ত করে নাগরিকদের প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছি আমি। অগ্নিদাহে নগর ধ্বংস করেছি। আদানসের পর্বতবাসীরা পাহাড় থেকে অবতরণ করে আমার পদতলে লুটিয়ে পড়েছে।" বর্বরোচিত নিষ্ঠুর কর্মের নির্লজ্জ প্রশস্তি কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, আসিরীয় সম্রাটদের আত্ম-কাহিনীগুলিতে, ক্রমশ তা প্রকাশ পাবে। আমরা কিন্তু বিস্মিত না হয়ে পারি না যে, টিগলাথ পিলেসারের মত দুর্ধর্ষ রাজার বিরুদ্ধেও ব্যাবিলন বিদ্রোহ করেছিল, তাঁর সৈন্যদের পরাস্ত করে লুণ্ঠিত মন্দিরগুলি থেকে দেবতাদের বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল। টিগলাথ পিলেসারের মৃত্যুকালে গর্ব করবার মত কোন গৌরবই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর

জীবনের এই উত্থান-পতনের মধ্যেই আসিরীয় সাম্রাজ্যের গোটা ইতিহাস প্রতিবিম্বিত।

বাইবেলের প্রফেট ইসায়া (Isiah) কাব্যের ভাষায় বলেছেন—"অসংখ্য জনগণের সে কি কলরব ! সে গর্জন সাগরগর্জনেরই মত। অগণিত জাতি-সমূহের সে কি উদ্দাম চাঞ্চল্য ! সে চঞ্চলতা যেন চলোর্মির মত।" আসিরিয়া-রাজের পরাক্রমকে উপলক্ষ করেই প্রফেট কথাগুলি বলেছিলেন। প্রকৃতই আসিরিয়ার বিস্তার সাগরতরঙ্গের মতই উদ্দাম বেগে ছড়িয়ে পড়ত, তারপর আসত সেই বিস্তারকে সংকুচিত করবার পর্যায়। ব্যাবিলন ও নিনেভে—একটি ইঁটের তৈরি, অপরটি প্রস্তরনির্মিত শহর—রাজ্যের রাজধানী হত কখনো বা ইউফ্রেটিস তীরে ইঁটের শহর ব্যাবিলন, আর কখনো বা টাইগ্রিস-কূলের পাথুরে শহর নিনেভে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই আসিরিয়ার সামরিক শক্তি ভয়ংকররূপে বর্ধিত হয়েছিল।

॥ দুই ॥

সাম্রাজ্যের বিস্তার

প্রথম টিগলাথ পিলেসারের মৃত্যুর পর থেকে দুই শত বৎসর আসিরিয়ার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, হিটাইট সাম্রাজ্য কিরূপ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, কিরূপে সিরিয়া গ্রাস করে মিশর-রাজ দ্বিতীয় রামেসিসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। সেই প্রবল-প্রতাপ হিটাইট সাম্রাজ্যের ইতিমধ্যেই পতন ঘটেছিল, এবং সেই সঙ্গে সিরিয়াও নানান ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়কার সিরিয়ার অধিবাসীরা ছিল 'আরামিয়ান' (Aramean) নামে সেমেটিক গোষ্ঠী। তাদের রাজধানী দামাস্কাস পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীতে যেসব পুরাতন শহর অক্ষুণ্ণ গৌরবে আজও বর্তমান, সেই শহরগুলির মধ্যে দামাস্কাসই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। সিরিয়ার আরামিয়ানগণ ছিল অতি সুসভ্য জাতি, ব্যবসা-বাণিজ্য লিখনবিদ্যায় পারদর্শী। খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দেও লিখনে বর্ণমালা (alphabet) ব্যবহার করত তারা। সুদীর্ঘ চার শতাব্দ ধরে সিরিয়ার এই আরামিয়ানরা আসিরিয়ার পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল।

সিরিয়ার আরামিয়ান রাজ্য

সিরিয়ায় আরামিয়ানদের ছিল দুইটি রাজ্য—হামাল্ট (Hamalt) ও দামাস্কাস। আসিরিয়ার রাজা আসুর-নসির-পালের কাছে নতি স্বীকার করল হামাল্ট, কিন্তু দামাস্কাস রইল মাথা উঁচু করে। বাইবেলের বর্ণনায় দেখা যায়, ইসরায়েল-রাজ ডেভিড আরামিয়ানদের অধিপতি হাদাদাজেরকে পরাস্ত করে দামাস্কাস অধিকার করেছিলেন। তারপর সম্রাট দ্বিতীয় সারগনের দিগ্বিজয়ের ফলে, আসিরীয় সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের তটপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। আরামিয়ানগণ তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল বটে, কিন্তু তাদের জাতীয় সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। আসিরীয়রা সামরিক জাতি, যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই কালযাপন করত, ব্যবসা-বাণিজ্য লেখাপড়ার কাজ সবই ছিল আরামিয়ানদের ওপর ন্যস্ত। বস্তুত বিস্তৃত বাণিজ্যের প্রভাবে আরামাইক ভাষা আরব্য মরুপ্রান্তের সকল দেশগুলিতেই প্রচলিত হয়েছিল।

এমন কি, আসিরীয় সমাজেরও অধিকাংশ লোকই ঐ ভাষায় কথা বলত। প্যালেস্টাইনে আরামাইক ভাষা হিব্রুর স্থান অধিকার করেছিল। বহু শতাব্দী পর হয়েছিল যিশু খৃস্টের জন্ম। তিনিও কথা বলেছেন আরামাইক ভাষায়। এক হাজার বছরেরও উর্ধ্বকাল ধরে যিশুর কথিত ভাষাই প্যালেস্টাইনে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে আরামাইক ভাষাও লুপ্ত হল, আর সেখানে দেখা দিল আরবী ভাষা। উত্তর গ্যালিলি প্রদেশে আরামাইক ভাষা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে, সে আজ মাত্র পাঁচ শ' বছরের কথা।

দামাস্কাস ছাড়াও পশ্চিমাঞ্চলে আসিরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল আর একটি শহর। এই আরামীয় শহরটির নাম সামাল (Samal)। ধ্বংসস্তূপ খনন করে শহরটির আকার ও প্রকার সম্বন্ধে নানান তথ্য জানা গেছে। অর্ধ মাইল চওড়া ছিল শহরটি। পাথরের ভিত্তির ওপর রৌদ্রে শুকানো ইঁটের স্থূল প্রাকার দিয়ে বেষ্টিত নগরী, প্রাচীরের ওপর প্রত্যেক ৫০ ফিট অন্তর এক একটি চূড়া—নগর-বেষ্টনীর চারধারে সর্বসমেত ছিল ১০০টি গম্বুজ। শহরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পাহাড়ের ওপর রাজার দুর্গ অবস্থিত, আর সেই দুর্গের চারধারে নগর-প্রাচীর পর্যন্ত স্থানটিতে ছিল নাগরিকদের বসতবাড়ি। রৌদ্রে শুকানো ইঁট দিয়ে তৈরি এইসব গৃহ। এখন আব সেগুলি নেই, ধ্বংস পেয়েছে।

ব্যাবিলনের সর্বনাশ আসিরিয়ার পৌষমাস

এদিকে ব্যাবিলনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। সে দেশ তখন সিরিয়ার আরামিয়ানগণ কর্তৃক অধিকৃত, এবং 'সুটু' নামক যাযাবর জাতি কর্তৃক উপদ্রুত। নানান অবস্থাবিপযয়ের মধ্যে একটির পর একটি ব্যাবিলোনীয় রাজবংশের আবির্ভাব ও তিরোধান চলেছিল। সেইসব নৃপতিরা ছিল ইতিহাসের বুদ্বুদ, মায়া-মরীচিকা, পটভূমিকায় কোন আঁচড়ই রেখে যায় নি। তারপর দশম খৃস্ট পূর্বাব্দে আমাদের দৃষ্টি আবার যখন আসিরিয়ার ওপর নিবদ্ধ হয়, কৃষ্ণযবনিকার অন্তরালমুক্ত নিনেভে নগরী তখন পূর্ণযৌবনা রূপসী, আর তারই সন্তান আসিরীয় সিংহকে দেখা যায় বেশ সতেজ, বলদৃপ্ত ও বুভুক্ষু। সামরিক সংগঠন-কার্যে পূর্ণ উদ্যম দেখে মনে হয়, কোন ক্ষাত্রবীর্যসম্পন্ন নূতন নৃপতিবংশ তখন সিংহাসন অধিকার করেছিল।

আমরা জানি, ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার আদিযুগের নগর-রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস ছিল কতগুলি ধারাবাহিকতাবর্জিত অসম্বদ্ধ বিবরণ মাত্র। সেই বিবরণগুলিকে একত্রিত করেও ঘটনাপরম্পরার সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত সত্যই একটি দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু এখনকার পর্যায়ের যেসব ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে তাই থেকে ইতিহাসের পারম্পর্য ও ঘটনার অগ্রগতির পথ অনায়াসেই আমরা নির্দেশ করতে পারি, এবং সেই সঙ্গে কালপঞ্জীর ধাপে ধাপে রাজন্যবর্গের আবির্ভাব ও তিরোধানের ব্যাপারও সঠিকভাবে বর্ণনা করা চলে।

'লিম্‌মু'-বিবরণী

আসিরিয়ার ইতিহাসের ধারাবাহিক জ্ঞান লাভ করি আমরা 'লিম্‌মু' ('limmu')-গণের তালিকা থেকে। 'লিম্‌মু' কথাটা সম্ভবত তালিকা প্রস্তুত-কারীদের একটি বিশেষ পদবী। প্রাচীন প্রথামত প্রতি বৎসর নৃপতি কর্তৃক একজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতেন, যিনি সারা বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করতেন। রাজার রাজত্বকালের হিসাবে বৎসর গণনা করে লেখা হত: 'সালমানেসার-এর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে লিম্‌মু অমুক' ইত্যাদি। দেখা যায় রাজা নিজেও লিম্‌মু হতেন রাজত্বকালে অন্তত একবার। এইরূপ লিম্‌মু-তালিকা প্রস্তুত প্রথা কতকাল প্রাচীন তা আমরা জানি না। প্রাচীনতম আবিষ্কৃত তালিকা খৃঃ পূঃ ৯০০ অব্দের। চারটি লিম্‌মু-তালিকার চাকতি উদ্ধার করা হয়েছে। ৯০০ থেকে ৬৬৬ খৃস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত দুই শতাধিক বৎসরের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে, চাকতি চতুষ্টয়ের বিবরণ সংকলন করে। এ কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বাইবেলে বর্ণিত আসিরিয়ার রাজন্যবর্গের প্যালেস্টাইন ও মিশর অভিযানগুলির পূর্ণ সমর্থন এইসব লিম্‌মু-বিবরণীতে (Table of Eponyms) পাওয়া যায়।

আসুর-নাজির-পালের আত্মপ্রশস্তি

খৃঃ পূঃ দশম শতাব্দের মধ্যভাগে আসিরিয়ার নূতন রাজবংশের তৃতীয় নৃপতি দ্বিতীয় টুকুল্‌তি নিনেব-এর উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর পুত্র আসুর-নাজির-পালের একটি বিবরণে। টাইগ্রিস নদীর উৎপত্তি-স্থানে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ

প্রথম টিগলাথ পিলেসারের যে প্রতিমূর্তির কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তারই পাশে টুকুল্‌তি নিনেব নাকি নিজের প্রতিমূর্তি সহ একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সেই নিদর্শনটি এখন আর নেই। সম্ভবত তাঁর রাজ্যটি দূর-বিস্তৃতই ছিল, কিন্তু নব নব দিগ্বিজয় দ্বারা আসিরিয়ার পূর্বগৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর পুত্র আসুর-নাজির-পাল। তাঁর রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৮৮৪-৮৬০। সুদীর্ঘ বিবরণীতে আত্মপ্রশস্তি করেছেন তিনি এইরূপ: "আমি ভূপতি, প্রভু, গরীয়ান, শক্তিমান, পূজনীয়, বিরাট, অগ্রণী, মহাবল, কঠিন, পুরুষসিংহ, মহাবীর—আসুর-নাজির-পাল, পরাক্রান্ত নৃপতি আসুরাধিপ।" সগর্বে নিজেকে তিনি 'নগর-ধ্বংসকারী' 'শত্রুধ্বংসকারী' বলে প্রচার করেছেন। প্রথমেই আমরা পাই উত্তরে আরমেনিয়ায় নাইরি-ভূমির পর্বতবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা। এই অভিযান পর্বতবাসীদের আসিরিয়ার ওপর হানা বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল কিনা, সঠিক বলা যায় না। সে যেমনই হোক, যেরূপ নির্মম নৃশংসতার সঙ্গে এই যুদ্ধ চালানো হয়েছিল, বিশেষত নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় বিজেতার মনের যে আত্মপ্রসাদের ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে—তা বাস্তবিকই ন্যক্কার-জনক। তিনি নিহত আততায়ীদের ছিন্ন মুণ্ডগুলি স্তূপীকৃত করে পিরামিড তৈরি করেছিলেন। হতভাগ্য নগরাধিপকে আরবেলায় নিয়ে গিয়ে জীবিতাবস্থায় তার চামড়া ছুলে ফেলেছিলেন, এবং সেই চামড়া নগর-প্রাচীরের গায়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন তিনি। আর একজন রাজ্যাধিপেরও সেই অবস্থা হয়েছিল। বর্ণনায় বলা হয়েছে : "আমি তার নগরদ্বারের সমুখে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছি। যেসব অভিজাতবর্গ বিদ্রোহী হয়েছিল আমি তাদের গায়ের চামড়া ছুলে, সেই ত্বক দিয়ে স্তম্ভটিকে আবৃত করেছি, কতগুলি ব্যক্তিকে প্রাচীরের অভ্যন্তরে পাষাণ দিয়ে গেঁথেছি, কতগুলিকে বা প্রোথিত দণ্ডের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছি (impaled on stakes)।" বন্দীদের হস্ত-পদ-নাসিকা-কর্ণ ছেদন করে স্তূপাকারে রাখা হত, তাদের চক্ষু উৎপাটিত করা হত, বালক-বালিকাদের অগ্নিদগ্ধ করা হত। এই নিষ্করুণ উৎকট বীভৎস রসাস্বাদের যা কিছু সামান্য পরিবর্তন, তা দেখা যায় শুধু লুণ্ঠিত বা করলব্ধ দ্রব্য ও উপহার-সামগ্রীর লম্বা ফিরিস্তির বর্ণনায়। সিরিয়ার মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ লেবনন ও ফিনিসিয়া অধিকার করেছিলেন তিনি।

"আমি পশ্চিম মহাসাগর পর্যন্ত আমার বাহিনী চালিয়ে নিয়েছিলাম—সেখানকার দেবতাদের উদ্দেশে বলিদান করেছিলাম। সাগরকূলের নৃপতিবৃন্দের কর গ্রহণ করেছিলাম।" টায়ার, সিডন প্রভৃতি ফিনিসীয় নগরগুলির ধনী ব্যবসায়ীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, টিন, তাম্র, পশমি ও সুতির পোশাক ইত্যাদি মহার্ঘ দ্রব্য উপঢৌকন দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

দশবার যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন আসুর-নাজির-পাল, ২৫০টি নগর অধিকার করেছিলেন মাত্র ছয় বৎসর কালের মধ্যে। উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ কোন দিকেই অভিযানের ত্রুটি হয় নি, এবং তার ফলে ব্যাবিলোনিয়া ও জাগ্রোস পর্বতের জাতিসমূহ এমনই নির্জীব হয়ে পড়েছিল যে বাকি ১৫ বছর রাজত্বকালের মধ্যে একটিবার ছাড়া তাঁকে আর সংগ্রাম করতে হয় নি। এই দীর্ঘকাল জুড়ে সালমানেসার-প্রতিষ্ঠিত কালে নগরকে পুনর্নির্মাণ ও শোভা বর্ধন করেছিলেন তিনি। বন্দীগণ কর্তৃক যেসব অতি বৃহৎ নির্মাণ-কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, নিমরাড নামক স্থানে অবস্থিত একটি স্তূপ (Nimrud Mound) খনন করে সেগুলি আবিষ্কার করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিক লেয়ার্ড। আসুর-নাজির-পালের রাজপ্রাসাদ সেখানেই ছিল, পাশে নিনেব-দেবের মন্দির এবং একটি জিগ্‌গুরাট, যা স্তূপটিকে পিরামিডের আকার দান করেছে। একটি পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেছিলেন এই রাজা, পাহাড় থেকে নির্মল জল শহরে সরবরাহ করবার জন্য। কেবলমাত্র এই পয়ঃপ্রণালীটির অবশেষ-চিহ্ন ছাড়া আসিরীয় নৃপতিগণের পূর্তকার্যের আর কোন নিদর্শন বিদ্যমান নেই, যা থেকে আমরা তাদের জল-সরবরাহের পদ্ধতি নির্ণয় করতে পারি। কালে নগরের বর্ণনায় জর্জ রলিনসন তাঁর *Five Monarchies* গ্রন্থে বলেছেন—"Palace after palace rose on its lofty platform, rich with carved woodwork, gilding, painting, sculpture and enamel, each aiming to outshine its predecessors, while stone lions, obelisks, shrines and temple-towers embellished the scene breaking its monotonous sameness by variety." অর্থাৎ, উচ্চ মঞ্চভূমির ওপর অনেকগুলি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে সেগুলিকে কাঠের কারুকার্য, গিলটি, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও এনামেল দিয়ে পরিশোভিত করা হয়েছিল—আর সেই হর্ম্যরাজির বৈচিত্র্য-ব্যঞ্জনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল

পাথরের সিংহমূর্তি, ওবেলিস্‌ক্‌, মন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করে। নিমরাডের খনন-কার্যে ভাস্কর্যের যে নমুনাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, তাই থেকে আসিরীয় শিল্পের সঙ্গে আমাদের প্রাথমিক পরিচয় ঘটে—শুধু তাই নয়, পোশাক পরিচ্ছদ আসবাবপত্র অলংকার প্রভৃতির খোদিত চিত্রগুলি তদানীন্তন আসিরীয় সংস্কৃতির ওপর প্রচুর আলোকপাত করে। ভাস্কর্যে সিংহ ও বন্য বৃষ এবং শিকাররত রাজার প্রতিমূর্তিগুলি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। টিগলাথ পিলেসারের মতই মস্ত একজন শিকারপ্রিয় রাজা ছিলেন আসুর-নাজির-পাল।

দ্বিতীয় সালমানেসারের যুদ্ধাভিযান

দীর্ঘ ৩৫ বছর (খৃঃ পূঃ ৮৬০-৮২৪) রাজত্ব করেছিলেন আসুর-নাজির-পালের পুত্র দ্বিতীয় সালমানেসার। পিতার সেই যুদ্ধ অভিযান, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, নির্মম ধ্বংসলীলা সব-কিছুরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল, পিতার মত তিনিও উত্তরাঞ্চল, লেবনন ও ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের ওপর আধিপত্য দাবি করেন। দক্ষিণে পারস্যসাগরকূলের জলাভূমি ক্যালডিয়াতেও ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন তিনি, এবং সিরিয়ার মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতির উপদ্রব চিরদিনের জন্য দূর করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ইউফ্রেটিসের পরপারে সিরিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অধিকার করে তত্রত্য অধিবাসীদের আসিরিয়ায় স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং তাদের স্থলে আসিরীয় নাগরিকদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজনৈতিক কারণে অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের স্থানান্তর—যে প্রথার সূত্রপাত দেখেছি আমরা সুমেরীয় মনিস্‌টুসু ও আক্‌কাডীয় সারগনের রাজত্বকালে—সেই নির্মম প্রথাই এখন থেকে অশান্তি দমনের একটি সহজ উপায়-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল আসিরীয় নৃপতিবৃন্দের, আমরা তা শীঘ্রই দেখতে পাব। আমরা আরও দেখব যে এই প্রথাই কালক্রমে সাম্রাজ্য ধ্বংসের একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পশ্চিম অঞ্চলে সালমানেসারের এই যুদ্ধাভিযান সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ক্ষুদ্র নৃপতিদের চিন্তাকুল করে তুলেছিল। সিরিয়ার একটি প্রধান নগর কারকেমিস যখন বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করল, তখন আত্মরক্ষার্থ রাজন্যবর্গের
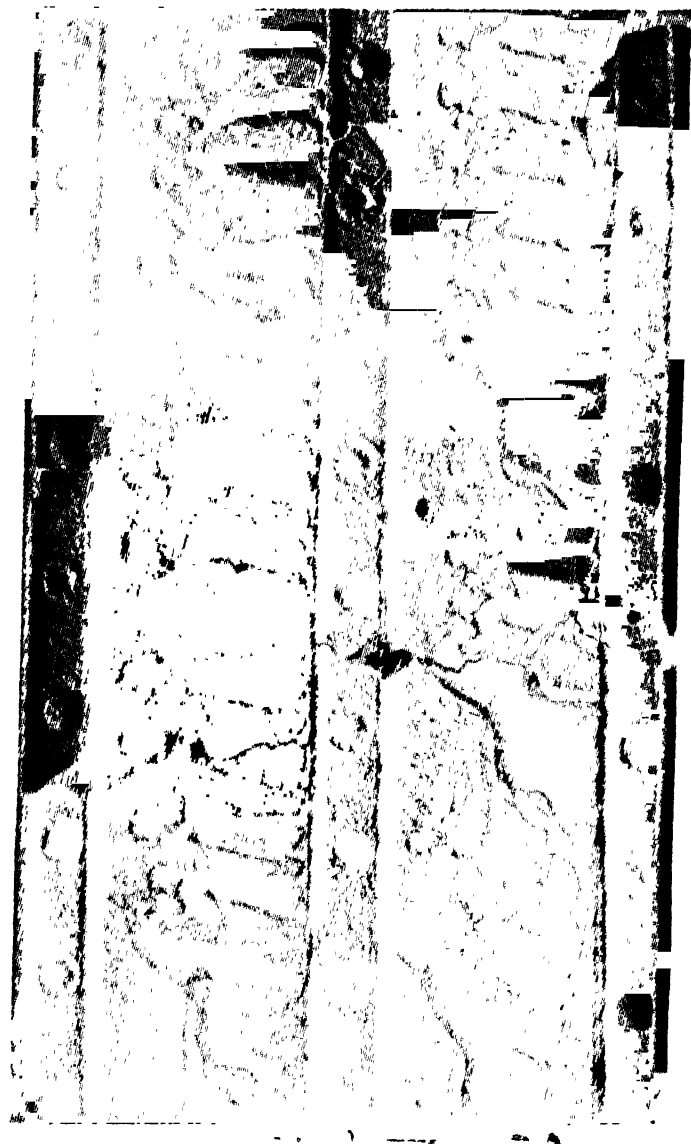
আসিরীয় সম্রাট দ্বিতীয় সালমানেসার সমীপে ক্যালডিয়ানদের বক্তৃতা নিবেদনের দৃশ্য—
তোরণদ্বারে উৎকীর্ণ

(ক) ব্যাবিলনে মারডুক দেবের মন্দির পুন-র্নিমাণ কার্যে আসিরিয়াধিপ আসুর-বানিপাল—প্রস্তরে উৎকীর্ণ প্রতিমূর্তি

(খ) সুমেরীয় দেবতা

শক্তি সংগঠন ছাড়া গত্যন্তর রইল না। এই উদ্দেশ্যে দামাস্কাসের রাজা দ্বিতীয় বেন-হাদাদ, হামাথের নৃপতি ও ইসরায়েল-রাজ আহাবের উদ্যোগে একটি মিত্র-বাহিনী গঠন করা হয়েছিল আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে। ৮৫৪ খৃস্ট পূর্বাব্দে ঝঞ্ঝা নেমে এল। কারকারের যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম (battle of Karkar) বাধল আসিরিয়ার সঙ্গে মিত্রশক্তির। যুদ্ধের ফলাফল সঠিক বলবার উপায় নেই, যদিও একটি শিলালিপিতে সালমানেসার বলেছেন, তিনি ১৪০০০ শত্রুসৈন্য ধ্বংস করেছেন, যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করেছেন। কিন্তু আধিপত্য বিস্তার বা কর গ্রহণের কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং এই যুদ্ধে তাঁর জয়লাভ তো হয়ই নি, এমন কি পরাজয় ঘটাও বিচিত্র নয়।

সিরিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয়বার অভিযান করেও সুফল লাভ করেন নি সালমানেসার, যেহেতু মিত্রশক্তি পূর্ববৎ পরাক্রান্তই ছিল। দামাস্কাস-পতি বেন-হাদাদই ছিল তাঁর প্রধান শত্রু। হঠাৎ গৃহবিপ্লবের ফলে বেন-হাদাদ নিহত হলেন একজন প্রাসাদকর্মচারীর হস্তে, এবং সেই সঙ্গে মিত্র শক্তির সংহতিও নষ্ট হয়ে গেল। চার বৎসর পর সালমানেসার আবার সিরিয়ায় আবির্ভূত হলেন। লেবনন পর্বতমালার একটি গিরিবর্ত্মে সৈন্য সমাবেশ করেছিলেন দামাস্কাসের অধিপতি খাজাইলু। সংগ্রামে পরাজিত হয়ে খাজাইলু রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। সালমানেসার তাঁর অনুধাবন করলেন বটে, কিন্তু দামাস্কাস অধিকার করেছিলেন, এমন কথা তাঁর বর্ণনায় নেই। তিনি শুধু বলেছেন, "আমি তার রাজধানী অবরোধ করেছিলাম, তাকে অবরুদ্ধ করেছিলাম।" সে যা-ই হোক, ইসরায়েল-রাজ জেহু যে বশ্যতা স্বীকার করে সালমানেসারের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে সালমানেসারের একটি ওবেলিস্কে।

বাইবেলের 'রাজন্যবর্গ' (*Kings*) নামক গ্রন্থে বেন-হাদাদ, আহাব ও জেহুর উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু মিত্রশক্তি গঠন, সালমানেসারের সঙ্গে মিত্র-শক্তির যুদ্ধ, এবং পরিশেষে ইসরায়েল-রাজ জেহুর বশ্যতা স্বীকার—এসব কথার ইঙ্গিত মাত্রও নেই। পক্ষান্তরে নিমরাডের খনন-কার্যে সালমানেসারের রাজ-প্রাসাদে প্রাপ্ত একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের ওবেলিস্কের ওপর রাজার যুদ্ধবর্ণনা খোদিত রয়েছে, যা থেকে আমরা তাঁর সিরিয়ায় ও প্যালেস্টাইনে অভিযান ও জেহুর বশ্যতার কথা জানতে পেরেছি। সাত ফুট উচ্চ এই ওবেলিস্ক অভগ্ন অবস্থায়

উদ্ধার করা হয়েছে। স্তম্ভের চারটি ধারেই উৎকীর্ণ চিত্রাবলী—সারি সারি বাহকের দল পাঁচটি জাতির উপঢৌকন নিয়ে চলেছে রাজার কাছে। একটি আভূমিপ্রণত মূর্তি দেখা যায়, তিনি ইসরায়েল-রাজ জেহু। শিলালিপিতে বলা হয়েছে : "খুমরি-পুত্র য়াহুয়া প্রদত্ত উপঢৌকন। রৌপ্য, স্বর্ণ, স্বর্ণভাণ্ড, সোনার বোতল, সোনার বালতি, সীসা, কাষ্ঠ, রাজকীয় ধনদৌলত গ্রহণ করেছি আমি।" স্মরণ রাখা প্রয়োজন বাইবেল একটি সংকলন-গ্রন্থ। এই বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ বাইবেলে না থাকার কারণ সম্ভবত এই যে, যে গ্রন্থে ইসরায়েল রাজ-বংশের ইতিবৃত্ত লিখিত, সেই বইখানি হারিয়ে গেছে। 'ইসরায়েল নৃপতিবৃন্দের ইতিহাস' ("*The Book of the Chronicles of the Kings of Israel*") নামক গ্রন্থের উল্লেখ বারবার করা হয়েছে বাইবেলে, কিন্তু সেই পুস্তকটির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নি।

টরাস পর্বতের উত্তরে সিলিসিয়ায় ও আরমেনিয়া অঞ্চলেও সংগ্রাম চালিয়েছিলেন সালমানেসার, কিন্তু ব্যাবিলোনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান (খৃঃ পূঃ
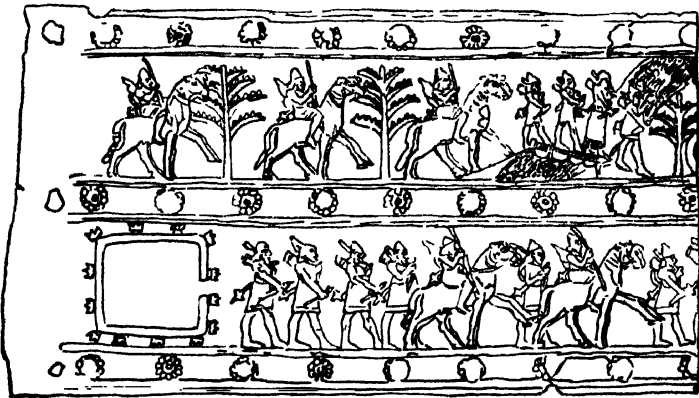
কালডিয়ায় সালমানেসারের সৈন্যবাহিনী (৮৫১ খৃঃ পূঃ)—(উপরে)
অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণের নৌ-সেতু অতিক্রম—(নীচে)
দুর্গ থেকে সৈন্যদের যুদ্ধাভিযানে বহির্গমন

৮৫১) সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই যুদ্ধগুলির বিবরণ প্রাসাদের কাষ্ঠদ্বারলগ্ন একটি ব্রঞ্জ-ফলকে লেখা রয়েছে। ব্যাবিলোনিয়ায় শাসক-পরিবারের গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে একাধিকবার সে দেশে যুদ্ধযাত্রা

করেছিলেন তিনি শান্তি স্থাপনের অছিলায়। দুই ভ্রাতার বিরোধ, তিনি এক ভ্রাতা মারদুক-জাকির-সুম-এর পক্ষ অবলম্বন করে অপর ভ্রাতাকে বধ করলেন। মারদুক-জাকির-সুম তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করলেন। তখন সালমানেসার আক্কাডের প্রধান নগরগুলি পরিভ্রমণ করলেন, এবং কুথা, ব্যাবিলন ও বরসিপ্পার প্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহে অর্ঘ্য নিবেদন ও বলিদান করলেন। ক্যালডিয়ায় সসৈন্যে প্রবেশ করে সাগরভূমির অধিপতির নিকট কর আদায় করেছিলেন তিনি। উৎকীর্ণ চিত্রে দেখানো হয়েছে, আসিরীয় সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাভিযান, আর ক্যালডিয়ানগণ কর্তৃক উপহার-সামগ্রী নৌকায় বহন করে এনে রাজা সালমানেসারকে প্রদান।

রাজত্বের শেষ সাত কি আট বছর যুদ্ধবিগ্রহ করেন নি সালমানেসার, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের মধ্যে নানারূপ নির্মাণ-কার্য ও দেব-সেবায় রত ছিলেন। কালে নগরে নিনেব-দেবের জিগ্গুরাট নির্মাণ আরম্ভ করেছিলেন তাঁর পিতা, আর সেই কাজ পরিসমাপ্ত করেন সালমানেসার। রাজত্বের শেষ ভাগে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্রোহী হয়ে জনতার সমর্থনে ১৬টি নগর সহ আসিরিয়ার একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিল। কিন্তু তাকে পরাজিত করে বৃদ্ধ রাজার অন্য একটি পুত্র চতুর্থ সামসি-আদাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন (৮২৫-৮১২ খৃঃ পূঃ)।

চতুর্থ সামসি-আদাদের ইতিহাস-কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপ্রচুর ও অসম্পূর্ণ। শুধু এই মাত্র জানা যায় যে ব্যাবিলন ইতিমধ্যে অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে আবার স্বাধীন হয়ে উঠেছিল, এবং সামসি-আদাদ সেই রাজ্য পুনরুদ্ধার করবার অভিপ্রায়ে অনেকগুলি নগর লুণ্ঠন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ব্যাবিলন-রাজ মারদুক-বলাৎসু-ইকবি একটি বিরাট বাহিনী গঠন করেছিলেন, ইলাম ক্যালডিয়া ও অন্যান্য প্রদেশের শাসকগণের সহযোগে। দুই বাহিনীর মধ্যে সংগ্রাম বাধল ব্যাবিলোনিয়ার একটি নগরের সমীপবর্তী স্থানে। সেই যুদ্ধে ব্যাবিলোনীয়গণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন সামসি-আদাদ।

সামসি-আদাদের পুত্র তৃতীয় আদাদ-নিরারি পিতামহের সংগ্রামসমূহের

বিশেষত সিরিয়া অভিযানের পুনরাবৃত্তি করেন। দিগ্বিজয়ের সেই একঘেয়ে বর্ণনা না করেও বলা দরকার যে দামাস্কাস অধিকার করে সমগ্র সিরিয়াকে তিনি আয়ত্তাধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্তত এই কৃতিত্বটি সালমানেসার দাবি করতে পারেন নি। আদাদ-নিরারির সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের তটভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ফিনিসিয়া, ফিলিস্টিয়া তাঁর অধীনতা স্বীকার করেছিল, এবং ইসরায়েল কর প্রেরণ করেছিল। ব্যাবিলোনিয়া যখন আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল, আদাদ-নিরারি তখন যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হলেন এবং ব্যাবিলন-রাজ বাউ-আখি-ইদ্‌দিনা-কে বন্দী করে তাঁর কোষাগারের ধনরত্ন সমেত রাজধানীতে ফিরে এসেছিলেন। অধীন দেশসমূহের মধ্যে পারস্য উপসাগর প্রান্তে ক্যালডিয়া ও পারস্যের জাগ্রোস পর্বতের উপত্যকা-ভূমি মিডিস-এর নামের উল্লেখ রয়েছে। অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ এই মিডিস— উপজাতীয় আর্য আগন্তুকদের বাসভূমি, কিন্তু এই মিডিসই যথাকালে আসিরিয়ার বিষদন্ত উৎপাটন করে তাকে সমূলে বিনষ্ট করেছিল।

সেমিরামিসের উপকথা

সাম্মুরামাত নামে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন আদাদ-নিরারি। রানীর নামের গ্রীক অপভ্রংশ 'সেমিরামিস' (Semiramis)। এই সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে রচিত একটি আখ্যায়িকার বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীক লেখকেরা—কিছু কাল পূর্বেও সেই উপকথাই ইতিহাসরূপে ইউরোপের শিক্ষালয়সমূহে পড়ানো হত। কিউনিফরম লিখনের পাঠোদ্ধারের পর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে আসিরিয়ার ইতিহাস সংকলন যখন সম্ভব হল, তখন দেখা গেল কাহিনীটির মধ্যে ইতিহাস বস্তু যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণ কল্পনা—অথবা 'মিথ'। আখ্যায়িকাটির ঐতিহাসিক মূল্য না থাকলেও, জনশ্রুতিকে ইতিহাস বলে নির্বিচারে গ্রহণ করা যে কত বড় মারাত্মক ভ্রম, সেই হুঁশিয়ারির একটি আলোক-সংকেত রূপেই এই কাহিনীর যথেষ্ট গুরুত্ব। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই : পুরাকালে আসিরিয়ায় নিনাস (Ninus) নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই নাকি নিনেভে নগর স্থাপন করে নিজের নামে শহরটির নামকরণ করেছিলেন। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া, কৃষ্ণ ও ক্যাসপিয়ান সাগরের উপকূলে দক্ষিণ রাশিয়ার অংশ এবং মিডিস সমেত পারস্যের অধিপতি ছিলেন তিনি। তাঁর সেনাপতি

ছিলেন ওনেস (Onnes), এবং সেনাপতির পত্নী ছিলেন সিরিয়ার মৎস্য-দেবী দারকেটো (Fish-goddess Derketo)-র কন্যা সেমিরামিস। তীর-ভূমির ঘুঘু পাখিরা তাঁকে করেছিল লালনপালন, তারপর রাখালগৃহে বর্ধিত হন তিনি। সেনাপতি ওনেস এই পরমাসুন্দরী দেবকন্যার নয়নাভিরাম রূপ-দর্শনে তাঁর প্রেমমুগ্ধ হন এবং অবিলম্বে তাঁকে বিবাহ করেন। সেমিরামিস ছিলেন লাবণ্যবতী ও সুচতুরা, যুদ্ধ-ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করতেন। এরূপ রমণীর পক্ষে রাজার নজরে পড়া বিচিত্র নয়, আর হয়েছিলও তাই। সেনাপতি-পত্নীকে রাজা গ্রহণ করলেন, আর সেই দুঃখে ওনেস করলেন আত্মহত্যা। সেমিরামিসের হাতে অবাধ শাসন-কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, এবং এ বিষয়ে তাঁর তুলনা মেলে ভারতের মোগল-সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের। বায়ান্ন বছর রাজত্বের পর রাজা নিনাসের যখন মৃত্যু হল, রাজ্যের শাসনভার তখন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন পুত্র নিনিয়াস (Ninyas) নয়, সম্রাজ্ঞী সেমিরামিস। রাজ্ঞীর কৃতিত্ব যুদ্ধের চেয়েও শান্তির কার্যে অধিক দেখা গিয়েছিল। তোরণ-সমন্বিত প্রাকারবেষ্টিত ব্যাবিলন নগর ও বেল-দেবের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তিনি, আর রচনা করেছিলেন 'ঝুলন্ত বাগান' (Hanging garden of Babylon)। [আমরা এখন জানি যে এই উদ্যানটি রচনা করেছিলেন নব-ব্যাবিলোনীয় রাজা নেবুকাড্-নেজ্জার।] বাগাস্তান (বাহিস্তান) নামক স্থানে একটি সু-উচ্চ ত্রিকূট পাহাড়ের গাত্র মসৃণ করে তার ওপর ভাস্কর্যমূর্তি উৎকীর্ণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। [এটি নিশ্চয়ই বাহিস্তান পর্বতগাত্রে পারস্যসম্রাট দারায়ুসের সেই শিলালিপি !] কিন্তু তাঁর দিগ্বিজয়-লিপ্সা যায় নি, তিনি মিশর ও লিবিয়া জয় করে ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন। তিনি নাকি সিন্ধু নদের ওপর একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু অচিরেই তাঁকে ভারতীয় বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাগমন করতে হল। তারপর থেকে তিনি বিলাস-প্রমোদের উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢেলে দিলেন। বয়স তাঁর দেহশ্রীর ওপর কোন রেখাপাতই করে নি—মুখের মিষ্ট কথায় চোখের কটাক্ষে তিনি পুরুষের মন হরণ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এইসব উচ্ছৃঙ্খল আচরণ পুত্র নিনিয়াস সহ্য করল না, সে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সেমিরামিসের তখন চমক ভাঙল, তাঁর স্মৃতিপথে উদয় হল বিস্মৃত একটি দৈববাণী : দেবকন্যা তিনি, শাপভ্রষ্ট হয়ে

ধরাধামে এসেছিলেন, অমৃতলোকের দেব-সমাজে আবার ফিরে যাবেন যখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে তাঁর গর্ভজ পুত্র ! সেমিরামিস দেখলেন শাপমুক্তির সেই শুভ মুহূর্ত সমাগত, তাঁকে এখন স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। হৃষ্টমনে সাম্রাজ্য পুত্রের হাতে তুলে দিলেন তিনি, অভিজাতবর্গ ও সামন্তদের ডেকে পুত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে বললেন। তারপর নিজেকে ঘুঘু পাখিতে রূপান্তরিত করে এক ঝাঁক ঘুঘুর সঙ্গে প্রাসাদ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলেন।

ইতিহাসের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে সেমিরামিস একটি কল্পরাজ্যের মণিসিংহাসনে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন, যুগে-যুগে গণ-মানস তাঁরই স্মৃতিকে পূজা করে চলেছিল। পশ্চিম এশিয়ায় যে সব অতিপ্রাচীন সৌধের নির্মাণ-কাহিনী বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল, উত্তরকালে সেই স্মৃতিসৌধসমূহের সঙ্গে সেমিরামিসের নাম সংযুক্ত করা হল। পরিশেষে ইউফ্রেটিস নদীতীরে বা ইরানে সর্বত্রই বৃহৎ নির্মাণকার্যগুলি, এমন কি বাহিস্তান পাহাড়ে দারায়ুসের শিলালিপিটি পর্যন্ত সেমিরামিসের অনুষ্ঠান, এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গেল। 'সাম্মুরামাত' এই আসিরীয় শব্দটির অর্থ, 'ঘুঘু পাখি'—পক্ষীটি প্রেমের দ্যোতক। আখ্যায়িকায় সেমিরামিসের ঘুঘু পক্ষীরূপে তিরোধানের কথা বিবেচনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে সাম্মুরামাত মৎস্যদেবী দারকেটো বা আটারগেটিস (Atargates)-এর কন্যা মাত্র ছিলেন না, তিনি নিজে ছিলেন প্রেমের দেবী ইস্‌তার, যাঁর কামপ্রবৃত্তি নানান যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও সেই শক্তিস্বরূপিণী রণচণ্ডীকে কুসুম-পেলব কামিনীর যৌবনরাগে মণ্ডিত করে রেখেছিল। তাঁর লীলার বর্ণনায় ইতিহাসের স্থূল বৃত্তান্ত অন্তরালে রেখে ইতিহাস-বস্তুকেই 'মিথ' বা পুরাণকথায় রূপান্তর করা হয়েছে, এই সত্য আবিষ্কার করেছিলেন বার্লিনের অধ্যাপক লেম্যান হপ্‌ট্‌ (Laymann Haupt) ১৯১০ খৃস্টাব্দে। একটি স্তম্ভ ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিকে সমীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে উপরোক্ত উপাখ্যানের সেমিরামিস ছিলেন একজন প্রভাবশালিনী, প্রতিষ্ঠাবতী রাজরানী, যাঁর নাম আবিষ্কৃত স্তম্ভে উৎকীর্ণ রয়েছে সামসি-আদাদের প্রাসাদচারিণী অন্তঃপুরিকা রূপে।* লেম্যান হপ্‌ট্‌ আরও বলেন, সেমিরামিস সম্ভবত ছিলেন কোন

---

* Prof. Leymann Haupt, by putting together the results of archaeological discoveries has arrived at the following conclusions. Samura-

ব্যাবিলোনীয় নারী, কেননা তিনিই প্রথমে আসিরিয়ায় 'নেবো পূজা পদ্ধতি' (cult of Nebo or Nabu) প্রচলিত করেন।

আসিরিয়া ও উরারতু

তৃতীয় আদাদ-নিরারি-র রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৮১২-৭৮৩। তাঁর মৃত্যুর পর চল্লিশ বছরে তিনজন নৃপতি সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁদের সময়ে আসিরীয় সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ তো করেই নি, বরঞ্চ সংকুচিতই হয়েছিল। আদাদ-নিরারি-র পুত্র তৃতীয় সালমানেসার-এর রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলে উরারতু রাজ্য কর্তৃক আসিরীয় সাম্রাজ্যের ওপর হামলা শুরু হয়েছিল, এবং নাইরি-ভূমির (আরমেনিয়া) উপজাতিসমূহ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। দশ বছর রাজত্ব করেন সালমানেসার (খৃঃ পূঃ ৭৮৩-৭৭৩), তাঁর মৃত্যুর পর দু'জন নৃপতি রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু 'দেশে'ই ('in the land') ছিলেন, অর্থাৎ কিনা যুদ্ধাভিযানে বহির্গত হন নি।

উত্তরাঞ্চলের যে উরারতু রাজ্যের হানার কথা বলা হয়েছে, সে রাজ্যটি অবস্থিত উরুমিয়া হ্রদের তীরে। ইতিমধ্যেই উরারতু বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। বস্তুত উরারতুরাজ ইস্‌পুইনিস ও তাঁর পুত্র মেনুয়াস উত্তর টাইগ্রিস ও জাব নদী অঞ্চলের আসিরীয় সাম্রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে বসেছিলেন, তখন উরারতু রাজ্য আয়তনে আসিরিয়াকেও অতিক্রম করেছিল।* উরারতুরাজ আরগিসটিস আসিরিয়ার অধিপতি তৃতীয় সাল-মানেসারের সমসাময়িক নৃপতি, উরারতুর বিরুদ্ধে আসিরিয়ার ক্রমাগত আক্রমণ সত্ত্বেও ভাগ্যলক্ষ্মী যে উরারতুর প্রতি বিমুখ হয়েছেন এমন কোন

---

mis is the Greek form of Samuramat. She was probably a Babylonian... A column discovered in 1909 describes her as 'a woman of the palace of Shamsi Adad, king of the world, king of Assyria, king of the four quarters of the world'—*Encyclopaedia Britannica.*

* ইতিপূর্বেই উরারতুর অন্তর্গত পারসুয়া প্রভৃতি স্থানে আর্য পারসীকগণ এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল। উরারতুর অধিবাসীরা ছিল আরমেনিয়ান জাতীয়, শিলালিপি থেকে জানা যায় তারা শুধু যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল তা নয় বড় বড় পূর্তকার্য, পরিখা খনন করে অনুর্বর পতিত প্রান্তরকে কৃষিভূমিতে পরিণত করেছিল। প্রস্তরসৌধ নির্মাণ করত তারা, তাদের সান্নিধ্যে পারসীকরা যে পূর্ত ও সৌধনির্মাণ কার্যে প্রভূত শিক্ষা লাভ করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লক্ষণই দেখা গেল না। আরগিসটিস উরুমিয়া হ্রদের চারদিকের প্রদেশ-গুলিকে অধিকার করলেন, তারপর পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে এশিয়া মাইনরের কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ওপর অধিকার বিস্তার করলেন, এই রাষ্ট্রগুলি ছিল আসিরিয়ার অধীন। তখন আসিরিয়াকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত দুর্বল, যেন পঙ্গু উত্থানশক্তিহীন, যেন কোন দিন আর মাথা তুলতে পারবে না। কিন্তু এই অমূলক ধারণার কুয়াশা-জাল অচিরেই কেটে গিয়েছিল, যখন আসিরিয়াধিপ তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার পরিপূর্ণ উদ্যমে শুধু যে আসিরিয়ার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করলেন তা নয়, তার সাম্রাজ্যের পরিধি দূর দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ নাকি আক্রমণাত্মক অভিযান—aggression is the best form of defence—এই নীতিবাদের সার্থক পরিচয় আসিরিয়ার এই সময়কার ইতিহাসে বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। তৃতীয় সালমানেসারেব পরবর্তী নৃপতিদ্বয় ছিলেন নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম, যেরকমটি ছিল আসিরিয়ার পক্ষে একান্ত বিস্ময়কর। প্রতি বছব অভিযানে বেরিয়ে পররাজ্যের ধনরত্ন লুঠ করে নিয়ে আসা আসিরিয়ার একটি প্রথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই প্রথাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়, হয়তো বা সেখানে বিদ্রোহই ঘটেছিল। সত্য বটে, এরূপ বিদ্রোহের বিবরণ কোন শিলালিপিতে লেখা নেই। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক শিলালিপিতে নৃপতিবৃন্দ স্ব স্ব প্রশস্তি কীর্তন করেছেন মাত্র, সেখানে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্যোগ প্রভৃতির বর্ণনা থাকবার কথা নয়। কয়েকটি সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখে অন্তর্বিপ্লবের কথা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আসিরিয়ায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত একই রাজবংশের অবতংসগণ রাজ্যশাসন করেছেন, বংশের পারম্পর্য কোন দিন ভঙ্গ হয় নি। এখন সেই পারম্পর্য ভঙ্গ করে রাজদণ্ড করায়ত্ত করলেন একজন শক্তিমান ব্যক্তি, তাঁর নাম টিগলাথ পিলেসার। আসিরিয়ার ক্ষীয়মাণ বলবীর্য সংহত করে তিনি ধরলেন আগ্রাসী আক্রমণাত্মক নীতি, এমনি করে নিশ্চিত পতনের মুখ থেকে সে-দেশকে উদ্ধার করলেন। ইতিহাসের প্রখ্যাত বা কুখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীরেন্দ্রবৃন্দের মধ্যে এই পুরুষসিংহ একটি স্থায়ী আসন লাভেব অধিকার রাখেন।

॥ তিন ॥

দু'জন পরাক্রান্ত নৃপতি : দ্বিতীয় সারগন

তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার

খৃঃ পূঃ ৭৪৫ অব্দে তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার-এর আসিরিয়ার সিংহাসন অধিরোহণ পশ্চিম এশিয়ার একটি নূতন ঐতিহাসিক পর্যায়ের প্রারম্ভ। নূতন সৈন্য সংগ্রহ করে অভিযান দ্বারা সংকুচিত সাম্রাজ্যের প্রসারণ এবং সেই সঙ্গে আসিরিয়ার পূর্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই হয়েছিল তাঁর প্রথম কর্ম। প্রকৃতপক্ষে পূর্বনৃপতিগণ শুধু আরমেনিয়াকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেই সন্তুষ্ট থাকতেন, আর ব্যাবিলোনিয়া সিরিয়া প্রভৃতি দূরবর্তী দেশসমূহ নামমাত্রই পরাধীন ছিল। টিগলাথ পিলেসার স্থায়ীভাবে ঐ দেশ-সমূহ অধিকার করতে কৃতসংকল্প হলেন। পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্যবিস্তারের পথ নিরঙ্কুশ করবার জন্য প্রথমেই তিনি উত্তরাপথের উরারতু বা আরমেনিয়া পুনরধিকার করলেন। ব্যাবিলনে তখন নবম রাজবংশের রাজত্বকাল। ব্যাবিলন-রাজ নবোনাসার অচিরে আসিরিয়ার অধীনতা শিরোধার্য করলেন। ক্যালডিয়ার নৃপতিদেরও এতকালের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন টিগলাথ পিলেসার, এবং তাদের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয় জনৈক নৃপতিকে স্বীয় নগর-দ্বারের সমুখেই হত্যা করা হয়েছিল। পূর্ব দিকে জাগ্রোস পর্বতের এমন কি মিডিসের উপজাতিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন তিনি। এমনি করে আপন রাজ্যকে চতুর্দিকের বিপদ-সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করে সিরিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন টিগলাথ পিলেসার। একমাত্র সিরিয়াকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতেই পাঁচ বৎসর যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে যুদ্ধজয়ের পর ব্যাবিলোনিয়া ও সিরিয়া থেকে নাগরিকগণকে ব্যাপক ভাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এই সময়ে দেখতে পাই আমরা দামাস্কাস, কারকেমিস, হামাথ, টায়ার, গেবেল (বিবলোস), সামারিয়া প্রভৃতি নগরের অধিপতিগণ সাগ্রহে আসিরিয়া-রাজের কাছে কর বহন করেছিলেন।

বাইবেলের 'নৃপতিবৃন্দ' (*Kings II*) গ্রন্থে 'ফুল' (Phul) নামে যে আসিরিয়ার রাজার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিই তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার।

প্যালেস্টাইনে তাঁর অভিযানের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইসরায়েল-রাজ মেনাহেম প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির নিকট থেকে পঞ্চাশ 'সেকেল' রৌপ্য আদায় করে আসিরিয়া-রাজ ফুল-এর হস্তে এক সহস্র ট্যালেণ্ট সমর্পণ করেছিলেন। বাইবেলের আর একটি বর্ণনায় দেখা যায়, সিরিয়ার রাজা রেজিন ও ইসরায়েল-রাজ পেকা একত্র মিলে জুডার রাজধানী জেরুসালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান শুরু করলেন। তখন জুডা-রাজ আহাজ এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করলেন আসিরিয়ার রাজা টিগলাথ পিলেসারের কাছে: "আমি আপনার ভৃত্য, আপনার পুত্র; সিরিয়া ও ইসরায়েলের নৃপতিদ্বয় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উন্থত হয়েছে। আপনি আস্থন, তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন" (*Kings II. 16*)। মন্দির ও কোষাগার শূন্য করে আসিরিয়া-রাজকে স্বর্ণরৌপ্য প্রেরণ করেছিলেন আহাজ। আসিরিয়া-রাজ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন—দামাস্কাস অধিকার করলেন, রেজিনকে হত্যা করলেন। "তখন রাজা আহাজ দামাস্কাস গিয়ে আসিরিয়া-রাজ টিগলাথ পিলেসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।" লক্ষ্য করবার বিষয়, এখানে বাইবেলে টিগলাথ পিলেসার নামই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, 'ফুল' ও 'টিগলাথ পিলেসার' দু'জন ভিন্ন রাজা নন। ফুলই রাজার প্রকৃত নাম—পরে তিনি আসিরিয়ার একজন সুবিখ্যাত নৃপতির নাম গ্রহণ করেছিলেন। সিরিয়া ও ইসরায়েলের নানা স্থান অধিকার করে অধিবাসীদের বন্দী করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেছিলেন টিগলাথ পিলেসার—বাইবেলে এই বৃত্তান্তটির উল্লেখও রয়েছে।

ব্যাবিলোনীয় রাজবংশের উৎসাদন : 'বিট ইয়াকিন'

ইতিমধ্যে ব্যাবিলোনিয়ায় নবম রাজবংশের অবসান ঘটেছিল। এই বংশের শেষ নৃপতি নাবু-নাদিন-জের (৭৩৪-৭৩২ খৃঃ পূঃ) বিদ্রোহকালে একজন প্রদেশপালের হস্তে নিহত হন। নবম বংশের অবসানকাল থেকেই আসিরিয়ার পূর্ণ আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল ব্যাবিলোনিয়ার ওপর। আসিরিয়ার কর্তৃত্বাধীনে একটি দশম বংশের রাজকুলের সৃষ্টি করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই বংশের রাজত্ব মাত্র দুই বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ৭২৯ অব্দে টিগলাথ পিলেসার পুনরায় ব্যাবিলন অধিকার করেন, এবং

তদানীন্তন রাজা নাবু-মুকিন-জের-কে বন্দী করে স্বয়ং ব্যাবিলনের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এখানে তিনি 'ফুল'—অর্থাৎ স্বনামেই প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন।

টিগলাথ পিলেসারের আর একটি কীর্তি : ক্যালডিয়া প্রদেশে 'বিট-ইয়াকিন' নামক সাগরভূমির রাজা মেরোদোক বালাদান বিনা যুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। পরম উল্লাসভরেই বলেছেন টিগলাথ: "সাগরভূমির কোন নৃপতিই ইতিপূর্বে এসে আমার পিতা-পিতামহের পদচুম্বন করেন নি। এক্ষণে আমার প্রভু আস্থর সেই নৃপতির মনে এমন ভীতির সঞ্চার করেছেন যে সে আমার পদচুম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।" স্বর্ণ ও নানাবিধ বহুমূল্য উপহারের উল্লেখ আছে শিলালিপিতে। টিগলাথ বোঝেন নি যে সাগরভূমির অধিপতির এই সাময়িক নতি-স্বীকার একটি ছলনা মাত্র। অল্পকাল পরেই আমরা দেখতে পাব, মেরোদোক বালাদান প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে পরবর্তী কালের আসিরীয় রাজন্যবৃন্দের পরম উদ্বেগের কারণ হয়েছিলেন।

খৃঃ পূঃ ৭২৭ অব্দে টিগলাথ পিলেসারের মৃত্যু হয়। দিগ্বিজয়ীর অন্তর্ধানে পরাধীন রাজ্যসমূহে মুক্তির স্বস্তি অনুভূত হয়েছিল, এবং তারই উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্যালেস্টাইন যখন অভিভূত, তখনই প্রফেট ইসায়ার কম্বুকণ্ঠে এই সতর্কবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল : "আনন্দে আত্মহারা হয়ো না প্যালেস্টাইন। যে যষ্টি প্রহার করেছিল তোমাকে, সেই যষ্টি ভেঙে গেছে সত্য, কিন্তু সেই সর্পের অঙ্কুর থেকে চক্রাকার ফণা (basilisk) গজিয়ে উঠবে এবং তার ফল-স্বরূপ দেখা দেবে একটি অগ্নিময় উড়ন্ত সর্প" (*Isiah 14*)। প্রফেট ইসায়া ছিলেন ইসরায়েল-রাজ আহাজের মন্ত্রী। এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বাস্তবিকই করেছিলেন, না কথাগুলি পরবর্তী কালের রচনা, বলা কঠিন। উক্তিটি কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্য!

'টারটান' : প্রদেশপাল নিয়োগ ব্যবস্থার প্রবর্তন

টিগলাথ পিলেসারের রাজত্বকালে শত্রুরাজ্যের অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে স্থানান্তরিত করা ছাড়াও, আরও দুটি নূতন বিধিব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। এ যাবৎ যুদ্ধাভিযানে রাজারাই বহির্গত হতেন—সেই প্রথার

পরিবর্তন ঘটেছিল। অভিযানের আকার বিরাটতর বলেই হোক, অথবা বিভিন্ন স্থানে একযোগে যুদ্ধ চালাবার প্রয়োজনের দরুনই হোক অধিকাংশ স্থলেই এখন থেকে যুদ্ধাভিযানের ভার 'টারটান' (Tartan) বা প্রধান সেনাপতির ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা স্বয়ং উপস্থিত না থাকলেও সংগ্রামে জয়লাভের কৃতিত্ব শিলালিপির বর্ণনায় তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। এই অদ্ভুত দাবির ফলে কোন যুদ্ধ রাজা নিজে করেছিলেন আর কোনটিই বা করেছিলেন তাঁর টারটান, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা কঠিন। দ্বিতীয় পরিবর্তন: যুদ্ধ বিজয়ের পর দেশ অধিকার ও শাসনপদ্ধতির। চিরাচরিত প্রথামত এখন আর অধিকৃত দেশসমূহ কর প্রদান করেই মুক্তিলাভ করে নি—সেগুলিকে স্থায়ীভাবে কেন্দ্র-শক্তির অধীনে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আসুর-নাজির-পালের আমলেই কোন কোন অধিকৃত অঞ্চলে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছিল দেখা যায়। এখন সেই প্রদেশপাল নিয়োগব্যবস্থা ব্যাপকতরভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। এখানে বোধ করি এ-কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রদেশপাল দ্বারা বিজিত দেশসমূহের শাসনপদ্ধতি এই যে এখন থেকে শুরু হয়েছিল, সেই পদ্ধতিরই পূর্ণ পরিণতি ঘটেছিল দুই শতক পরে, পারস্যসম্রাট দারায়ুস যখন 'ক্ষত্রপ' (satrap) নিযুক্ত করে বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশসমূহ শাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

চতুর্থ সালমানেসার: 'হারানো দশ গোষ্ঠী'

রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন চতুর্থ সালমানেসার খৃঃ পূঃ ৭২৭ অব্দে। তিনি টিগলাথের পুত্র, না অন্য কোন দাবি নিয়ে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তার কোনরূপ প্রমাণ নেই, যদিও ঐতিহাসিক মহলে দু' রকম মতবাদেরই প্রচলন আছে। এই নৃপতির রাজত্বকাল অত্যন্ত অল্প —মাত্র ছয় বৎসর। বাইবেল গ্রন্থ ছাড়া তাঁর কার্যকলাপের বিবরণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় নি। ইসরায়েল-রাজ হোসিয়া-র বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন সালমানেসার, তার উল্লেখ রয়েছে বাইবেলে। মিশরে তখন ফারাও ছিলেন ইথিওপীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাবাক—বাইবেলে যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে 'সো'। এই রাজার সঙ্গে হোসিয়া গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন

আসিরিয়ার বিরুদ্ধে, সেজন্য এবং পূর্ব-পূর্ব বছরের মত উপঢৌকন প্রেরণ করে আসিরিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন নি তিনি—এই অপরাধে হোসিয়াকে বন্দী করে কারাগারে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন সালমানেসার। তারপর—

"আসিরিয়া-রাজ সমগ্র দেশ অধিকার করে (ইসরায়েলের রাজধানী) সামারিয়ায় উপনীত হলেন, এবং শহরটিকে তিন বছর ধরে অবরোধ করলেন।

"হোসিয়ার রাজত্বের নবম বর্ষে আসিরিয়া-রাজ সামারিয়া অধিকার করলেন এবং সমগ্র ইসরায়েল-বাসীদের আসিরিয়ায় চালান করলেন। হালা (Halah) হাবর (Habor) ও মিডিস দেশের নানা স্থানে এই ব্যক্তিদের স্থাপন করলেন।" (*II Kings 17*)

নির্বাসনের পর এইসব ইহুদি উপজাতীয়দের ভাগ্য সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। সম্ভবত এই নির্বাসিত গোষ্ঠীরাই ইহুদিদের 'হারানো দশ গোষ্ঠী' (Lost Ten Tribes)।

প্রকৃতপক্ষে কি ইহুদি নির্বাসন কি সামারিয়া অধিকার, এই দুটির কোন কাজই সালমানেসার স্বয়ং করেন নি। তাঁর একজন সেনাপতি—আসিরিয়ার ইতিহাসে যিনি দ্বিতীয় সারগন নামে প্রসিদ্ধ—তিনিই এই কার্যগুলি সম্পন্ন করেছিলেন। একটি শিলালিপিতে সারগনের নিজের ভাষায় বর্ণনা এইরূপ : "ভগবান সামাসের অনুগ্রহে রাজত্বের প্রথম ভাগে আমি সামারিয়া নগর অবরোধ করে অধিকার করেছি। ২৭২৮০ জন অধিবাসীদের আমি উৎখাত করেছিলাম।…বন্দী অধিবাসীদের আমি আসিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলাম, এবং তাদের স্থানে অন্যান্য পরাজিত জাতির ব্যক্তিদের স্থাপন করেছিলাম।"

সারু-কেনু বা সারগনের অভিযান কাহিনী

সারগন বা সারু-কেনু ছিলেন একজন প্রধান সেনাপতি বা টারটান। খৃঃ পূঃ ৭২২ অব্দে বাহুবলে (*coup detat*) রাজ্য অধিকার করেছিলেন তিনি সালমানেসারের মৃত্যুর পর, প্রধানত সৈন্যদের সমর্থনে, এরূপ অনুমান

অসংগত নয়। অন্তত এই অনুমানের কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নি। এই রাজার প্রকৃত নাম কি ছিল তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু তিনি প্রায় এক হাজার বছর পূর্বেকার স্বনামধন্য আকৃকাডীয় সম্রাট সারগনের নামই গ্রহণ করেছিলেন। সারগনের সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। তড়িদ্গতিতে তিনি কারকার নগর অধিকার করে বিদ্রোহ দমন করলেন। তারপর আরম্ভ হল মিশরাধিপ সাবাক-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় মাঝে মাঝে এই যে বিদ্রোহ মাথা খাড়া করে উঠছিল তার মূলে ছিলেন ফারাও সাবাক। বিদ্রোহের প্রেরণা বরাবর তিনিই দিয়ে এসেছেন, সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিতেন, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত হুঁশিয়ার প্রকৃতির মানুষ, আপদকালে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যেত না। পশ্চিম অঞ্চলে আসিরিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করবার জন্যেই সারগন এই মিশরী নৃপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। খৃঃ পূঃ ৭২০ অব্দে সাবাকের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধল সারগনের রাফিয়া নগরের উপান্ত দেশে (battle of Raphia) সমুদ্রের উপকূলে, এবং সেই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় ঘটল সাবাকের। তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করলেন মিশর-রাজ, কিন্তু সারগন তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন না— কেননা রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল। প্যালেস্টাইন বিজয় ও ইহুদিদের নির্বাসন-কার্য ইতিপূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল, তা আমরা দেখেছি। এখন দীর্ঘকাল অবরোধের পর ফিনিসিয়ার টায়ার নগরও আত্মসমর্পণ করল।

পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ের পর দশ বছর ধরে নানান স্থানে বিদ্রোহ-দমন ব্যাপার নিয়ে বিব্রত ছিলেন সারগন। উত্তরে আরমানিয়ার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একত্র মিলে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করল, এই বিদ্রোহের মূল উৎস ছিল উরারতু-রাজ উরজা এবং মুজাজির প্রদেশের অধিপতি উরজানা। উরারতু-রাজ উরজাকে (Gk. Rusas) সাহায্য দান করেছিল পারস্যের একজন মিডীয় দলপতি, তার নাম দয়িউকৃকু (Gk. Deioces)। এই সংবাদ শুনেই সারগন মিডিয়া আক্রমণ করেন এবং দয়িউককৃকে বন্দী করে পরিবার সহ সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। দয়িউকৃকুর প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল মিডীয়দের মধ্যে তার পদমর্যাদার জন্য, না মিডিয়ার উপজাতিগণের ওপর আধিপত্য বিস্তারের যন্ত্র-

স্বরূপ তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন সারগন, সে কথা বলা যায় না। তবে দেখা যায়, আসিরিয়ার আক্রমণের ফলে উরজার প্রতিরোধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, এবং বহুসংখ্যক মিডীয় দলপতি সারগনের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। পাঁচ বছর ধরে সংগ্রামের পর সারগন সেই দুরধিগম্য পার্বত্যভূমি সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বর্ণনায় আছে, "উরজানা পক্ষীর মত পলায়ন করে উচ্চ পর্বতমালার আশ্রয় গ্রহণ করল।... উরজা পাঁচ মাস ধরে পর্বতমধ্যে একাকী ভ্রমণ করতে লাগল।...উরজা শুনল, মুজাজির প্রদেশ অধিকৃত হয়েছে, দেবতা হলদি-ও বন্দী। আসুরের এই বিজয়কাহিনী শুনে সে হতাশ হয়ে পড়ল এবং নিজের হাতে জীবন নাশ করল।"

আরমেনিয়ায় বিদ্রোহ দমনের পরও বিদ্রোহীর সাহায্যকারীদের শাস্তি-দান করবার জন্য তিন বৎসর সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময়ে পূর্বাঞ্চলে মিডিয়ার রাজা ডালটা-র বিরুদ্ধে প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধ রাজা ডালটা সারগনের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বর্ণনায় সারগন বলেছেন, "এলিপ (মিডিয়া)-রাজ ডালটা আমার অনুগত এবং আসুরদেবের পরম ভক্ত উপাসক। তাঁর অধীনস্থ পাঁচটি নগর বিদ্রোহী হয়ে তাঁর প্রভুত্ব অস্বীকার করেছিল। আমি তাঁর সাহায্যার্থ গিয়েছিলাম, অবরোধের পর নগরগুলি অধিকার করেছিলাম। সেখানকার নরনারী, ধনসম্পদ ও অগণিত অশ্ব আসিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলাম।..আমি ডালটার হৃদয়ে আনন্দদান করেছিলাম এবং তাঁর রাজ্যে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলাম।"

এই ব্যাপারের অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটেছিল ফিলিস্টিয়ার আসডড্ নগরে। আসিরিয়ার অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন এই নগরের অধিপতি—তাঁকে অপসারিত করে বিদ্রোহী প্রজারা যবন (Yavan) নামক এক ব্যক্তিকে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তখন রাজ্যচ্যুত নৃপতির সাহায্যার্থ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন সারগন। কিন্তু যুদ্ধের কোন প্রয়োজন হল না। আসিরীয় বাহিনীর আগমন সংবাদ শ্রবণমাত্র নূতন রাজা যবন মিশরে পলায়ন করলেন। "তাঁর দেবমূর্তিসমূহ, পত্নীপুত্রগণ, রাজপ্রাসাদের ধনরত্ন ও মহার্ঘ দ্রব্যাদি—সবই আসিরিয়ার হস্তগত হয়েছিল।" যদিও বর্ণনায় সারগনের নামই ব্যবহৃত হয়েছে, আসলে কিন্তু তাঁর প্রধান সেনাপতি বা 'টারটান'-এর

অধিনায়কত্বেই এই অভিযানটি পরিচালিত হয়েছিল। এই বিষয়টির উল্লেখ বাইবেলে করা হয়েছে এইরূপ : "সারগন টারটানকে আসডডে প্রেরণ করে-ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করে নগর অধিকার করলেন" (*Isiah 20*)। এই অভিযান মিশর-রাজের মনে এমনি ভীতির সঞ্চার করেছিল যে তিনি অবিলম্বে যবনকে বদ্ধাবস্থায় আসিরিয়া-রাজের নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

এতকাল পর সারগনের ব্যাবিলোনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করবার সময় এসেছিল। স্মরণ থাকতে পারে, পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী 'বিট ইয়াকিন' নামক জলাভূমির (Sea Country) অধিপতি মেরোদোক-বালাদান স্বেচ্ছায় আসিরিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করে টিগলাথ পিলেসারকে নানান উপহার পাঠিয়েছিলেন। সালমানেসারের রাজত্বকালে তাঁর প্রধান সেনাপতিরূপে সারগন যখন পশ্চিমাঞ্চলে সামারিয়ার অবরোধ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত, সেই সুযোগে মেরোদোক-বালাদান ব্যাবিলনের সিংহাসন দাবি করেছিলেন, এবং তাঁর সেই দাবির সমর্থনে ইলাম-রাজ খুম্‌বানিগাস ব্যাবি-লোনিয়া আক্রমণ করলেন। সুতরাং সামারিয়া অধিকার করবার পর সসৈন্যে সারগনকে ব্যাবিলোনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ইলাম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটল। তখন ব্যাবিলোনীয়গণ মেরোদোক-বালাদানকে নৃপালপদে বরণ করেছিল, এবং সেই থেকে তিনি আসিরিয়ার পার্শ্বদেশে কণ্টকস্বরূপ হয়ে রইলেন। এখন যেই উত্তরাঞ্চলে দিগ্বিজয়ী হয়ে সম্রাট সারগন ফিরে এলেন, মেরোদোক-বালাদানও তখন প্রমাদ গণলেন। ব্যাবিলোনিয়া পুনরুদ্ধার করবার জন্য সারগন সসৈন্যে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হলেন। মেরোদোক-বালাদানের সাহস হল না যে তাঁর অগ্রগতির প্রতিরোধ করেন। তাই ত্বরান্বিতভাবে ব্যাবিলন ত্যাগ করে ইলাম দেশে উপস্থিত হলেন তিনি আশ্রয় লাভের জন্য, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইলাম-রাজ শত্রুক নানখুনদি সারগনের ভয়ে পর্বতমধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন। সাহায্য প্রার্থনা করে মেরোদোক তাঁকে সিংহাসন, রাজদণ্ড ও প্রচুর রৌপ্য দান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইলাম-রাজ কিছুতেই সারগনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সম্মত হলেন না। তখন ক্রুদ্ধ মেরোদোক-বালাদান তাঁর রাজধানী লুণ্ঠন করে প্রত্যাগমন করলেন ব্যাবিলনে নয়—পিতৃপুরুষের সাগরভূমিতে।

এদিকে মেরোদোক-বালাদানের ব্যাবিলন ত্যাগের সঙ্গেই নগরের

পুরোহিতগণ সদলবলে সারগনের শিবিরে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা করলেন। রাজধানী অবিলম্বে অধিকার করবার জন্য সারগনকে অনুরোধ করলেন তাঁরা, এবং রাজধানী অধিকৃত হবার পর ব্যাবিলনের রাজপদে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। এই রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ব্যাবিলনের চিরাচরিত 'বেলের হাত-ধরা' ("taking the hand of Bell") অনুষ্ঠানটি যথারীতি সম্পন্ন হয়েছিল। ইতিমধ্যে মেরোদোক-বালাদান সাগরভূমির রাজধানীকে সুরক্ষিত করবার জন্য পরিখা খনন করেছিলেন, কিন্তু সারগনের তুর্ধর্ষ বাহিনী সেই অন্তরায় অতিক্রম করে অনায়াসে রাজধানী অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল। মেরোদোক-বালাদান শিবির ত্যাগ করে তুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হল এবং প্রাসাদে সঞ্চিত প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য ধনসম্পদ সারগনের হস্তগত হল। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, পত্নী-পুত্র-কন্যাসহ মেরোদোক-বালাদান বন্দী হয়েছিলেন। আর একটি শিলা-লিপির বিবরণে সারগন বলেছেন : "মেরোদোক-বালাদান নিজের তুর্বলতা অনুভব করে অত্যন্ত ভীত হয়েছিল; আমার বিপুল শক্তিমত্তার মহাত্রাস তাকে থরহরি কম্পিত করেছিল; সে তার রাজদণ্ড ও সিংহাসন পরিত্যাগ করল; আমার প্রেরিত দূতের সমুখে সাষ্টাঙ্গে ভূমি চুম্বন করল; তুর্গ পরিত্যাগ করে পলায়ন করল সে—আর তার কোন চিহ্নই দেখা যায় নি।"

লৌহযুগ : 'তুর্-সারুকিন' বা সারগন-নগর

পারস্যের পার্বত্য অঞ্চলের মিডিস ও ইলাম থেকে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সারগনের এখন আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এ যাবৎ সর্বত্র যুদ্ধে তিনি বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন, তার একটি কারণ এই যে, লৌহনির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার প্রথমে তিনিই আরম্ভ করেন। লৌহযুগ দেখা দিয়েছিল তখন। একদা তাম্র ও ব্রঞ্জের আবির্ভাবের সঙ্গে প্রস্তরাস্ত্রের উপযোগিতা হ্রাস পেয়েছিল, লৌহ-নির্মিত অস্ত্র ব্যবহারের ফলও হয়েছিল তেমনি। লৌহ-অস্ত্রধারী বাহিনী কর্তৃক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পর সারগন নানারূপ শান্তিপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করলেন। শিল্প-বাণিজ্য ও বিদ্যার উৎসাহদাতা ছিলেন তিনি। সর্বপ্রধান কীর্তি তাঁর—'তুর্-সারুকিন' অর্থাৎ সারগন-নগর নামক একটি শহর

নির্মাণ। আশি হাজার লোকের বাসের উপযোগী নগর—রাজপ্রাসাদের আয়তন পাঁচ শ' একর। এমন প্রকাণ্ড জমকালো শহর ও বিরাট প্রাসাদ ব্যাবিলনের বিপুল সমৃদ্ধির যুগেও দেখা যায় নি। বর্তমান খোরসাবাদে ধ্বংসস্তূপ খনন করে এই প্রাসাদটিকে আবিষ্কার করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক বোট্টা (Botta) ১৮৪২ খৃস্টাব্দে। এখানে কতগুলি বৃষমূর্তি ও একটি 'ভিত্তিমূলের চোঙা' (foundation cylinder) উদ্ধার করা হয়েছে, যার ওপর নগরনির্মাণ-কাহিনী বিস্তারিতভাবেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সারগন। তিনি বলেছেন, "দিবারাত্র পরিশ্রম করে আমি শহরের নকশা প্রস্তুত করেছি, দেবগণের মন্দির হর্ম্যরাজি ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করবার জন্য। তারপর আমি কার্য আরম্ভ করবার আদেশ দিলাম।" নানা স্থান থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়েছিল, এবং যে ভূমিসমূহের ওপর নগর প্রতিষ্ঠিত হল, সেই ভূমির মালিকদের ন্যায্য মূল্য প্রদান করেছিলেন সারগন। তিনি বলেছেন, "দেবতারা আমার ওপর ন্যায় ও নীতির বিধানমত প্রজা শাসনের ভার অর্পণ করেছেন, দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য, তার ক্ষতিসাধনের জন্য নয়। আমি জমির যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করে সেই মূল্য মালিকদের প্রদান করেছি। যারা মূল্য গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছে, আমি তাদের ভূমির পরিবর্তে ভূমি দান করেছি।"

রাজপ্রাসাদ ও ভাস্কর্য

পাথর দিয়ে বাঁধানো কয়েকটি রাজপথ ছাড়া সারগন-নগরের আর কোন চিহ্নই এখন নেই। অবশ্য তোরণের ভিত্তিমূল ও প্রাকারের ভগ্নাংশগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। নগরে তোরণের সংখ্যা ছিল আটটি, প্রত্যেকটি দেব-দেবীর নামে উৎসর্গীকৃত। সু-উচ্চ তোরণগুলির সম্মুখে প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ সিংহ ও অতিবৃহৎ পক্ষযুক্ত বৃষ-মূর্তি (winged bulls)—দেহ বৃষের, মুণ্ড শ্মশ্রুমান মনুষ্যের। নগরপ্রাকারটির বহির্দেশ কারুখচিত এবং মাঝে মাঝে জল নিঃসারণের জন্য নলের (drain-pipe) ব্যবস্থা দেখা যায়। রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনা নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ, যেহেতু সেটির অবস্থা অপেক্ষাকৃত অক্ষুণ্ণ। স্থাপত্যের সৌষ্ঠব ও বৈচিত্র্য অনুপম, কক্ষের অভ্যন্তরে প্রাচীরে খোদাই-করা সংখ্যাতীত ভাস্কর্যের প্রতিমূর্তিগুলি রাজার জীবনের

নানান দিক পরিব্যক্ত করছে। ভাস্কর্যের আকার ও পরিব্যাপ্তি বিস্ময়কর। গৃহপ্রাচীরের বহির্দেশে চব্বিশ জোড়া অতি বৃহৎ বৃষমূর্তি উৎকীর্ণ, আর হল-ঘরগুলির ভিতর দিকের মূর্তি-খোদাই প্রস্তরখণ্ডসমষ্টির দৈর্ঘ্য অন্তত দুই মাইল। নগরের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৭১২ অব্দে এবং রাজপ্রাসাদ ও যাবতীয় ভাস্কর্য সহ নির্মাণ-কার্য খৃঃ পূঃ ৭০৭ অব্দে পরিসমাপ্ত হয়। মাত্র পাঁচ বছর সময়মধ্যে এরূপ বিশাল নির্মাণ-কার্য অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক। আসিরীয় শিল্পের পূর্ব-নমুনাগুলির তুলনায় এই নূতন উদ্যম ছিল এত বিশাল, শিল্পসৃষ্টি আকারে ছিল এত বৃহৎ এবং পরিমাণে এত অধিক যে অল্পসংখ্যক স্থানীয় শিল্পীর দ্বারা এই অমানুষিক পরিশ্রমের কার্য কখনো সম্ভব হয় নি। বিশাল সাম্রাজ্যের নানা স্থান থেকে শিল্পী ও কারিগর সংগ্রহ করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তারা যে একই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা লাভ করে নূতন আসিরীয় বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিভিন্ন দেশের নানান জাতীয় মানুষ দ্বারা নবনির্মিত শহরটিকে পরিপূর্ণ করেছিলেন সারগন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, "পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে বহুভাষাভাষী—কি পর্বতচারী কি উপত্যকার অধিবাসী—নানান জাতীয় বিদেশীদের বন্দী করে এনেছি আমি, প্রভু আসুরের কৃপায় ও নিজের বাহু-বলে। আমি তাদের এক ভাষা ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছি এবং শহরমধ্যে তাদের বাসের স্থান দিয়েছি। বিচক্ষণ আসুরপুত্রগণকে তাদের ওপর দৃষ্টি রাখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছি। পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করেছি তাদের শিক্ষাদান করবার জন্য—যে শিক্ষা তাদের মনে ঈশ্বর ও রাজার প্রতি ভয়-ভক্তির সঞ্চার করবে।" সারগন দাবি করেন পূর্ত-কার্যের দ্বারা শুধু যে তিনি জমির ফসল বৃদ্ধি করেছেন তা নয়—যেসব অনুর্বর পাথুরে ভূমি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাল থেকে অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেই জমি-গুলিকেও শস্যশ্যামল করে তুলেছেন। মজা নদীর পঙ্কোদ্ধার করেছেন তিনি। খাদ্যশস্যে গোলাঘর পূর্ণ করেছেন, তিসি ও তৈলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন এইজন্য যে, মূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রজাগণকে যেন ক্লেশভোগ করতে না হয়। দেখা যায়, দয়ালেশশূন্য ক্রূরস্বভাব হিংস্র প্রকৃতির আসিরীয় নৃপতিদের অন্তরেও একটুখানি কোমল স্থান সংরক্ষিত ছিল প্রজাকুলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য।

একখানি শিলালিপিতে সারগনের প্রার্থনা এইরূপ : "এই রাজপ্রাসাদে আমি যেন সঞ্চয় করতে পারি প্রচুর ধনরত্ন, অন্যান্য দেশের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি, পর্বত ও উপত্যকা জাত বন ও কৃষি সম্পদ…আমি সারু কিনু (সারগন) যেন সুস্থ দেহে বহাল তবিয়তে দীর্ঘজীবী হয়ে দীর্ঘকাল এই প্রাসাদে বসবাস করতে পারি।" কিন্তু রাজার এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নি। এমনি বিধি-বিড়ম্বনা যে নগর প্রবেশের পনের মাস পরেই অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন তিনি। পিতৃপুরুষের ভিটা থেকে উৎখাত করে বলপূর্বক যাদের তিনি শহরে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর প্রতি তাদের অন্তর ছিল বিদ্বেষ-পূর্ণ। এই শত্রুভাবাপন্ন বিদেশীদের মধ্যে কেউ যদি তাকে হত্যা করে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে থাকে, তবে তাতে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই।

॥ চার ॥

সারগন-বংশীয়দের কাহিনী

'সেন্‌নাচেরিবের ধ্বংসলীলা'

সারগনের পুত্র সিন-আকি-ইরিব বা সেন্‌নাচেরিব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন ৭০৫ খৃস্ট পূর্বাব্দে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহের পূর্বে আসিরিয়ার নৃপতিবৃন্দ সম্বন্ধে জগতের জ্ঞান ছিল অপ্রচুর, কিন্তু সেন্‌নাচেরিব ছিলেন একমাত্র ভূপতি যাঁর জীবনবৃত্তান্ত সর্বকালেই ছিল সুপরিচিত, কেননা বাইবেলের তিনখানা গ্রন্থে তাঁর বিজয়াভিযানের কাহিনী বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পিতার মতই দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তিনি—পঁচিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে উনিশ বছরই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়েছিলেন। আট-নয়টি অভিযানে ৮১টি নগর ও ৮২০টি গ্রাম ভস্মসাৎ করেছিলেন তিনি, দু'লক্ষেরও অধিকসংখ্যক শত্রুসৈন্য তাঁর বন্দী হয়েছিল, এই বৃত্তান্তগুলি সরকারী বিবরণে লেখা রয়েছে। এই রাজার সর্বাত্মক ধ্বংসের বিষয় অবলম্বনে ইংরেজ কবি বাইরন 'সেন্‌নাচেরিবের ধ্বংসলীলা' (Destruction of Sennacherib) শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেছিলেন, তার কয়েকটি ছত্রের অনুবাদ এইরূপ :

> আসুরের পতি আসে দ্রুতগতি,
> বাঘ মেষপাল মাঝে—
> সাথে সেনাদল শোভে ঝলমল
> অপরূপ স্বর্ণসাজে।
> বর্শাফলক করে চকমক—
> তারা যেন সিন্ধুনীরে,
> নীল ঢেউগুলি উঠে ফুলি ফুলি
> নিশীথে গ্যালিলি তীরে।

বিট-ইয়াকিন-পতি মেরোদোক-বালাদানের সঙ্গে আমাদের পূর্বপরিচয় ঘটেছে অনেকবার—ব্যাবিলোনিয়ায় আবার সেই মেরোদোক-বালাদানের আবির্ভাব হয়েছিল। দুই বৎসর অন্তর্যুদ্ধের পর এবারও নিজেকে তিনি

'কার-তুনিয়াস', অর্থাৎ ব্যাবিলোনিয়ার রাজা বলে ঘোষণা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেন্নাচেরিব তাঁর বিবরণে বলেছেন, "আমার এই প্রথম সংগ্রামে কার-তুনিয়াসের অধিপতি মেরোদোক-বালাদানকে এবং তার সহায়ক ইলামবাহিনীকে পরাস্ত করেছি কিশ নগরের সম্মুখে। প্রাণরক্ষার্থ শিবির পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছিল সে। যুদ্ধের ডামাডোলে সে যেসব রথ, অশ্ব, শকট, গর্দভ ফেলে গিয়েছিল, সেগুলি আমি হস্তগত করেছি। ব্যাবিলনের প্রাসাদে প্রবেশ করে কোষাগার অধিকার করেছি আমি।" যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মেরোদোক-বালাদান পূর্বের মতই স্বীয় পূর্ব-পুরুষের জলাভূমি বিট-ইয়াকিন প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেন্নাচেরিব তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন না, যেহেতু পশ্চিমাঞ্চলে প্রচুর ধূমোদ্গম দেখা দিয়েছিল, যা থেকে তিনি সহজেই অনুমান করেছিলেন যে সেখানে বিদ্রোহের বহ্নি জ্বলে উঠেছে। আসিরিয়ার আশ্রিত ও বিশ্বাসভাজন বেল-ইবনি নামক জনৈক স্থানীয় ব্যক্তিকে ব্যাবিলনের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন সেন্নাচেরিব। ইথিওপীয় বংশীয় তাহরকা বা তারকু তখন মিশরের ফারাও—সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বিদ্রোহে তাঁর ছিল পূর্ণ সমর্থন। কিন্তু তিনি কোনরূপ সাহায্য প্রেরণের পূর্বেই সেন্নাচেরিব সসৈন্যে সিরিয়া অতিক্রম করে জুডার সুরক্ষিত নগর-সমূহ অধিকার করলেন। প্যালেস্টাইনে জুডা প্রদেশের রাজা হেজেকিয়া তখন প্রমাদ গণলেন। সমুদ্রতটের নিকটবর্তী লাকিস নগরে আসিরিয়া-রাজ সমীপে দূত পাঠিয়ে নিবেদন জানালেন হেজেকিয়া :

"আমি আপনার বিরক্তিভাজন হয়েছি; আপনি প্রত্যাবর্তন করুন। আমার ওপর যে ভার স্থাপন করবেন আমি তা-ই বহন করব। তখন আসিরিয়া-রাজ জুডার অধিপতি হেজেকিয়ার ওপর তিন শ' ট্যালেণ্ট রৌপ্য ও ত্রিশ ট্যালেণ্ট স্বর্ণ করস্বরূপে ধার্য করলেন।

"প্রভুর মন্দিরের ও রাজকোষের সব রৌপ্য তাঁকে দিয়েছিলেন হেজেকিয়া।

"সেই সঙ্গে হেজেকিয়া প্রভুর মন্দিরের দরজা ও স্তম্ভগুলির ওপর খচিত স্বর্ণ খসিয়ে নিয়ে আসিরিয়া-রাজকে অর্পণ করেছিলেন।"

(II Kings 18)

বাইবেলের বর্ণনায় আরও দেখা যায় যে, সেন্নাচেরিব স্বর্ণরৌপ্য উপঢৌকন গ্রহণ করেই নিরস্ত হন নি। বিরাট বাহিনী সহ সেনানায়কদের তিনি জেরুসালেমে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণের সমুখে আসিরিয়ারাজের দূত রাব-সাকেহ্ দস্তুরমত একটি প্রচার-কার্য শুরু করলেন জুডা ও মিশরের বিরুদ্ধে :

"রাব-সাকেহ্ তাদের বললেন, হেজেকিয়াকে বল তোমরা, আসিরিয়া-রাজ জিজ্ঞাসা করেন, কোন ভরসায় আছ তুমি ?

"তুমি বৃথাই নিজেকে আশ্বাস দিয়েছ যে যথেষ্ট বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুদ্ধ করবার সামর্থ্য আছে তোমার। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ তুমি কার ভরসায় ?

"চেয়ে দেখ, মিশর একটি ভগ্ন যষ্টিবিশেষ। মিশর-রাজের ওপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের অবস্থা হয় ভগ্ন যষ্টি হাত থেকে খসে পড়ে নির্ভরশীল ব্যক্তিকে যেমন বিদ্ধ করে, ঠিক তেমনি।"

(II Kings 18)

রাজদূত রাব-সাকেহ্‌র কথা শুনে ইহুদি নেতারা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সরাসরিভাবে প্রজাবৃন্দের কাছে বক্তৃতা করছেন রাজদূত হিব্রু ভাষায় যা সর্বসাধারণের বোধগম্য, কিন্তু তাঁরা চান দূতের আলোচনা চলে শুধু তাঁদেরই সঙ্গে, জনসাধারণের সঙ্গে নয়।

"তখন হিলকিয়া-পুত্র ইলিয়াকিম বললেন, অনুগ্রহ করে আপনার ভৃত্যদের সঙ্গে সিরীয় ভাষায় আলাপ করুন, যেহেতু আমরা ঐ ভাষা বুঝি। ইহুদিদের ভাষায় আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না— প্রাচীরের উপর উপবিষ্ট ব্যক্তিরা শুনতে পাবে।

"কিন্তু রাব-সাকেহ্ তাদের বললেন, আমার প্রভু কি এই কথাগুলি শোনাতে পাঠিয়েছেন শুধু তোমাকে ও তোমার প্রভুকে ? তিনি কি আমায় ঐ প্রাচীরের ওপর উপবিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠান নি এই বলে যে তোমাদের সঙ্গে তারাও যেন তাদের নিজ বিষ্ঠা ভক্ষণ করে আর নিজ মূত্র পান করে ?

"তারপর রাব-সাকেহ্ দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে ইহুদি-ভাষায় জনসাধারণকে সম্বোধন করে বললেন, আসিরিয়া-রাজের বাণী শ্রবণ কর।

হেজেকিয়া আর যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করে, যেহেতু সে তোমাদের আমার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।······

"আসিরিয়া-রাজ বলেছেন, উপঢৌকন প্রদান করে আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হও তোমরা—আমার কাছে এস তোমরা। তারপর নিশ্চিন্ত মনে তোমরা আপন কুঞ্জের দ্রাক্ষা, নিজ বৃক্ষের ফিগ-ফল ভক্ষণ কর, এবং নিজের জলাধারের জল পান কর।"

(II Kings 18)

দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন রাজদূত, কিন্তু প্রজারা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইল কেননা জুডা-রাজের আদেশ ছিল, কেউ যেন কোন কথার জবাব না দেয়।

সেন্নাচেরিব দূত মারফত হেজেকিয়াকে একটি পত্র পাঠিয়েছিলেন। সেই পত্র পাঠ করে জুডা-রাজ হতাশ আক্রোশভরে তাঁর পরিধেয় বসন ছিন্ন করে দেবমন্দিরে ধর্না দিয়েছিলেন :—"কান পেতে শোন প্রভু, চোখ মেলে দেখ। সেন্নাচেরিবের কথা শোন, সে জাগ্রত ঈশ্বরের নিন্দা করেছে।" তখন প্রফেট ইসায়া হেজেকিয়াকে সান্ত্বনা দিলেন ঈশ্বরের মুখঃনিসৃত একটি দৈববাণী প্রচার করে। ইহুদিদের ঈশ্বর জাভে (Yaveh) যেন সেন্না-চেরিবকে উদ্দেশ করে বলছেন :

"আমার বিরুদ্ধে তোমার ক্রোধের তাণ্ডব আমার কানে এসে পৌঁছেছে। তাই আমি তোমার নাকে বঁড়শি গেঁথে দেব, মুখটি দেব বল্গা দিয়ে বেঁধে, এবং সেই অবস্থায় আমি তোমায় ঘুরিয়ে যে পথ ধরে এসেছ সেই পথে ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

(II Kings 19)

প্রফেট ইসায়ার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবত ধর্মীয় আকারে সমসাময়িক কালের ইতিহাস বর্ণনা মাত্র। সমুদ্রতীর ধরে অগ্রসর হয়ে সেন্নাচেরিব মিশরের দ্বারদেশে এসে উপনীত হয়েছিলেন, এলটেকে (Eltekeh) নামক স্থানে মিশরীয় বাহিনীর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধও হয়েছিল, এবং সেই যুদ্ধে জয়ের দাবি করেছেন তিনি, কিন্তু তা সত্বেও দৈব দুর্বিপাকে তাঁর পরাজয় ঘটল শত্রু-হস্তে নয়, মহামারীর আক্রমণে। সৈন্যশিবিরে প্লেগ দেখা দিয়েছিল, বহু সৈন্যের মৃত্যু হল এবং সেজন্য তাঁকে কলঙ্ক নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে হল। এই দুর্দৈব প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে এইরূপ :

"সেই রজনীতে ঈশ্বরের দূতগণ বহির্গত হলেন এবং আসিরীয় শিবিরে সাত সহস্রেরও ঊর্ধ্বসংখ্যক সৈন্যকে আঘাত করলেন। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল তাদের মৃতদেহ। অনন্তর আসিরিয়াধিপ সেন্‌না-চেরিব নিনেভে নগরে প্রত্যাগমন করলেন।"

(II Kings 19 ; II Chronicles 32)

হিব্রু রাজ্য ধ্বংসকারী আসিরিয়া—হিব্রুদের ধর্মগ্রন্থে আসিরিয়া-রাজ সেন্‌না-চেরিবের পরাজয় যে ঈশ্বরের দণ্ডরূপেই বর্ণিত হবে, তা আদৌ বিচিত্র নয়।

ব্যাবিলন ও ইলাম

সেন্‌নাচেরিবের রাজত্বকালে ব্যাবিলন একাধিক বার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং সেই সুযোগে ইলাম-রাজের সাহায্যে ব্যাবিলন পুনঃপুনঃ অধিকার করেছেন সাগরভূমির অধিপতিরা। মেরোদোক-বালাদান চিরদিনের জন্য, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন সুজুব নামে একজন ক্যালডিয়ান নৃপতি। ক্যালডিয়া প্রদেশে জলাভূমির মধ্যে যুদ্ধাভিযান একটি অসম্ভব ব্যাপার—এ পর্যন্ত কোন আসিরীয় নৃপতিই এই দুঃসাহসিক অভিযানে প্রবৃত্ত হন নি। সেন্‌নাচেরিব একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। বন্দী ফিনিসীয় ছুতার মিস্ত্রীদের আদেশ দিলেন তিনি অনেকগুলি জলযান নির্মাণ করবার জন্য। ফিনিসীয় জাহাজের ধাঁচে বৃহৎ তরীসমূহ প্রস্তুত করে টাইগ্রিস নদীর জলে ভাসানো হল, এবং সেই নৌকাযোগে জলপথে সাগরসংগমের সমীপবর্তী জলা-ভূমিতে অভিযানার্থ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন সেন্‌নাচেরিব। 'সুমের ও আক্কাডের অধিপতি' বলে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন যিনি, সেই সুজুবকে বন্দী করে আসিরিয়ায় প্রেরণ করা হল এবং তার স্থলে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হলেন সেন্‌নাচেরিবের জ্যেষ্ঠ পুত্র আসুর-নাদিন-সুম। ছয় শতক পূর্বে আসিরিয়া-রাজ টুকুল্‌তি-নিনিব তাঁর একটি 'কার-দুনিয়াস-বিজয়ী'-মোহরাঙ্কিত অঙ্গুরীয় রেখে এসেছিলেন ব্যাবিলনে, এ যাবৎ যা রক্ষিত ছিল স্মৃতিচিহ্নরূপে—ব্যাবিলন থেকে সেই অঙ্গুরীয়টি উদ্ধার করেছিলেন সেন্‌নাচেরিব, বৃত্তান্তটির বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে একটি শিলালিপিতে।

তারপর আরম্ভ হল ইলাম আক্রমণ। আসিরিয়ার চিরাচরিত পদ্ধতি-

মত নগরের পর নগর দহন, লুণ্ঠন, ধ্বংস চলতে লাগল। এই ধ্বংসকাণ্ডের যে বিবরণ সেন্নাচেরিব নিজে লিখে গেছেন তাই থেকে আমরা আসিরিয়ার কুলিশ-কঠোর নির্মমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাই। বিবরণটি এই : "চৌত্রিশটি দুর্গ অবরোধ করে সেগুলির ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য নগর আমি অধিকার করেছি, নগরবাসীদের দাসত্বশৃঙ্খল পরিয়েছি, নগরগুলি ধ্বংস ভস্মসাৎ করেছি। মহাযজ্ঞের মত সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ধূম্ররাশি দিয়ে আকাশ-

আসিরীয় বাহিনীর দুর্গ আক্রমণ—দুর্গ-মূলে অগ্নিসংযোগ—ঊর্ধ্বে প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা
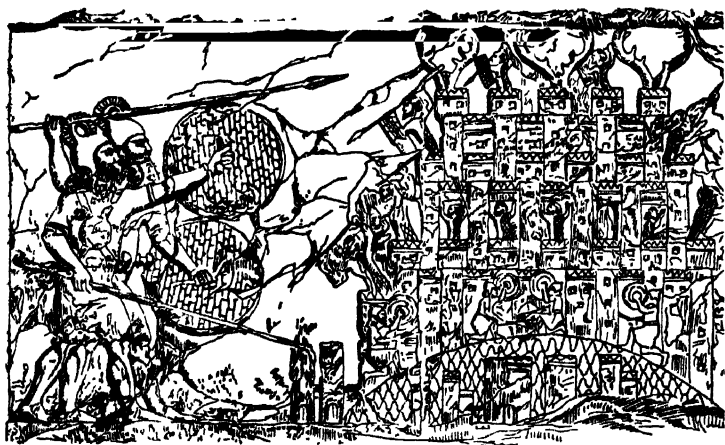
মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করেছি।" ইলাম-রাজ খুতুর-নানখুণ্ডি পলায়ন করে পর্বতে আশ্রয় নিলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেশটি আততায়ীর কবল থেকে উদ্ধার পেল প্রকৃতির কৃপায়। শীত এসে পড়েছিল, এবং শৈত্যের প্রাবল্য দেখা দিল অত্যধিক, যার জন্য আসিরীয় বাহিনী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, এবং মুষলধারায় বৃষ্টি নামল—তারপরই তুষারপাত শুরু হল। তখন দৈবের হস্তে দ্বিতীয়বার বিপর্যস্ত হয়ে আসিরীয় বাহিনীকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল।

খালুলির যুদ্ধ : ব্যাবিলন নিশ্চিহ্ন

আবার ব্যাবিলনে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন ভূতপূর্ব ব্যাবিলন-রাজ মুজুব। কিরূপে বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন

তিনি, তা আমাদের জানা নেই—সম্ভবত আসিরিয়া থেকে পলায়ন করে এখানে এসেছিলেন। ব্যাবিলনের অধিবাসীরা আবার তাঁকে রাজপদে বরণ করল। আসিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ব্যাবিলন ইতিপূর্বেও ইলামের সাহায্য ভিক্ষা করেছে। সেই পূর্বকার নজিরের অনুসরণে ব্যাবিলনের মন্দিরগুলির ভাণ্ডার শূন্য করে ধনরত্ন প্রেরণ করলেন সুজুব ইলাম-রাজ উম্মন-মিনান-কে, এবং সেই সঙ্গে করলেন একটি আক্রমণাত্মক সন্ধির প্রস্তাব। ইলাম-রাজ আসিরিয়া আক্রমণ করতে সম্মত হলেন। তখন ব্যাবিলন ও ইলামের মিলিত বাহিনী আক্রমণার্থ আসিরিয়ার দিকে অগ্রসর হল। টাইগ্রিস নদীর তীরে খালুলি নামক নগরের নিকট উভয় পক্ষের সংগ্রাম (battle of Khaluli) বাধে ৬৯২ খৃস্ট পূর্বাব্দে। এই যুদ্ধের একটি নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন সেন্নাচেরিব—রচনার বর্ণনাভঙ্গি সাহিত্যপ্রতিভার বিলক্ষণ পরিচয় দেয়। এবারও মিলিত শত্রুশক্তিকে বিধ্বস্ত করে জয়ী হলেন সেন্নাচেরিব।

ব্যাবিলনের ধৃষ্টতার প্রতিশোধ নিলেন সেন্নাচেরিব খুবই ভীষণ রকমের। ইলামের পার্বত্য অঞ্চল দুরধিগম্য বলে অনেকটা নিরাপদই ছিল, কিন্তু ব্যাবিলনের পক্ষে উদ্ধার লাভের কোন পথই রইল না। বিরাট ধ্বংসকাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল। নাগরিকের বাসগৃহ, হর্ম্যরাজি, রাজপ্রাসাদ—সবই ভিত্তিমূল থেকে চূড়া পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করে অগ্নিদগ্ধ করা হল। ধ্বংসের পূর্বে মন্দিরগুলির ধনরত্ন লুণ্ঠন এবং বিগ্রহ ভগ্ন করা হয়েছিল। হাম্মুরাবির স্মৃতি-বিজড়িত প্রাচীন নগর ব্যাবিলনকে এমনভাবেই নিশ্চিহ্ন করেছিলেন সেন্নাচেরিব যে পুরনো কোন বস্তুই আর অবশিষ্ট রইল না, অতীতের সাক্ষ্য দেবার জন্য। এই ধ্বংস-কার্যের ওপর শেষ যবনিকা টেনে দিয়েছিলেন তিনি ইউফ্রেটিস নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দিয়ে একটি অতি বৃহৎ ভূখণ্ডকে জলাভূমিতে পরিণত করে। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই নির্মম-ভাবে হত্যা করে মৃতদেহের পাহাড় তৈরি করা হয়েছিল। ব্যাবিলনের দেবতা মারদুককে আসিরীয় দেবাদিদেব আসুরের পরিচারক করে রাখা হল। নগর-দেবতার দুর্বলতার জন্যই তার এই হীনাবস্থা, এমন কথা মনেও করে নি ব্যাবিলোনীয়রা। তারা ব্যাখ্যা করল এই যে, জনগণকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্যই দেবতা নিজের পরাভব মেনে নিয়েছেন। বাইবেলেও ইহুদি

জাতির দৈন্যদুর্দশার অনুরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, অর্থাৎ জাতির দুর্ভোগ ঈশ্বরদত্ত শাস্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ

এক দিকে যেমন এই ধ্বংসকাণ্ড, অন্য দিকে আসিরিয়ার রাজধানী নিনেভের পুনর্নির্মাণ ও শোভাবর্ধন পূর্ণ উদ্যমেই চলেছিল। সারগন নির্মিত দুর-সারিকিন পরিত্যাগ করে নিনেভে নগরেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেন্নাচেরিব। প্রভূত অর্থ ব্যয় করে আপন তত্ত্বাবধানে তিনি রাজপ্রাসাদ ও সৌধ নির্মাণ করলেন, সরু রাজপথগুলিকে প্রশস্ত করলেন। প্রাকার-বেষ্টনী ও দুর্গ গঠন করে নগরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। নগরে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না—তৃষ্ণাতুর নাগরিকেরা আকাশপানে চেয়ে ফটিক-জলের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত। অভিযোগের সুরেই বলেছেন সেন্নাচেরিব, "আমার রাজকীয় পিতৃগণ পয়ঃপ্রণালী খনন দ্বারা জল সরবরাহ করে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান করেন নি। দেবতার আদেশে আমি আসিরিয়া-রাজ সেন্নাচেরিব এই কাজটি করবার সংকল্প করেছি।" এই সংকল্প কার্যে পরিণত করতে বিলম্ব করেন নি তিনি। ষোলটি খাল কেটে নদীর জলধারা ভিন্ন মুখে প্রবাহিত করেছিলেন, এবং সেই সঙ্গে টাইগ্রিস নদীর প্রচণ্ড ভাঙনও রোধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সেন্নাচেরিবের প্রাসাদটি ছিল আকারে অতি বৃহৎ এবং সাজসজ্জায় অতুলনীয়। এমন সুবিশাল মনোহর হর্ম্য আসুরবানিপাল ব্যতীত আর কোন আসিরীয় নৃপতিই নির্মাণ করেন নি। আট একর ভূমির ওপর নির্মিত অট্টালিকায় সত্তর কি আশিটি কক্ষ। প্রাসাদে জল সরবরাহের জন্য ব্রঞ্জ নির্মিত যন্ত্রের ব্যবহার হত। হলঘরগুলির দেয়ালের গায়ে প্রস্তরে উৎকীর্ণ চিত্রাবলী রাজার জীবনকাহিনীর চাক্ষুষ বিবরণ। চিত্রগুলির অলংকার (ornamentation) বিশেষরূপে বাস্তবভাবাপন্ন। পর্বত, বৃক্ষ, নদী, হ্রদ প্রভৃতি সুন্দরভাবে চিত্রে প্রতিফলিত রয়েছে বর্ণিত ঘটনাবলীর প্রাকৃতিক পরিবেশরূপে। তা ছাড়া, বন্য পশু, উড়ন্ত পাখী, জলের মাছও দেখা যায়। এই সময়কার আসিরীয় শিল্প উৎকর্ষের একটি বিশিষ্ট স্থানে উপনীত হয়েছিল।

সেন্নাচেরিবের মৃত্যু : আস্থর-আখি-ইদ্দিন বা এসারহেডন

আততায়ীর হাতে পিতার মৃত্যুর কথা স্মরণ করেই দুর-সারিকিন নগর পরিত্যাগ করা নিরাপদ মনে করেছিলেন সেন্নাচেরিব—এই কথাটি যদি সত্য হয়, তবে তাঁর সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, নিনেভে নগরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে (খৃঃ পূঃ ৬৮১)। সেন্নাচেরিবের মৃত্যু সম্বন্ধে বাইবেলের বিবরণ এইরূপ :

> "তারপর তিনি যখন নিসরোক-দেবের মন্দিরে পূজায় রত ছিলেন, তখন তাঁর দুই পুত্র আদ্রামেলেক ও সারেজের তাঁকে তরবারিবিদ্ধ করল। তারা আরমেনিয়া দেশে পলায়ন করল। তখন তাঁর পুত্র এসারহেডন তাঁর স্থলে রাজত্ব করেন।" *(II Kings 19)*

সেন্নাচেরিবের চতুর্থ পুত্র আস্থর-আখি-ইদ্দিন বা এসারহেডন। ইতিপূর্বেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়েছিল, সম্ভবত ব্যাবিলনে। পিতৃহন্তা পুত্রদ্বয় উত্তরাঞ্চলে উরারতু প্রদেশে কেন পলায়ন করেছিল, তার কোন কারণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে, প্রজাবিদ্রোহের ফলেই দুষ্কৃতিকারীদের দেশত্যাগ করতে হয়েছিল, এবং শত্রুরাজ্যের আশ্রয় নিয়েছিল তারা স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু এসারহেডনের কর্মতৎপরতায় তাদের সে উদ্যম অচিরেই ব্যর্থ হয়েছিল। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন এসারহেডন। তিনি বলেছেন, "আমি সিংহের মত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম, আমার অন্তরাত্মা গর্জে উঠেছিল।" পিতৃবংশের প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। পিতার মৃত্যুকালে তিনি নিনেভে নগরে ছিলেন না—তিনি ছিলেন সম্ভবত নাইরি-ভূমিতে। শিলালিপিতে বলা হয়েছে : "দেবতারা আমার প্রার্থনা শুনলেন। আদেশ দিলেন, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। আমরা তোমার পাশে থাকব। তোমার শত্রুদের ধ্বংস করব আমরা।" দেবতার এই অভয়বাণী শুনে ইউফ্রেটিস নদীর উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা করলেন এসারহেডন। যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করলেন। "রণচণ্ডী ইস্‌তার দেবী আমার পার্শ্বদেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শত্রুগণের ধনুর্বাণ পরাহত করেছিলেন তিনি, সারিবদ্ধ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করেছিলেন। তখন সৈন্যদলের মধ্যে ধ্বনি উঠল : 'ঐ আমাদের রাজা'।"

এসারহেডন কায়েমভাবেই সিংহাসনে বসলেন। পিতৃহন্তাদের পরিণামে কি দশা হয়েছিল তার কোন উল্লেখ বিবরণে নেই।

ব্যাবিলোনিয়ায় ও ইলামে বিদ্রোহের পর্ব পূর্বে যেমন চলে এসেছিল, এবারও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। এসারহেডনের বিব্রত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মেরোদোক-বালাদানের পুত্র উর অধিকার করে বসল, এবং এসারহেডনের রাজ্যাভিষেকের পর কোন উপঢৌকন পাঠাল না তাঁকে বশ্যতার নিদর্শন-রূপে। সেই বিদ্রোহ অচিরে দমন করলেন এসারহেডন, এবং বিদ্রোহীর ভ্রাতার হস্তে সাগরভূমির শাসনভার সমর্পণ করলেন। বিদ্রোহ-দমন ব্যাপারে পিতার অনুসৃত নীতির আমূল পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। বিদ্রোহীর সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য ব্যাপক ধ্বংস ও নির্মম হত্যাকাণ্ড শেষ পর্যন্ত যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তিনি হয়তো তা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, এবং সেইজন্যই শান্তির পথে তোষণ নীতিকে আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছিলেন। পিতা কর্তৃক বিধ্বস্ত ব্যাবিলনকে পুনর্নির্মাণ করলেন তিনি। সেখানকার ভগ্ন মন্দিরগুলির স্থলে নূতন মন্দির নির্মাণ করা হল। ব্যাবিলনবাসীদের মনস্তুষ্টির জন্য সেখানে আসিরীয় দেব-দেবীর প্রাধান্য বিলুপ্ত করে মারদুককে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। ইলামে যখন মন্বন্তর দেখা দিল, তিনি তখন সেখানে যথেষ্ট সাহায্য প্রেরণ করেছিলেন। বস্তুত এই নৃপতির শান্তিপ্রিয়তা আসিরিয়ার প্রভূত হিতসাধন করেছিল। তাঁর রাজত্বকালে ব্যাবিলন বা ইলামে আর বিদ্রোহ দেখা দেয় নি।

এশিয়া মাইনরে নব-নব রাজ্যের আবির্ভাব : কাইমেরিয়ানগণ

কিন্তু একটি নূতন উপদ্রব উপস্থিত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। এশিয়া মাইনরে কয়েক শতাব্দী পূর্বেই হিটাইট সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে যে কয়টি নূতন রাজ্য সমুত্থিত হয়েছিল, তার মধ্যে ফ্রিজিয়া ও লিডিয়াই ছিল প্রধান—এইসব নব-নব রাজ্যের আবির্ভাব গ্রীক ভূখণ্ড থেকে আগন্তুক জাতির সমাগমের ফলে। এই জাতিসমূহ ছিল আর্যভাষাভাষী। এইরূপ আর একটি সম্প্রদায়ের আর্যজাতি মধ্য এশিয়া থেকে উরাল পর্বতের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রবেশ করে সেখানে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছিল। গ্রীকরা এই জাতির নাম দিয়েছিল 'কাইমেরিয়ান' (Cimmerian)—বস্তুত

কাইমেরিয়ানরা শক-জাতীয় (Scythians)। বর্বর জাতি, তাদের ধনুর্ধারী অশ্বারোহী দল ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। ফ্রিজিয়া ও লিডিয়া উপক্রুত করে ক্যাপাডোসিয়ায়, এমন কি আসিরিয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল এই জাতি এসারহেডনের রাজত্বকালে। গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের বিবরণে দেখা যায়, কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূল ধরে থ্রেস ও বস্‌ফোরাস অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেছিল কাইমেরিয়ানগণ। অবশ্য ককেসাস বা ক্যাসপিয়ান সাগরের দিক থেকে এই জাতির পশ্চিমাঞ্চলে গমনও বিচিত্র নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও হিরোডোটাসের বিবরণ প্রত্যাখ্যান করবার কোন হেতু দেখা যায় না। সে যা-ই হোক, এই রণোন্মত্ত দুর্ধর্ষ জাতিকে আসিরিয়ার প্রবেশ-পথে সংগ্রামে পরাজিত করে এসারহেডন যে শুধু নিজের রাজ্য-রক্ষা সমস্যার সমাধান করেছিলেন, তা নয়—ফ্রিজিয়া ও লিডিয়ার বুকের ওপর থেকে একটি পাষাণ-চাপ নামিয়ে দিয়ে কিছুকালের জন্য তাদের স্বস্তিদান করেছিলেন। এই যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে একটি মৃন্ময় চাকতির ওপর নিজেই লিখে গেছেন এসারহেডন: "আমি কাইমেরিয়ান ত্বসপা-কে সসৈন্যে পরাজিত করেছি।" ত্বসপা একটি আর্য নাম। তিনি ছিলেন কাইমেরিয়ানদের সেনাপতি।

'মিশর-রাজগণের অধিরাজ'

পিতার অসম্পূর্ণ কায মিশর-বিজয়—সেই কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন তিনি রাজত্বের শেষভাগে। কোন উপলক্ষে দীর্ঘকাল পর এই মিশর অভিযানে যাত্রা করেছিলেন এসারহেডন, সে সম্বন্ধে বিবরণীতে কোন উল্লেখ নেই, তবে পূর্বাপর অবস্থা বিবেচনায় মনে হয়, মিশর-রাজ তাহরকার প্ররোচনায় ফিনিসিয়া ও জুডা প্রদেশে বিদ্রোহবহ্নি আবার প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে একটি শিলালিপিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে: "টায়ারের রাজা বাল আসিরিয়ার আধিপত্যের জোয়াল ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিলেন"। জুডায়ও এই সময়কার বিদ্রোহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়: "আসিরিয়া-রাজের সেনাপতিরা (জুডাধিপ) মানাসে-কে বন্দী করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ব্যাবিলনে নিয়ে গিয়েছিলেন।" এসারহেডন সমুদ্রতটের টায়ার নগর অবরোধ করে খাদ্য ও জল সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন, এবং অবরোধকারী সৈন্যদের সেখানে রেখে সসৈন্যে মিশরে প্রবেশ করলেন। রাফিয়া নগর থেকে সৈন্যদের কুচ

অত্যন্ত ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল, এবং চর্মাধারে জলবাহী উষ্ট্রদল সাথে ছিল বলেই এই অভিযানের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল। কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল অথবা কিরূপে মিশরপতির পরাভব ঘটল, সে বিষয়ে কোন বর্ণনা নেই—শুধু এই মাত্র জানা যায় যে, তাহরকা দক্ষিণাঞ্চলে কস বা ইথিওপিয়ায় পলায়ন করেছিলেন, মিশরের রাজধানী মেমফিস অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেখানে আসিরিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আদাদ-দেবের প্রতিমূর্তি—
এসারহেডনের অর্ঘ্যপাত্রে
অঙ্কিত

টায়ার আত্মসমর্পণ করল মিশর-বিজয়ের পর। এসারহেডন এ ক্ষেত্রেও বিজিতের প্রতি সদয় ব্যবহার করে উদার প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছিলেন। টায়ার-রাজ বাল ও জুডা-রাজ মানাসে উভয়কেই তিনি স্ব স্ব রাজ্য প্রত্যর্পণ করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে উপকূলস্থ পর্বতগাত্রের একটি স্মৃতিফলকে (stele) তাঁর পিতার মূর্তির পাশে আপন প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করেছিলেন, এবং শিলা-লিপিতে নিজেকে 'মিশর-রাজগণের অধিরাজ' (King of kings of Egypt) বলে অভিহিত করেছেন। ছয় শত বছর পূর্বে সেই পাহাড়েই মিশর-রাজ দ্বিতীয় রামেসিস স্বীয় প্রতিমূর্তি খোদাই করে রেখে গিয়েছিলেন প্যালেস্টাইন বিজয়ের পর। তিনটি দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে সমুদ্রতটের এই পাহাড়টি বলদৃপ্ত গর্বিত সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের বার্তাই যেন চিরন্তন কালের সমুখে মেলে ধরেছে!

এসারহেডনের 'উইল'

এসারহেডন দেশে ফিরবার অব্যবহিত পরেই মিশর আসিরিয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে ফেলেছিল। প্রশাসনের জন্য একদল সৈন্যসামন্ত রেখে

এসেছিলেন এসারহেডন, মিশরবাসীরা তাদের আক্রমণ করে নির্মূল করল। এই সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ এসারহেডন সসৈন্য যাত্রা করলেন মিশরীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁর মৃত্যু ঘটল (খৃঃ পূঃ ৬৬৯)। রাজ্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁর অভিপ্রায় ছিল এই যে, দুই পুত্র আসুরবানিপাল ও সামাস-সুম-উকিন সাম্রাজ্যের দুই অংশের অধিপতি হবেন—অর্থাৎ আসিরিয়ার অধিপতি হবেন জ্যেষ্ঠ আসুরবানিপাল, এবং স্বতন্ত্রভাবেই ব্যাবিলনে রাজত্ব বা রাজপ্রতিনিধিত্ব করবেন কনিষ্ঠ সামাস-সুম-উকিন, কিন্তু সমগ্র সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণভার থাকবে আসুরবানিপালের হস্তে। এই মর্মে একটি 'উইল' লিপিবদ্ধ করেছিলেন এসারহেডন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ-মাতা—সেন্নাচেরিবের বিধবা পত্নী—পরলোকগত সম্রাটের অভিপ্রায় আম-জনতার কাছে ঘোষণা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে আর একটি বিবরণে দেখা যায়, মিশর অভিযানকালে পথিমধ্যে এসারহেডনের মৃত্যু হয় নি—তিনি রাজ্যভার পুত্রদ্বয়ের ওপর অর্পণ করে ব্যাবিলনে অবস্থান করছিলেন এবং সেখানে এক বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আসুর-বানি-হাবল বা আসুরবানিপাল

আসুরবানিপাল বা আসুর-বানি-হাবল যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করলেন, সাম্রাজ্যের গৌরব তখন মধ্যাহ্নশিখরে দীপ্যমান। অতুলনীয় সমৃদ্ধি, অমিত তেজ, অপরাজেয় বিক্রমের অধিকারী ছিল আসিরিয়া, তা দেখে সে সময় কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি যে আর অর্ধ শতাব্দ মাত্র তার আয়ুষ্কাল, তারপর অস্তগমন নয় মৃত্যু, আর সে এমন মৃত্যু যার অন্ধকার গহ্বর থেকে পুনরাবর্তন নেই। বাহ্য আড়ম্বর ও চোখ-ঝলসানো চাকচিক্যের তলে যে পচনশীল অন্তঃসারশূন্যতা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরকে একেবারেই ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল তার আভাস মাত্রও দেখা যায় নি, দোর্দণ্ড শক্তিশালী আসুরবানিপাল যখন রাজত্বের প্রথম ভাগে মিশর পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন। ইথিওপীয় রাজা তাহরকা মিশরের মেমফিস নগর অধিকার করে বসেছিলেন। আসুরবানিপালের গতিরোধ করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন তিনি, কিন্তু যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনীর পরাজয় ঘটল। তখন তাহরকা দ্রুতপদে দক্ষিণাঞ্চলে

প্রথমে থিবিসে পরে কুসে পলায়ন করলেন। কিছুকাল মিশরে অবস্থান করেছিলেন আস্থরবানিপাল শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, তারপর একদল সৈন্য মেমফিস নগরে স্থাপন করে প্রভূত ধনরত্ন সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। মিশরীদের কাছে পরাধীনতার শৃঙ্খল অত্যন্ত দুর্বিষহই বোধ হয়েছিল, কেননা বিজেতার মিশর ত্যাগের অব্যবহিত পরেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্যোগ পুনরায় আরম্ভ হল। মিশরীরা তাহরকাকে গোপনে আহ্বান করল সিংহাসন অধিকার করবার জন্য, কিন্তু এই সংবাদ আসিরীয় সেনাপতিরা জানতে পেরে দৃঢ় হস্তে বিদ্রোহ দমন করেছিল। এই প্রসঙ্গে মিশরীদের প্রভূত নিন্দাবাদ করেছেন আস্থরবানিপাল: "আমার সৎকর্ম-গুলিকে তারা করেছে ঘৃণা, তাদের চিত্ত শুধু মন্দ কল্পনাই করে এসেছে। রাজদ্রোহের কথাই বলেছে তারা, নিজেদের মধ্যে শুধু কুপরামর্শই চলেছে।" সাম্রাজ্যবাদীর মনোবৃত্তি নিয়েই মিশরীদের অকৃতজ্ঞতার কথা বলেছেন আস্থরবানিপাল, যেন পরদেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার আসিরিয়ার একটি জন্মগত অধিকার, আর অধীনতার বোঝা মাথায় বহন করা সেইসব দুর্ভাগ্য দেশের ঈশ্বরনির্দিষ্ট কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদের এইরূপ সদম্ভ মনোভাবটির তিরোধান আজকের জগতেও ঘটে নি, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বিদ্রোহ চূর্ণ করা হল, মিশরের অনেক নগরও বিধ্বস্ত হল, এবং বন্দীদের প্রেরণ করা হল নিনেভে নগরে। বিদ্রোহীদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করলেন আস্থরবানিপাল, শান্তি কামনা করে বন্দীদের মুক্তি দিলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন মিশরের 'সইস' প্রদেশের অধিপতি নেকো যাঁকে তার দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন স্বয়ং এসারহেডন। এই ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে বহুমূল্য রত্নভূষণ উপহার দিলেন আস্থরবানিপাল, কটিবন্ধে স্বর্ণ তরবারি আর পদদ্বয়ে সোনার অলংকার পরালেন, তারপর তাকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তাঁর এই উদারতার একটি আশু সুফল দেখা দিয়েছিল। যখন তাহরকার মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী তানুতামন থিবিস নগর সুরক্ষিত করে মেমফিস আক্রমণ করল, মিশরের অভিজাতবর্গ তখন আক্রমণ-কারীকে সাহায্য করলেন না। কিন্তু তাঁদের এই নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও আসিরীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিল আততায়ীর দল। এই বিপর্যয়-কাহিনী নিনেভে নগরে পৌঁছতে বিলম্ব হল না, এবং সঙ্গে সঙ্গেই মিশরের বিরুদ্ধে

একটি বিরাট অভিযান প্রেরণ করা হল। ইথিওপীয় রাজা তান্থুতামন যুদ্ধ না করেই স্বদেশে পলায়ন করল, এমনি বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল আসিরীয় বাহিনীর আগমন। মিশরের পুনরুদ্ধার আসিরিয়ার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু এ যাত্রায় মিশরকে লঘু সাজা দিয়ে সহজে অব্যাহতি দেওয়া হয় নি। মিশরের দক্ষিণাবর্তে সমৃদ্ধিশালিনী হাস্যময়ী থিবিস নগরী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করা হয়েছিল। সেন্নাচেরিব কর্তৃক ব্যাবিলন ধ্বংসের মতই এই উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা কীর্তিসমুজ্জ্বল নগরের মহিমাময় অতীত গৌরবের চিহ্নগুলিকে অবলুপ্ত করে ভবিষ্যৎকালের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে, এরূপ চেতনার কণামাত্রও আস্থরবানিপালের মনে জাগে নি। পরম তৃপ্তি সহকারেই বলেছেন তিনি, "আস্থর ও ইস্‌তারের সেবার জন্য আমি সমস্ত (থিবিস) নগরটিকে নিজের হস্তে গ্রহণ করেছি, অগণিত লুণ্ঠিত দ্রব্য অপসারিত করেছি।" সুন্দর কারুখচিত দুইটি সু-উচ্চ ওবেলিস্ক স্থানান্তরিত করা হয়েছিল বলে বর্ণনায় উল্লেখ আছে, সে দুটি ছিল কোন মন্দিরের দ্বারদেশে স্থাপিত। প্রথম বিদ্রোহটির পাঁচ বছর পর এই দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ, তারপর দশ বছর মিশরে অক্ষুণ্ণভাবে শান্তি বিরাজ করেছিল। দীর্ঘকাল অবসানে মিশর যখন তৃতীয়বার বিদ্রোহী হয়ে উঠল, আস্থরবানিপাল তখন নানান অবস্থা-বিপর্যয়ের দরুন এমনই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যে বিদ্রোহ দমন করবার মত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে পারেন নি তিনি। মুক্তি-সংগ্রামে মিশর-রাজ সামেটিক জয়যুক্ত হলেন (খৃঃ পূঃ ৬৫১), তা সত্ত্বেও আস্থরবানিপাল মিশরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ না করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই সমীচীন মনে করলেন।

লিডিয়া ও আসিরিয়া : শকগণ

পরিণামে বাহুশক্তি মিশরে ব্যর্থ হয়েছিল, কিন্তু সেই বাহুবলের প্রভাবে প্রতিবেশী দেশসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে ও প্রভুত্ব বজায় রাখতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিলেন আস্থরবানিপাল। মোটামুটি বলতে গেলে সুদীর্ঘ কাল ধরে পশ্চিমাঞ্চলে শান্তি বিরাজ করছিল, যদিও সিরিয়ায় ও ফিনিসিয়ায় একবার অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন হয়েছিল। কঠোর অবরোধের ফলে টায়ার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল, আর সিরিয়ার রাজন্যবর্গও নতি

স্বীকার করে আসিরিয়া-রাজ সমীপে নানান দ্রব্যসম্ভার উপঢৌকন প্রেরণ করেছিলেন। টরাস পর্বতের উত্তর ভাগে এশিয়া মাইনরে তখন কাইমেরিয়ানদের বিভীষিকা পূর্ণভাবেই বিদ্যমান। এই দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতির আক্রমণে বিব্রত হয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী লিডিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গাইজিস আসিরিয়া-রাজের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আসুরবানিপালের বৎসর-পঞ্জীর বিবরণে বৃত্তান্তটি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আসিরিয়ার সীমান্তে একদা কতিপয় পরদেশী এসে দেখা দিল। অদ্ভুত তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, অবোধ্য তাদের ভাষা। আকারে ইঙ্গিতে বোঝা গেল তারা শত্রু নয়, বন্ধু। দ্বাররক্ষীরা জিজ্ঞাসা করল, "কে ভাই তোমরা? কোথা থেকে তোমাদের আগমন?" তারা রাজ-দর্শন প্রার্থনা করল। রক্ষীরা তাদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দিল। তখন জানা গেল, লিডিয়া-রাজ গাইজিসের দূত তারা—এসারহেডনের হস্তে কাইমেরিয়ান সেনাপতি ত্বস্পার পরাভবের কথা স্মরণ করে বিপুলবিক্রম আসিরিয়াধিপের সমর্থন যাজ্ঞা করছেন গাইজিস। স্বভাবতই এই সাহায্য প্রার্থনাকে বশ্যতা স্বীকারের নামান্তর বলে গ্রহণ করেছিলেন আসুরবানিপাল। বর্ণনায় ঘটনাটির একটি ধর্মীয় আকার দান করা হয়েছে; স্বপ্নদর্শন, প্রত্যাদেশ প্রভৃতির কথা পূর্ববর্তী নৃপতিগণ অপেক্ষা আসুরবানিপালের বিবরণে অধিকতর পরিমাণেই পাওয়া যায়। বিবরণটি এইরূপ: "আমার স্রষ্টা আসুরদেব স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাকে (গাইজিসকে) আমার বিরাট রাজশক্তির কথা জ্ঞাপন করে আদেশ দিলেন, 'আসিরিয়া-রাজ আসুরবানিপালের অধীনতা স্বীকার কর এবং তাঁর নামে শত্রুদের বন্দী করো'। এই স্বপ্নদর্শনের পরই তিনি দূত পাঠালেন আমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের উদ্দেশে।" এই ব্যাপারে গাইজিসকে কিরূপে সাহায্য করেছিলেন আসুরবানিপাল, অথবা আদৌ করেছিলেন কি না—সে কথার উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গে শুধু বলা হয়েছে যে, বশ্যতা স্বীকার করবার পর আসুরদেব ও ইস্তার দেবীর কৃপায় কাইমেরিয়ানদের যুদ্ধে পরাস্ত করে গাইজিস বন্দীদের মধ্য থেকে দুইজন সেনাপতিকে বদ্ধাবস্থায় আসুরবানিপালের নিকট প্রেরণ করেছিলেন প্রচুর উপঢৌকন-সহ।

কিন্তু লিডিয়ার আনুগত্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। কয়েক বছর পরই গাইজিস অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ উপঢৌকন প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

শুধু তাই নয়, মিশরে সামেটিক যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, লিডিয়া-রাজ তখন তাঁর সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করলেন। সেই সময়ে আসুরবানিপাল অন্যত্র সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, মিশর বা লিডিয়ার বিরুদ্ধাচরণের প্রতিকারকল্পে পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধাভিযান ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর হৃদয়ে এই বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল যে আসুরদেবের পরম অনুগ্রহের পাত্র তিনি, তাঁর পরাজয় নাই—সুতরাং শত্রুদের নিপাত-সাধন তাঁর সাধ্যবহির্ভূত হলেও দৈবশক্তির সমুদ্যত বজ্রহস্তে তাদের নিধন অবশ্যম্ভাবী। দৈবাৎ তাঁর এই বিশ্বাসের সমর্থক সাক্ষাৎ ফলশ্রুতিরূপেই দেখা দিল একটি ঘটনা। বর্ণনায় বলেছেন তিনি: "আসুর ও ইস্‌তারের কাছে প্রার্থনা করলাম, শত্রুগণের সমুখে তার (গাইজিসের) দেহ যেন ভূলুণ্ঠিত হয়, তার সহচরগণ যেন বন্দী হয়।" দেবতারা তথাস্তু বলে তাঁর সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। আরও একটি বর্ণনা: "শত্রুদের সমুখে তার (গাইজিসের) মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল, তার সহচরগণও বন্দী হয়েছিল। ইতিপূর্বে যে 'গিমিরায়' (কাইমেরিয়ান)-দের আমার নামের গৌরবে পদদলিত করেছিল সে, তারাই এখন তাকে পরাভূত করে সমগ্র দেশকে বিপর্যস্ত করেছে।" কাইমেরিয়ানদের হস্তে গাইজিসের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরডিস লিডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেই অনুতপ্ত চিত্তে আসুরবানিপালের নিকট আনুগত্য-স্বীকার সংবাদ প্রেরণ করলেন। এই প্রসঙ্গে আসুরবানিপাল বলেছেন: "দূতমুখে তিনি (আরডিস) এই কথা বলে পাঠালেন যে 'আপনি দেবানুগৃহীত নৃপতি। আমার পিতা বিপথে গমন করেছিলেন, সেজন্য তাঁর অনর্থ ঘটেছে। আমি আপনার অনুগত ভৃত্য, আমার প্রজাবৃন্দ আপনার অভিরুচিমতই কাজ করবে'।"

আসুরবানিপালের লিপি-লেখনে কাইমেরিয়ান প্রসঙ্গে আর কোন কথার উল্লেখ নেই। কিন্তু কাইমেরিয়ানদেরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী শক জাতির একটি উপশাখা ইতিপূর্বেই উরারতু প্রদেশের উত্তরে ক্যাসপিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে বসবাস আরম্ভ করেছিল। আসুরবানিপালের চোঙা-লিপিতে গগ নামে শক জাতীয় একজন নরপতির উল্লেখ আছে। উত্তর-পূর্ব দেশের একটি যুদ্ধ-বিবরণে বলা হয়েছে, শকদের পঁচাত্তরটি সুরক্ষিত নগর অধিকার করেছিলেন আসুরবানিপাল, এবং গগের দুইটি

পুত্রকে বন্দী করে নিনেভে নগরে নিয়ে এসেছিলেন, যেহেতু তারা আসিরিয়ার প্রভুত্ব অস্বীকার করেছিল।

ইলাম ও ব্যাবিলনের ঘটনাবলী : আসিরিয়ার হস্তক্ষেপ

বর্ণনায় যা-ই বলা হোক, উত্তরাঞ্চলের এই যুদ্ধগুলি আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আসুরবানিপালের বিরাট অভিযানপরম্পরা ব্যাবিলন ও ইলামের বিরুদ্ধেই ক্রমান্বয়ে পরিচালিত হয়েছিল। ইলামের রাজা ছিলেন তখন উরতাকি। এক অনাবৃষ্টির বছরে ইলাম দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দয়াপরবশ হয়ে আসুরবানিপাল রাজভাণ্ডার থেকে শস্যাদি প্রেরণ করলেন ইলাম দেশে দুর্গতদের জীবনরক্ষার জন্য, এবং নিজ রাজ্যের মধ্যে সে দেশের বহু আর্ত পরিবারকে আশ্রয় দিয়ে তাদের খাদ্যের সংস্থান করেছিলেন। কিন্তু ইলাম-রাজ উরতাকি এই সময়োচিত পরম উপকারের কথা বিস্মৃত হয়ে হঠকারিতাবশত আক্কাড আক্রমণ করলেন। ব্যাবিলনের শাসনকর্তা ছিলেন রাজভ্রাতা সামাস-সুম-উকিন—পিতা এসারহেডনের অভিপ্রায়মত যাঁকে রাজপ্রতিনিধি-পদ প্রদান করা হয়েছিল। রাজ্যের ওপর আকস্মিক আক্রমণে বিব্রত হয়ে আসিরিয়া-রাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন সামাস-সুম-উকিন। "ইলামীগণ পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়ে আক্কাডের স্থানে স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল," কিন্তু তা সত্ত্বেও আসিরীয় বাহিনীর আগমন প্রতিরোধ করতে পারে নি তারা, এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্যাবিলনের রাজ্যসীমা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই উরতাকির মৃত্যু হয়, এবং ইলামের সিংহাসনে আরোহণ করেন পরলোকগত রাজার পুত্র নয়, তাঁর ভ্রাতা টিউমান।

এখন থেকে ইলাম ও ব্যাবিলনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নানান জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। এই ঘটনাগুলি চিত্রার্পিত করেছেন আসুরবানিপাল রাজপ্রাসাদের প্রকোষ্ঠগুলির প্রাচীরগাত্রের উপর, এবং সেই সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। বলা হয়েছে, "দুষ্টগ্রহের মত উরতাকির সিংহাসনে বসেছিল টিউমান" তখন উরতাকির পঞ্চ পুত্র প্রাণভয়ে এসে আসুরবানিপালের আশ্রয় গ্রহণ করল। শরণার্থীদের ইলামের হস্তে প্রত্যর্পণের দাবি করে দূত পাঠালেন টিউমান

আসিরিয়া-রাজের কাছে, কিন্তু আস্থরবানিপাল সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দাবি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই দাবী ও প্রত্যাখ্যানের অর্থ—যুদ্ধ। যাত্রার প্রাক্কালে রণচণ্ডী মহাদেবী ইস্‌তারের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন আস্থরবানিপাল: "হে দেবী, ইলাম-রাজ টিউমান তোমার পিতা আস্থরদেব ও তোমার ভ্রাতা মারদুকদেবের বিরুদ্ধে পাপাচার করেছে—সে সৈন্য সংগ্রহ করেছে, আসিরিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। হে প্রহরণধারিণী দেবী, সংগ্রামের মধ্যে তুমি নেমে এস ঝঞ্ঝার মত, আকাশ থেকে অগ্নিময় বজ্র নিক্ষেপ করে তাকে বধ কর।" আবার বলছেন আস্থরবানিপাল: "ইস্‌তার আমার প্রার্থনা শুনলেন। বললেন, মা ভৈঃ। আমি তোমার প্রার্থিত বর দান করব।" যুদ্ধ বাধল ইলামের একটি নদীতীরে। অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের স্তূপাকার মৃতদেহ নদীর স্রোত বন্ধ করে দিয়েছিল। যুদ্ধে টিউমান যখন আহত হয়ে পলায়মান, তখন আসিরীয় সৈন্য সহ উরতাকির পঞ্চ পুত্র তার পশ্চাদ্ধাবন করল, এবং তাদেরই মধ্যে একজনের হস্তে নিহত হলেন তিনি। নিনেভের রাজ-উদ্যানে মহিষীকে নিয়ে প্রমোদ-উৎসবে মগ্ন আস্থরবানিপাল, সেই সময়ে ইলাম-রাজের ছিন্ন মুণ্ড ভল্লবিদ্ধ করে রাজসমীপে আনা হয়েছিল, এবং তিনি সেই ছিন্ন মস্তক নগরের তোরণদ্বারে ঝুলিয়ে রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন। বন্দীগণের মধ্যে যে দুর্ভাগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন অভিজাত-বংশোদ্ভব তাঁদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে—যেমন চামড়া ছুলে ফেলে, জিহ্বা উৎপাটন করে—হত্যা করা হয়েছিল, আর সেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করে মাংস বিতরণ করা হয়েছিল। আসিরীয় নৃপতিগণের, বিশেষত আস্থরবানিপালের নৃশংসতা তৈমুরলঙ্গী বা নাদিরশাহী ধরনের নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান অথবা হূন আটিলার কুকীর্তি—পরবর্তী যুগে যা বিশ্বময় ত্রাসের সঞ্চার করেছিল—সেইসব হত্যাকাণ্ডেরই অগ্রদূত বলে মনে করলে বোধ করি ভুল করা হবে না।

আস্থরবানিপালের নির্মম শাস্তি ও কঠোর শাসন-ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিদ্রোহের অঙ্কুর বিনষ্ট হয় নি, এমন কি যেখানে তাঁর সদুদ্দেশ্য ও সহৃদয়তার জন্য কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হবার কথা, সেখানেও তাঁর প্রতি বিরুদ্ধাচরণই দেখা গেছে। ব্যাবিলনের রাজপ্রতিনিধি ভ্রাতা সামাস-স্থম-উকিনের প্রতি চির-দিনই তিনি সদয় ব্যবহার করেছিলেন—অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস, এবার সেই ভ্রাতাই বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। এই বিদ্রোহ সামাস-স্থম-উকিন নিজের

উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্যেই করেছিলেন, না স্বাধীনতাকামী ব্যাবিলন-বাসীদের মুখপাত্ররূপে ব্যাবিলনের স্বাতন্ত্র্য কামনা করেছিলেন তিনি, সে কথা বলা কঠিন, কিন্তু এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল ইলামের সমর্থন। দীর্ঘকাল ধরে নিপুণভাবে গোপন ষড়যন্ত্র চলেছিল। শিলালিপিতে বলা হয়েছে, সামাস-স্যুম-উকিন "মুখে ভাল কথা বলেছেন, অন্তরে মন্দ ভাব পোষণ করেছেন"। ফলে, ব্যাবিলনে যখন বিদ্রোহ দেখা দিল, আসুরবানিপাল তখন অসন্দিগ্ধভাবেই অবস্থান করছিলেন, যুদ্ধের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। শিলালিপিতে তিনি বলেছেন: "একজন সাধুপুরুষ (Seer) স্বপ্ন দেখলেন, আসুরপতি আসুরবানিপালের অহিতসাধনের জন্য যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের সম্বন্ধে চন্দ্রের ওপর লেখা রয়েছে—যুদ্ধে আমি (অর্থাৎ চন্দ্রদেব) তাদের জন্য ভীষণ মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছি। তীক্ষ্ণ অসিধারে, অগ্নিসংযোগে, দুর্ভিক্ষে আমি তাদের জীবননাশ করব।" দেবতার এই আদেশ শুনে সৈন্য সংগ্রহ করে সামাস-স্যুম-উকিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন আসুরবানিপাল। দীর্ঘকাল ধরে ব্যাবিলন অবরোধ করেছিল আসিরীয় বাহিনী, এবং তত্রত্য বাসিন্দাদের দুর্গতি এমনি চরম পর্যায়ে উঠেছিল যে খাদ্যাভাবে তাদের নর-মাংস ভক্ষণ করতে হয়েছিল। পরিশেষে সম্পূর্ণভাবে জয়যুক্ত হয়েছিলেন আসুরবানিপাল। আর সামাস-স্যুম-উকিন রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করে জলন্ত অনলে প্রাণত্যাগ করলেন (খৃঃ পূঃ ৬৪৮)। শিলালিপিতে এই ব্যাপারটির ধর্মীয় বিবরণ এইরূপ: "দেবতারা সামাস-স্যুম-উকিনকে প্রজ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করে তার জীবননাশ করেছিলেন।"

ব্যাবিলনের সিংহাসনে আসুরবানিপাল অধিষ্ঠিত : ইলাম ধ্বংস

চিরাচরিত প্রথামত আসুরবানিপাল দেবাদিদেব 'বেল-এর হাত ধরে' ("took the hand of Bel") ব্যাবিলনের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। এই ব্যাবিলন-বিজয় তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হত কি না সন্দেহ, যদি ব্যাবিলনকে সময়োচিত সামরিক সাহায্য দান করতে সক্ষম হত ইলাম। কিন্তু ইলামে তখন অন্তর্বিদ্রোহ ভীষণভাবে জাগরূক, এবং শাসকেরা ব্যাবিলনের সাহায্যার্থে অগ্রসর না হয়ে সমগ্র শক্তির অপব্যয় করছিলেন আত্মঘাতী সংগ্রাম ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠানে। টিউমানের মৃত্যুর পর উরতাকির পুত্র

উম্মানিগাস-কে ইলামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আস্থরবানিপাল —সেই উম্মানিগাস নিহত হলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তামারিটু-র হস্তে। সিংহাসনে আরোহণ করেই তামারিটু আসিরিয়ার প্রভুত্ব অস্বীকার করে ব্যাবিলনের বিদ্রোহী রাজপ্রতিনিধির প্রেরিত উপঢৌকন গ্রহণ করলেন বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপে। কিন্তু তামারিটুর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং ইন্দবিগাস নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করল। তখন তামারিটু প্রাণভয়ে পলায়ন করে আস্থরবানিপালের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে মার্জনা ভিক্ষা করলেন তিনি, মাথায় ধূলা মেখে রাজপদ চুম্বন করলেন। আস্থরবানিপাল তাঁকে ক্ষমা করলেন, আশ্রয়ও দিলেন তাঁকে, কিন্তু এই উদারতার প্রতিদান দিয়েছিলেন তামারিটু কৃতঘ্ন আচরণ দ্বারা। ইতিমধ্যে ইলামে আবার রাষ্ট্র-বিপ্লব দেখা দিল, এবং ইন্দবিগাসকে বধ করে তার স্থলে প্রজারা উম্মানালদাস-কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এই রাজার বিরুদ্ধাচরণের জন্য ইলাম আক্রমণ করলেন আস্থরবানিপাল, এবং অচিরে তাকে রাজ্যচ্যুত করে শরণার্থী প্রাক্তন রাজা তামারিটুকে ইলামের রাজপদ প্রদান করলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই—আস্থরবানিপালের সৈন্যবাহিনী তখনো ইলাম থেকে অপসারিত হয় নি—হিতাহিত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য তামারিটু হঠাৎ বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করল, কিন্তু তাকে পরাভূত করে বন্দী করতে আস্থরবানিপালের বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। উম্মানালদাস ও তামারিটু—ইলামের এই দুইজন বিদ্রোহী রাজাকে প্রাণে বধ করেন নি তিনি—মৃত্যুর চেয়েও অধিকতর মর্মান্তিক পরিণামের জন্য তাদের জিয়িয়ে রেখেছিলেন। নিনেভে নগরে উৎসবকালীন শোভা-যাত্রায় অশ্বের পরিবর্তে এই দুই নৃপতিকে রথে যোজনা করা হয়েছিল, এবং সেই রথের আরোহী হলেন স্বয়ং সম্রাট! দেবমন্দিরের তোরণদ্বারে রথ থেকে অবতরণ করলেন তিনি, তারপর সমবেত সৈন্যদলের সমুখে হাত তুলে দেবতার প্রশস্তি পাঠ করলেন। কিন্তু অলক্ষ্যে সেদিন দেবতা হেসেছিলেন, কেননা, আত্মতৃপ্তির মোহে আস্থরবানিপাল ভাবতেও পারেন নি যে সেই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে যবনিকার অন্তরালে নিয়তি তার শাণিত কৃপাণ তুলে ধরেছিল আসিরিয়াকে বিদ্ধ করবার জন্য—ঠিক তেমনি

নির্মমভাবেই যেরূপ নৃশংসতার খড়্গাঘাতে এই নৃপতি ইলাম রাজ্য ধ্বংস করেছিলেন।

আসুরবানিপালের চরিত্রে দোষ-গুণ

সুমেরীয় যুগ থেকে ইলাম রাজ্যের ধারাবাহিক স্বাধীন অস্তিত্ব অব্যাহত-ভাবেই চলে আসছিল—ব্যাবিলোনিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তনগুলি ইলামের গায়ে আঁচড়ও বড় একটা দিতে পারে নি। সেই স্থবির ইলাম ও তার রাজধানী সুসা নগর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করেছিলেন আসুরবানিপাল। শুধু ধ্বংস নয়, জাতিকে-জাতি নির্মূল করেছিলেন এমনভাবে যে সেই প্রাচীন জাতির পুনর্জাগরণ আর কোন দিন সম্ভব হয় নি, যদিও এই দেশেই কিছুকাল পর পারসীকদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তাঁর রাজত্বকালের প্রতিটি বছরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন আসুরবানিপাল। অত্যন্ত পীড়াদায়ক বর্ণনা—যুদ্ধের পর যুদ্ধ, রক্তগঙ্গা ছুটেছে, অবরোধের পর অবরোধ, নাগরিক অনশনে মরেছে। নৃশংসতার অন্ত নেই, বন্দীদের অঙ্গচ্ছেদ, এমন কি জীবন্ত অবস্থায় চামড়া ছুলে ফেলা হয়েছে। এগুলি তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা, কিন্তু যে কঠোর বজ্রহস্ত ইলামকে বিচূর্ণ করেছিল, তার নির্মমতা যে আরও কত ভয়ংকর, তা বোঝা যায় এই প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বর্ণনা থেকে। তিনি বলেছেন, "পানীয় জলের কূপ বারিশূন্য করেছি আমি। এক মাস পঁচিশ দিনের পথ জুড়ে ইলাম দেশের ভূমি ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেছি। ভূমির ওপর লবণ ছড়িয়েছি, কাঁটাগাছ বপন করেছি। রাজপুত্র রাজকুমারী, ইলামের রাজকীয় পরিবারের যুবক বৃদ্ধ সকলকেই, আর শাসকবৃন্দ, অভিজাতবর্গ, কারিগর, স্ত্রী-পুরুষ বড় ছোট সকল অধিবাসীকেই, অশ্ব অশ্বতর গর্দভ, পঙ্গপালের চেয়েও অধিকসংখ্যক জীবজন্তুকে আসিরিয়ায় চালান দিয়েছি। মানুষের কণ্ঠে আনন্দের উচ্ছ্বাস বন্ধ করে দিয়েছি আমি, কৃষি-ক্ষেত্রকে করেছি গর্দভ ও হরিণের চারণভূমি।"

গ্রীক ঐতিহাসিক ডিওডোরাসের বর্ণনায় আসুরবানিপালকে বলা হয়েছে, 'নিরোর মত লম্পট প্রকৃতির মানুষ' ("a dissolute and bi-sexual Nero")। কিন্তু এই উক্তিটির কোন সমর্থন লিখনগুলি থেকে পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী, শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি

ব্যাবিলোনীয় পদ্ধতি অনুসারে। তিনি গর্ব করতেন এই বলে যে, তাঁর পিতা তাঁকে শুধু অশ্বারোহণ ও আয়ুধ বিদ্যায় শিক্ষাদান করেই ক্ষান্ত হন নি, লিখনবিদ্যায় অভ্যস্ত, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে তুলেছিলেন। এই গর্বোক্তি যে মিথ্যা আত্মশ্লাঘা নয়, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। তাঁর বিখ্যাত পাঠাগারের ভগ্নস্তূপের মধ্যে বাইশ হাজার লিখন চাকতি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আড়াই হাজার বছর ধরে পড়ে ছিল, সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। চাকতি-গুলি এখন আছে বৃটিশ মিউজিয়মে। ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য বিষয়ে অতীত কালের অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে এই পাঠাগারে রাখা হয়েছিল। মিশরেও রাজা ও সামন্তগণের পাঠগৃহ ছিল, কিন্তু সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা আসুর-বানিপালের পাঠাগারে যত অধিক, এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ব্যাবিলোনিয়ায় মহাপ্লাবনের কিংবদন্তীর বিবরণ, গিলগামেশ উপাখ্যানের চাকতিগুলি এখানেই পাওয়া গেছে। আধুনিক লাইব্রেরির বইগুলিতে যেমন চিহ্ন (book-mark) দেওয়া হয়, চাকতিগুলির ওপর তেমনি চিহ্ন আছে। বইগুলি যেন কেউ অপহরণ না করে সেজন্য পুস্তক-চিহ্নের সঙ্গে এই সতর্কবাণী জুড়ে দেওয়া হয়েছে : "বইখানি যদি কেউ আত্মসাৎ করে, অথবা যদি কেউ বইয়ের ওপর নিজের নাম অঙ্কিত করে, দেবাদিদেব আসুর ও বেলিটের কোপে পতিত হবে সে, তার নাম ও বংশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হবে।"

জ্ঞানী মানুষ আসুরবানিপাল—তাঁর নিষ্ঠুর ক্রিয়াকলাপ আসিরিয়ার জাতীয় ঐতিহ্যের নির্মম প্রকৃতি থেকেই সমুদ্ভূত। কৃতকর্মের নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করতে পারেন নি তিনি, এইটেই তাঁর জীবনের মস্ত বড় ট্র্যাজেডি। পিতৃ-পুরুষের বিশাল সাম্রাজ্য অটুট রাখবার জন্য, কিংবা বিদ্রোহ দমন করে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হলে নির্মম নৃশংসতা অত্যাচার উৎপীড়ন অনিবার্য, এই ছিল বোধ করি তাঁর বদ্ধমূল বিশ্বাস। তাই মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও আমরা এই রুগ্ন মুমূর্ষু মানুষটির মনে অনুশোচনার চিহ্নমাত্র দেখতে পাই না। তিনি বলেছেন : "দেবতার ও মানবের, জীবিতের ও মৃতের ভালই করেছি আমি। তবে আমার এই ব্যাধি দুর্গতি কেন ? আমি রাজ্যে অশান্তি দমন করতে পারছি না, পরিবারমধ্যে কলহও বন্ধ করতে পারি নি।...শরীর ও মনের ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে দিনরাত আর্তনাদ করি—হে ভগবান, পাপীকেও তো তুমি তোমার জ্যোতি দান কর।" এরূপ আর্তনাদ অনুভূতি-

শূন্য, ধর্মজ্ঞান-বিবর্জিত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এই নৃপতির সূক্ষ্মানুভূতির আর একটি পরিচয়, আসিরীয় কলাশিল্পের পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয়েছিল, তাঁরই উৎসাহ দানের ফলশ্রুতিরূপে।

খৃঃ পূঃ ৬২৬ অব্দে আসুরবানিপালের মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তিনি তাঁর প্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন এবং সেই জলন্ত অনলে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন। কাহিনীটির কোন প্রমাণ নেই, কিংবদন্তীও হতে পারে।

॥ পাঁচ ॥

আস্থরের পতন

আস্থরবানিপালের মৃত্যুর পর আর কোন রাজার কাহিনী লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। আসিরীয় রাজগণ চিরদিনই তাদের জয়কীর্তন করে গেছেন, পরাভবের কথার উল্লেখমাত্রও করেন নি। মহামারীর হস্তে পরাভূত হয়ে সেন্নাচেরিব মিশরের দ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন, এই ঘটনাটির কথা বাইবেলে বলা হয়েছে, কিন্তু সেন্নাচেরিব এ বিষয়ে মৌনই ছিলেন। মিশর-রাজ সামেটিকাস আসিরীয় বাহিনী বিতাড়িত করে মিশরকে অধীনতা-পাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু আসিরিয়ার এই পরাভব সম্বন্ধে আস্থরবানিপাল সম্পূর্ণ নীরব। স্থতরাং লিখিত জয়গানের অভাব থেকে এই সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে যে আস্থরবানিপালের বংশধর উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় দেন নি, বরঞ্চ সর্বদিক দিয়েই তাঁর শোচনীয় দুর্দশা ঘটেছিল বলেই কোন ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নি। পরবর্তী কালের গ্রীক ঐতিহাসিকগণ আসিরিয়ার পতন-কাহিনীর কথা বলেছেন বটে, কিন্তু সেমিরামিসের উপকথার মত সেইসব বিবরণও কল্পনাপ্রস্থত, স্থতরাং ভ্রমাত্মক বলে মনে করবার কারণ আছে।

নিনেভের পতন ঘটেছিল ৬০৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে—আস্থরবানিপালের মৃত্যুর বিশ বছর পর। এই সময়ের মধ্যে আসিরিয়ার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন একজন, না একাধিক নৃপতি, সে কথা আমাদের সঠিক জানা নেই। নিমরাডে প্রাচীন কালা নগরীর ধ্বংসস্তূপ খনন করে প্রত্নতাত্ত্বিক লেয়ার্ড একটি ক্ষুদ্র আড়ম্বরশূন্য বাসগৃহ আবিষ্কার করেছেন। সেই গৃহের ইষ্টকখণ্ডগুলির ওপর লিখিত রয়েছে এই কথাগুলি: "আস্থরপতি এসার-হেডনের পুত্র আস্থরাধিপ আস্থরবানিপাল, তস্য পুত্র আস্থর-রাজ আস্থর-ইদিন-ইলি"। আরও একটি নাম ইষ্টকে লেখা দেখা যায়—আস্থর-আখি-ইদিনা বা এসারহেডন। সম্ভবত এই দ্বিতীয় এসারহেডন—যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা 'সারাকোস' (Sarakos) বলে অভিহিত করেছেন—তিনিই আসিরিয়ার শেষ নৃপতি।

মিডিসদের অভ্যুত্থান : ফ্রবর্তিস ও উভক্ষত্র

ইতিপূর্বে আমরা গগ নামক জনৈক শক-জাতীয় নৃপতির বিরুদ্ধে আস্থরবানিপালের যুদ্ধাভিযানের কথা বলেছি। কাইমেরিয়ানগণ কৃষ্ণসাগরের পশ্চিম উপকূল ধরে থ্রেস, অর্থাৎ বর্তমান বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়ে এশিয়া মাইনরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, আর তাদেরই জ্ঞাতি একটি আর্য উপজাতি ককেসাস অঞ্চল থেকে পারস্থে নেমে এসেছিল। এই উপজাতিই শক। কিন্তু তাদের আগমনের পূর্বে এ অঞ্চলে পারস্যের উপরিভাগে জাগ্রোস পর্বতের উপত্যকাভূমিগুলি অধিকার করে বসবাস ও কৃষি দ্বারা ফসল উৎপাদন আরম্ভ করেছিল আর একটি আর্য উপজাতি। এই দেশের নাম মিডিয়া—অধিবাসীরা ছিল আর্য ভাষাভাষী এবং জরথুস্ত্র-ধর্মী। আফগানিস্থানের উত্তরে অবস্থিত বল্‌ক্ প্রদেশে ঋষি জরথুস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল সম্ভবত ১০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে—মিডিসদের ধর্মগুরু তিনিই।* ঠিক কোন সময়ে আর্যগণ মিডিসে এসে স্থিতিবান হয়ে বসেছিল তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নেই, যদিও গ্রীক লেখকগণ কতিপয় কিংবদন্তীর উল্লেখ করেছেন। হিরোডোটাস বলেন, মিডিসদের প্রথম নৃপতি ছিলেন 'দেইওকেস' (Deiokes)। প্রথমে তিনি ছিলেন একজন গণপতি মাত্র, চরিত্রবলে ও ধীশক্তি প্রভাবে অন্যান্য উপজাতির নেতৃত্ব লাভ করে কালক্রমে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজধানী স্থাপন করেছিলেন তিনি আগবাটানা নগরে। সারগনের একটি শিলালিপিতে 'দয়িউকৃকু' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভ্যান হ্রদ অঞ্চলে যুদ্ধে (খৃঃ পূঃ ৭১৫) দয়িউকৃকু ও তার পুত্রকে বন্দী করেছিলেন তিনি। 'দেইওকেস' ও 'দয়িউকৃকু' নাম দুটির সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। সারগন-বর্ণিত দয়িউকৃকু মিডিস রাজবংশের কোন পূর্বপুরুষ, এরূপ অনুমান করা অসংগত নয়। সেন্‌নাচেরিব মিডিয়ার এলিপ নগর ধ্বংস

* ১০০০ খৃস্ট পূর্বাব্দে জরথুস্ত্রের জন্ম, এই মতটি সর্ববাদীসম্মত নয়। বরঞ্চ প্রচলিত মতবাদ এই যে ৬৬০ খৃস্ট পূর্বাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, জন্মস্থান আজারবাইজান, আর ৫৮৩ খৃস্ট পূর্বাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আসিরীয় নিষ্পেষণের চ্যালেঞ্জরূপেই জরথুস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল মিডিসে, এরূপ মনে করবার কারণ আছে।

করেছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যেই নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর নূতন রাজধানী নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল।

পঞ্চাশ বছর নিবিরোধে শান্তি ভোগ করে মিডিস যখন শক্তিশালী হয়ে উঠল, তখন তার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই হল স্বাধীন জগতের প্রধান শত্রু আসিরিয়া। দেইওকেস-পুত্র ফ্রবর্তিস বা ফ্রাওটিস (Phraotes) নিকটবর্তী উপজাতীয় দেশসমূহের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং সেই উপজাতীয়দের একটি পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীও গঠন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসিরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। সিংহপ্রতিম আসিরিয়া মৃতকল্প হলেও ক্রুদ্ধ বিক্রমে রুখে উঠে আততায়ীদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই যুদ্ধে মিডিয়া-পতি ফ্রবর্তিস নিহত হলেন।

পরাজয়ের লজ্জাকর কলঙ্ক মিডিসদের মনে আসিরিয়া বিজয়ের সংকল্প দৃঢ়তর করে তুলেছিল। ফ্রবর্তিসের পুত্র উভক্ষত্র বা কাইয়েক্জারেস্ (Kyaxcres) ছিলেন একজন মহাবীরপুরুষ। তিনি সৈন্যদল পুনর্গঠনে মনোযোগ দিয়েছিলেন। সুচিন্তিত পরিকল্পনামত উপজাতীয় দলপতিদের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্শাধারী, তীরন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্যদলের পরিবর্তে একটি জাতীয় বাহিনী সংগঠিত করে সামরিক শক্তিকে সংহত, কেন্দ্রীভূত ও জটিলতামুক্ত করেছিলেন তিনি। তারপর পিতার পরাভবের প্রতিশোধ নেবার জন্য এই বিপুল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন তিনি নিনেভের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে অনিবার্যরূপেই আসিরিয়ার পরাজয় ঘটল। তখন নিনেভে অবরোধের আয়োজন করলেন উভক্ষত্র, এমন সময় সংবাদ এল উত্তরাঞ্চল থেকে অগণিত শক হানাদার রাজা মদ্যেস (Madyes)-এর নেতৃত্বাধীনে মিডিস রাজ্য আক্রমণ করেছে। তখন নিনেভে অবরোধের উদ্যম পরিত্যাগ করে সসৈন্যে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন মিডিয়া-রাজ উভক্ষত্র।

কিন্তু শকদের দেশ থেকে বহিষ্কৃত করতে পারলেন না তিনি। তখন তিনি ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কথিত আছে, সখ্যতার ভান করে তিনি শকরাজ মদ্যেসকে সামন্তবর্গ সহ ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, এবং তারা যখন মদ্যপানে মত্ত, সেই অবস্থায় তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সে যেমনই হোক, দেখা যায় মিডিসদের ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য দুর্ধর্ষ শকদের

নিযুক্ত করেছিলেন উভক্ষত্র, এবং একদল শক সৈন্য ছিল তাঁর শরীররক্ষক। সম্ভবত তিনি এই বর্বর জাতিকে অর্থদানেই বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনি করে শকদের শক্তি হরণ করে তিনি আবার আসিরিয়া ধ্বংসের উদ্যোগ করতে লাগলেন। এবার দৈবক্রমে তাঁর একজন মিত্রও জুটেছিল। তিনি ব্যাবিলনের ক্যালডিয়ান শাসক নবু-পাল-উজ্জার বা নবোপোলাস্সার। এই ব্যক্তিটিকে শেষ আসিরীয় নৃপতি ব্যাবিলনের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। নবোপোলাস্সারের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন উভক্ষত্র, এবং মিত্রতা-বন্ধন সুদৃঢ় করবার জন্য নবোপোলাস্সারের পুত্র নেবু-কাড্নেজ্জারের সঙ্গে আপন পৌত্রীর বিবাহ দিয়েছিলেন। সন্ধির মর্ম ছিল এই যে, উভয়ের মিলিত উদ্যোগে আসিরিয়া সাম্রাজ্যের ভগ্নপ্রায় সৌধটিকে ভূমিসাৎ করা হবে।

'নিনেভের পাপের ভরা'

মিডিয়ান ও ক্যালডিয়ানদের মিলিত বাহিনী নিনেভে নগরের অবরোধ আরম্ভ করল ৬০৮ খৃস্ট পূর্বাব্দে। নগরমধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। দেবতার প্রীত্যর্থে পূজা অর্চনা স্তবপাঠ করা হল, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নাগরিকদের এক শ' দিন উপবাসের আদেশ দেওয়া হল। যথাসম্ভব প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। ফলে দুই বছর ধরে এই নগরী আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারপর নিনেভের পতন হল। পতনের শেষ পর্যায়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জনশ্রুতি এই যে, শেষ আসিরিয়াধিপ নগরে অগ্নিসংযোগ করে জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

আসিরিয়ার পতন পশ্চিম এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের মনে একটি আনন্দের হিল্লোল ছুটিয়ে দিয়েছিল। আসিরিয়ার প্রতি তাদের বিদ্বেষ ছিল অত্যন্ত তীব্র। উৎপীড়িত জাতির অন্যতম প্যালেস্টাইনের হিব্রু জাতি, যে জাতির ওপর আসিরিয়ার নিগ্রহ চলেছিল দীর্ঘকাল ধরে। নির্যাতিতের অন্তরের প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করেছে প্রফেট নাহুমের মুখনিঃসৃত উদ্দীপনাপূর্ণ এই উচ্ছ্বাসোক্তির মধ্যে :

"নিনেভের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে (the burden of Nineveh)!

"জাভে বলেন, এইবার জোয়াল ভেঙে তোমায় মুক্তি দেব, তোমার বন্ধন ছিন্ন করব আমি।···পাহাড় অঞ্চলে ঐ কার পদধ্বনি শোনা যায়, কে যেন শুভবার্তা বহন করে আনছে, শান্তির বাণী প্রচার করছে। আনন্দোৎসব কর জুডা···দুষ্টের আগমন আর ঘটবে না, সে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত।

"রাজপথে রথের ঘর্ঘর। প্রশস্ত পথের ওপর শকটগুলি পরস্পরের পাশ কেটে যায়—মশালের মত দেখায়, ছোটে যেন বিদ্যুৎস্ফুরণ।

"ছুটে চলে তারা, ঘটে পদস্খলন। প্রাচীরের ওপর উঠে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করে।

"নদীর দ্বার খুলে যাবে, রাজপথ ভেসে যাবে।

"পূর্বের মতই নিনেভে রয়েছে স্থির নিষ্কম্প, বাপীজলের মতন। তবু তারা ছুটে পলায়। দাঁড়াও, দাঁড়াও হাঁকে তারা। কিন্তু কেউ তো পিছনে ফিরেও চায় না।

"নিয়ে যাও তোমরা লুণ্ঠিত রৌপ্য, লুণ্ঠিত স্বর্ণ নিয়ে যাও। ভাণ্ডারের নেই শেষ···

"নিনেভে শূন্য, ফাঁকা, বিধ্বস্ত···

"কোথায় সেই সিংহের বাসভূমি, সিংহশাবকের আহারের স্থান, যেখানে বৃদ্ধ সিংহ বিচরণ করত, আর সিংহশাবকেরা করত নির্ভয়ে ছুটোছুটি ?

"ধ্বংস হোক্ সেই রুধিরাক্ত নগর, মিথ্যা ও লুণ্ঠনে ভরা নগর; শিকার তো পালিয়ে যায় না;

"চাবুকের শব্দ, চক্রের ঘর্ঘর, দুরন্ত অশ্বের হ্রেষা, ছুটন্ত শকটের ধ্বনি;

"অশ্বারোহী শাণিত কৃপাণ, ঝক্‌ঝকে বর্শা উত্তোলন করে—আর দেখা যায় নিহতের অগণিত মৃতদেহ। শেষ নেই মৃতের—তারা মৃত-দেহের ওপর হোঁচট খায়।···

"যারা চেয়ে ছিল তোমার দিকে, মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা। বলবে, নিনেভে বিধ্বস্ত—কে তার জন্য বিলাপ করবে ?···

"হে আসিরিয়া-রাজ, তোমার রাখালেরা সুপ্ত, তোমার অভিজাতবর্গ

ধূলায় অবলুণ্ঠিত, তোমার প্রজাবৃন্দ পর্বত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে, কেউ নেই তাদের একত্রিত করবে।

"তোমার গভীর ক্ষত শুষ্ক হবার নয়। তোমার পক্ষাঘাতের কথা যে-ই শুনবে সে-ই দেবে করতালি। কে আছে এমন তোমার দুষ্প্রবৃত্তির নির্যাতন ভোগ করে নি?"

(Nahum 1-3)

পতনের কারণ

ধ্বংসের এমন নিষ্করুণ সূক্ষ্ম বিবরণ বাইবেলে অল্পই আছে। আসিরিয়ার শোচনীয় পরিণাম ঈশ্বরের হস্তে নির্মম পাপাচারীর শাস্তিরূপেই বর্ণনা করেছেন প্রফেট নাহুম। অন্তত আসিরিয়ার ক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিকই বোধ করি তাঁর এই বদ্ধমূল ধর্মবিশ্বাসের প্রতিবাদ করবেন না। আসিরিয়ার পতন নাটকীয়, যেহেতু সামরিক শক্তির মধ্যাহ্নকালেই আসিরিয়া ভেঙে পড়েছিল, এক পাটি তাসের ঘরের মত। মেসিডোনিয়ান, রোমান বা মেমেলুকদের মত আসিরিয়া ঝিমিয়ে পড়ে নি ; তার বিপুল বাহিনী শক্তিশূন্যও হয় নি। যুদ্ধের যন্ত্রগুলি পুরনো হয়ে যায় নি, সেগুলিতে মরচেও ধরে নি। ধ্বংসের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সামরিক উপকরণগুলির মেরামত ও পরিবর্তন, অস্ত্রশস্ত্র বর্মচর্মের উন্নতিসাধন চলেছিল, আর যুদ্ধ-রথ, অবরোধ-যন্ত্র (siege-machine) প্রভৃতির নূতন নমুনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। বিপুল যুদ্ধোদ্যম সত্ত্বেও আসিরিয়ার পতন কেন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল, তার কারণ নিয়ে বিস্তর গবেষণা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যে কয়টি কারণের উল্লেখ করেছেন, মোটামুটিভাবে সেগুলি এইরূপ : পূর্বে পারস্যের ইলাম প্রদেশ ও পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, এমন কি মিশর পযন্ত বিস্তৃত ছিল আসিরিয়ার সাম্রাজ্য। এই বিশাল রাজ্যের সুদূর প্রদেশগুলির সঙ্গে কেন্দ্রশক্তির সংযোগ-রক্ষা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, এমন অবস্থায় স্বভাবতই প্রশাসনের কাঠামো ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রত্যন্তদেশে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নিরন্তর করতে হয়েছে আসিরিয়াকে, শক্তির অপচয়ও ঘটেছে প্রচুর। রাজ্যমধ্যে নানাজাতীয় মানুষ, তাদের মধ্যে না ছিল একাত্মবোধ, না ছিল সংহতি, যা দিয়ে বহু জাতি মিলে কোন একটি মহাজাতি গড়ে

উঠতে পারে। এখানে ওখানে পরাধীন জাতিসমূহের বিদ্রোহ একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। আসিরিয়ার দুর্ব্যবহার, পীড়ন, নৃশংস অত্যাচার, উৎসাদন বা নির্বাসন দ্বারা সমগ্র গোষ্ঠীকে দণ্ডদান—এইসব অনাসৃষ্টি কাণ্ড অধীনস্থ সকল জাতিকেই শত্রুভাবাপন্ন করে তুলেছিল। আপদের চরম দশায় আসিরিয়া যখন পতনের সম্মুখীন হল, করদ মিত্ররাজ্যগুলির মধ্যে এমন একটিও কেউ ছিল না তখন যে তার সাহায্যার্থে অস্ত্রধারণ করে। সেন্‌নাচেরিবের আমল থেকে সৈন্যদলে পরাধীন জাতির ভাড়াটে সৈনিক ভর্তি করবার প্রথা চলে আসছিল। এইসব অকৃতার্থ ভাড়াটিয়ারা যুদ্ধে মৃত অগণিত জাতীয় যোদ্ধার স্থান পূরণ করেছিল। কিন্তু জাতীয় সৈন্যের দেশাত্মবোধ তাদের ছিল না, এবং তারই একান্ত অভাবের ফলে ধ্বংসের গহ্বরে পতন থেকে আসিরিয়াকে তারা রক্ষা করতে পারে নি।

আসিরীয় সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল ছিল অনতিদীর্ঘ—দেড় শতাব্দী মাত্র (খৃঃ পূঃ ৭৫০-৬০৬)। এই অল্পকালের মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত আসিরিয়া যখন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর আঘাতের পর আঘাত করে চলেছিল, আর পরাধীন জাতিসমূহের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে আসছিল, তখনকার সেই চিত্রটিকে একজন আমেরিকান লেখক বর্ণনা করেছেন এইরূপ : ছাত্রকে বেদমভাবে বেত মারতে মারতে শিক্ষক বললেন, "এই আঘাত তোমায় যতখানি পীড়া দিচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশি কষ্ট দিচ্ছে আমায়"—মর্মার্থ এই যে, আঘাতকারীর ক্ষতি হয়েছিল প্রহৃতের চেয়ে বেশি, কেননা আসিরিয়ার হাতে ঘা খেয়েছে এমন প্রত্যেকটি জাতি আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু আসিরিয়া সেই যে পড়ল, আর ওঠে নি কখনো। আসুরিক শক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতই সে ধীরে ধীরে আত্মহত্যা করছিল, কেননা তারই ফলস্বরূপ দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক অশান্তি, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ব্যাপকভাবে জনসংখ্যা হ্রাস। নির্মম ধ্বংস-কার্যের পথপ্রদর্শক আসিরিয়া—তেমনি নিষ্করুণভাবেই শত্রুরা এখন শুধু সামরিক যন্ত্রকে নয়, রাষ্ট্রকে এমন কি জাতিকে পর্যন্ত নির্মূল করেছিল। দু হাজার বছর ধরে জাতির যে ধারাবাহিক অস্তিত্ব চলে আসছিল, তা এখন সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত হয়ে গেল। ধ্বংস-কার্য এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়েছিল যে অদূরভবিষ্যতে আসিরিয়ার স্মৃতিটুকুও

আর অবশিষ্ট রইল না। মাত্র দু শ' দশ বছর পরে পারস্য-সম্রাটের দশ সহস্র ভাড়াটে গ্রীক সৈন্য (Greek mercenaries) যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন নিনেভে নেই। মনুষ্যবাসশূন্য একটি পরিত্যক্ত নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ, সৌধ প্রভৃতির বিপুল আকার ও আয়তন দেখে তারা সকলেই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। দু শ' বছর পরে গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন (Xenophon) ঐ পথ ধরে গিয়েছিলেন। সেখানকার ইতিহাসের কোন তথ্যই জানতে পারেন নি তিনি, এমন কি আসিরিয়ার নামটি পর্যন্ত শোনেন নি।*

* উনবিংশ শতাব্দে বোট্টা (Botta) ও লেয়ার্ডের (Layard) খনন-কার্যের ফলে যেসব প্রস্তরখণ্ড শিলালিপি ও মৃৎ-চাকতি উদ্ধার করা হয়েছিল, সেগুলি থেকেই এই পশুপ্রকৃতি নৃশংস জাতির আদ্যন্ত কাহিনী আমরা জানতে পেরেছি।

॥ ছয় ॥

আসিরীয় রাষ্ট্র সমাজ ও সংস্কৃতি

অতিপ্রাচীন কালের সুমের ও আক্কাড থেকে যে সংস্কৃতি ব্যাবিলোনিয়া লাভ করেছিল উত্তরাধিকার-সূত্রে এবং যার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় প্রাচীন কালের আসুরে, সাম্রাজ্যযুগের আসিরিয়ায় সেই বুনিয়াদী ধারাপ্রবাহেরই একটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল। এই নূতন সংস্কৃতি জগতে কোন নব বার্তা বহন করে আনে নি সত্য, তথাপি কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা, কি শিল্পসৃষ্টি ব্যাপার, এই-সব বিষয়ে আসিরিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা উপেক্ষণীয় নয়, কেননা ঐ বিষয়গুলির মধ্যে আছে অনেক শিক্ষার বস্তু। মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে সাম্রাজ্যবাদের একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান আছে। শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ছোট ছোট বিবদমান রাজ্যগুলির একীকরণ ইতিহাসের একটি প্রয়োজন-রূপেই দেখা দিয়েছিল, এবং পশ্চিম এশিয়ায় সে কার্যটি সুসম্পন্ন করবার কৃতিত্ব আসিরিয়ার। ব্যাবিলনের হাম্মুরাবি ও মিশরের তৃতীয় থাটমোস ছাড়া ইতিপূর্বে আর কেউ আসুরবানিপালের মত বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন নি। অবশ্য অদূরভবিষ্যতে আসিরিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারসীকরাও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

সাম্রাজ্য-শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা

কোন কোন বিষয়ে আসিরীয় সাম্রাজ্যনীতি উদারই ছিল বলতে হয়। নগরগুলির স্বায়ত্তশাসন ও অধীনস্থ জাতিদের ধর্ম, আইন প্রভৃতির ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে সবই পূর্ববৎ বজায় রাখা হয়েছিল। স্থানীয় শাসন প্রথমে ছিল সামন্তদের হাতে, পরে এই প্রথার পরিবর্তন হয়েছিল। প্রদেশে রাজ্যপালকে নিযুক্ত করতেন রাজা। প্রদেশপাল নিয়োগ প্রথম শুরু হয় আসুর-নাজির-পালের রাজত্বকালে, আর সেই ব্যবস্থা ব্যাপকতরভাবে প্রবর্তন করেন তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার, এই পদ্ধতিরই অনুসরণ করেছিল পারসীকরা ও রোমানগণ। প্রদেশগুলির রাজ্যপালের সংখ্যা ছিল ৬০ জন। প্রশাসন-কার্য ও ব্যবসার সুবিধার জন্য সংযোগ-রক্ষার বিশেষ আয়োজন

করেছিলেন সেন্নাচেরিব প্রদেশে-প্রদেশে ডাক বহনের ব্যবস্থা করে। সেই ডাক-যোগে সম্রাটকে নিয়মিতভাবে সংবাদ প্রেরণ করতেন প্রদেশপালগণ, আর সম্রাটের আদেশপত্র পৌঁছত তাঁদের কাছে ডাক মারফত। সেন্নাচেরিব তাঁর পিতার কাছে যে পত্রাবলী লিখেছিলেন, তার কয়েকখানা চাকতি উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজ্যপাল কর আদায় করতেন, সেচ প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের সংগঠন করতেন এবং যুদ্ধের জন্য রংরুট সংগ্রহ করতেন। রাজ্যপালের কাজের ওপর নজর রাখত গুপ্তচরের দল, তারাই রাজাকে রাজ্যের যাবতীয় সংবাদ দিত। চরই রাজার চক্ষু—চারচক্ষুষঃ হি রাজানঃ—রাজনীতির এই মূল তত্ত্বটি ভারতের মতই অধিগত করেছিল আসিরিয়া। আইন-কানুন মোটামুটি-ভাবে ব্যাবিলোনীয় ধরনের হলেও দণ্ডের বিধান ছিল বর্বরোচিত—যেমন অঙ্গচ্ছেদ, খোজা-করণ (castration), চক্ষু ও জিহ্বা উৎপাটন, দেবমন্দিরে অপরাধীর পুত্র বা কন্যাকে জীবন্ত অগ্নিদাহ। প্রাচীন সুমেরীয় পদ্ধতি অনুসারে রাজ্য শাসন করতেন রাজা আসুর-দেবের নামে—দেবতাই ছিলেন রাজ্যের অধিপতি। এরূপ কল্পনা করা হয়েছে যে, আইন প্রণয়ন করা হয় দেবতার প্রীত্যর্থে, কর সংগ্রহ যুদ্ধবিগ্রহ করা হয় দেবতার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ও গৌরব বর্ধনের জন্য।

আসিরীয় সাম্রাজ্য তার মূল ভিত্তি সামরিক শক্তির ওপরই দাঁড়িয়ে ছিল। রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল শক্তি সংগঠনের উপায়, প্রণালী ও উপকরণ উদ্ভাবন করা। তাই মানব-প্রগতিকে যে জিনিসটি বিশেষরূপে দান করেছে আসিরিয়া, তা হল সামরিক শিল্প ও কৌশল। খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ধাতুদ্রব্য নির্মাণ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত, এই উভয়বিধ শিল্পেই ব্রঞ্জের পরিবর্তে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। এশিয়া মাইনরে হিটাইটরা লোহার ব্যবহার করত, তারা ছিল আর্যজাতি, লৌহের ব্যবহার আসিরিয়া শিক্ষা করেছিল সম্ভবত সেই জাতির কাছ থেকেই। সামরিক কার্যে নবলব্ধ বিদ্যা প্রয়োগ করে লৌহনির্মিত নানা প্রকার অস্ত্র প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত করেছিল আসিরিয়া। দ্বিতীয় সারগনের রাজপ্রাসাদের একটি মাত্র অস্ত্রাগারে ৩০০ টন পরিমাণ লৌহাস্ত্র পাওয়া গেছে। সমগ্র বাহিনীকে লোহার অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়েছিল, প্রত্যেকটি সৈনিককে লোহার বর্ম,

শিরস্ত্রাণ, ঢাল প্রভৃতি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি দেখেছি আমরা আণবিক শক্তির প্রয়োগে জাপানকে পর্যুদস্ত করা হয়েছে, ঠিক তেমনি-ভাবেই লৌহ-অস্ত্রের প্রাদুর্ভাব আসিরীয় সমরশক্তিকে অপরাজেয় করে তুলেছিল। লৌহের মত অশ্বের ব্যবহারও শিক্ষা করেছিল আসিরিয়া আর্য-জাতির কাছ থেকে। রথচালনা ছাড়াও অশ্বের নূতন ব্যবহার দেখা দিয়েছিল, অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী গঠনের সঙ্গে। চতুরঙ্গ বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল—তীরন্দাজ সৈন্য, ঢাল-বর্ষাধারী পদাতিক, অশ্বারোহী ও রথী। রোমানদের মতই এদের সামরিক সংস্থা ও রণকৌশল ছিল উচ্চাঙ্গের। বিদ্যুদ্‌গতিতে সৈন্যচালনা করে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত শত্রুবাহিনীর এক একটি অংশের ওপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়া নেপোলিয়নের ছিল বিশেষত্ব, তাঁর এই কৌশলটিও আসিরীয় সমরকর্তাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। দুর্গপ্রাচীর বিধ্বস্ত করবার যন্ত্র (battering ram) এবং নগর অবরোধের যন্ত্র (siege machine) তাদের ছিল রোমানদের মতই। এইসব অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে যখন কোন দুর্ভাগ্য জাতির ওপর আক্রমণ শুরু হত, তখন সমূল ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবার তার আর কোন উপায়ই থাকত না। আসিরীয় সৈন্যরা ছিল স্বভাবত হিংস্রপ্রকৃতি, বিজিত দেশের উপর নানান উপদ্রব, এমন কি বিস্তৃতভাবে লুণ্ঠন ও দহন দ্বারা দেশকে উৎসন্ন করত। ধূমায়মান শহরের ধ্বংসস্তূপের পাশে সারি সারি প্রোথিত খুঁটির ওপর ঝুলিয়ে রাখা হত বিদ্রোহী নেতাদের দেহ, যেসব দেহ থেকে চামড়া ছুলে ফেলা হয়েছে। বিজয়োৎসব সম্পন্ন হত নগরের অধিবাসীদের ব্যাপকভাবে হত্যা করে, মৃতদেহের স্তূপাকার পাহাড় তৈরি করে। আমাদের দেশে একদিন যা নাদিরশাহী হত্যাকাণ্ড বলে কুখ্যাত হয়েছিল, যেরকম নিদারুণ নৃশংসতা ইতিহাসে দেখতে পাই আমরা মোঙ্গল তৈমুরলঙ্গ ও হূন আটিলা কর্তৃক অনুষ্ঠিত, সেইসব বীভৎস কাণ্ডের পথ-প্রদর্শক আসিরিয়া। দর্পিত বাহুবলের কাছে যেখানে নীতর আদর্শ লাঞ্ছিত হয়, বাহুবলের অনাচার সেখানে ঘরের বাইরে আবদ্ধ থাকে না, ঘরের মধ্যেও তা প্রবেশ করে। আসিরিয়ারও হয়েছিল তাই। সেন্নাচেরিবকে হত্যা করেছিল তার পুত্ররা, আর আস্থরবানিপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তার ভ্রাতা সামাস-সুম্-উকিন। যেরূপ নিষ্ঠুর উপায়ে ভ্রাতার বিদ্রোহ দমন করে ব্যাবিলন অধিকার করেছিলেন আস্থরবানিপাল, তার একটি বর্ণনা আছে এবং

অন্যান্য বর্ণনার মত এটিও ন্যক্কারজনক : "বন্দী সৈন্যদের জিহ্বা উৎপাটন করেছিলেন তিনি, তারপর তাদের গদাঘাতে বধ করেছিলেন। নাগরিকদের ব্যাপকভাবে হত্যা করেছিলেন পক্ষযুক্ত বৃষমূর্তির সমুখে ('in front of the great winged bulls') যেখানে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তাঁর পিতামহ সেন্নাচেরিব অমনি আর একটি হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিলেন।" প্রত্যেক রাজার রাজত্বের শেষ ভাগেই দেখা দিয়েছে বলপূর্বক সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা, বৃদ্ধ রাজা তাঁর চারদিকেই ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা দেখতে পেয়েছেন, অনেক সময় তাঁর জীবনকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে হত্যার দ্বারা। প্রাচ্যের অনেক দেশেই এরূপ ব্যাপার ঘটেছে। ভারতের ইতিহাসে তুর্কী ও মোগলদের শাসনকালে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বিদ্রোহ, ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার যুদ্ধ, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, অনেক কুকাণ্ডই ঘটতে দেখা গেছে। প্রাচ্য রাজন্যদের হিংসাত্মক কার্যের প্রতি আসক্তির অভিযোগ সম্বন্ধে একজন আমেরিকান লেখক এই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তিটি করেছেন, "The nations of the Near East preferred violent uprisings to corrupt elections, and their form of recall was assassination."—অর্থাৎ নিকট প্রাচ্যের জাতিরা অসাধু নির্বাচনের চেয়ে হিংসাত্মক বিদ্রোহকেই বেশি পছন্দ করেছে, এবং অনাস্থার ডাক বা 'রিকল' নামক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির স্থান হত্যাই অধিকার করেছে। কথাটা যে উড়িয়ে দেবার মত নয় তা অনস্বীকার্য। তবে সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার, সাংবাদিক যেমন চায় চাঞ্চল্যকর ঘটনার বিবরণ দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে, ইতিহাসের রচনা-পটুত্বও তেমনি হিংসাত্মক কার্যের বর্ণনাতেই পরিস্ফুট হয়েছে। তাই শান্তির নীরবতা, চিন্তার উৎকর্ষ তেমন কোন বিশিষ্ট স্থান পায় নি ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

শ্রেণী, ভাষা, ধর্ম ও সাহিত্য

আসিরীয়রা বণিকের জাতি ছিল না, অধীনস্থ জাতিদের কাছে কর ও সম্মান আদায় করেই সন্তুষ্ট থাকত তারা। ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার ছিল ব্যাবিলোনীয়দের ওপর। ফিনিসীয় ও আরমানিগণও ব্যবসার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে অধিকারী ছিল। মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হত 'ইস্তারের মস্তক' ('Ishtar's head') অঙ্কিত ধাতুখণ্ড। ব্যাবিলোনিয়ার বণিকেরা যখন দেখল যে, পশ্চিম

অঞ্চলে তাদের বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করবার কোন অভিপ্রায়ই নেই আসিরিয়ার, তখন তারা আসিরীয় সাম্রাজ্যের সুহৃদ হয়ে উঠেছিল—এমন কি, স্বদেশকে আসিরিয়ার সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীন করতেও আপত্তি করে নি। ব্যাবিলোনিয়ায় বিদ্রোহ করেছিল শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণ। আর সমাজ-সংস্থার একটি অতি প্রয়োজনীয় ও শক্তিশালী অংশ—বণিকের দল—অর্থের জন্য আসিরিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে নি। বণিক-প্রধান ব্যাবিলোনিয়া—ভূস্বামীরা ছিল কৃষিপ্রধান আসিরিয়ার ধনী সম্প্রদায়। রোমানদের মত তারাও বণিকদের ঘৃণার চক্ষেই দেখত, কেননা সস্তা দরে কিনে জিনিস চড়া দরে বিক্রি করে বণিকেরা। ভূস্বামীর মুখে ব্যবসায়ীর নিন্দা, চালুনি যেন সুচের ছিদ্র বের করছে! এমনি ব্যাধির প্রকোপ আমাদের দেশে বিলক্ষণ দেখা গেছে, এবং তারই একটা প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই আমরা আজ চোখের সামনে, যখন প্রতিপত্তি-শালী জমিদারবাবুরা গেছেন একেবারে তলিয়ে, এবং তাদের স্থান মহা-সমারোহে অধিকার করেছে ধনী ব্যবসায়ী-সমাজ।

আসিরীয় সমাজ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : (১) অভিজাতবর্গ, আমীর-ওমরাহের দল ; (২) কারিগর ও শিল্পী, কর্ম অনুসারে তারা ছিল দলবদ্ধ (guilds) ; (৩) স্বাধীন শ্রমিক ও কৃষক ; (৪) সার্ফ (serf)—যেসব কৃষিজীবী সারা জীবন মনিবের জমি ভাগচাষ করতে বাধ্য, জমি ছেড়ে চলে যেতে পারে না কখনো তারাই সার্ফ; মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই প্রথার বহুল প্রচলন ছিল ; (৫) ক্রীতদাস ; যুদ্ধে বন্দী, ঋণের দায়ে যারা স্বাধীনতা হারিয়েছে এরূপ ব্যক্তিদের ক্রীতদাস করা হত, তারাই করত পরিচর্যার কাজ। সেন্নাচেরিবের একখানা খোদাই-করা প্রস্তরমূর্তিতে দেখা যায় যে ক্রীতদাসেরা কাঠের স্লেজের ওপর স্থাপিত একখণ্ড ভারি প্রস্তরমূর্তি টেনে নিয়ে চলেছে, আর পরিদর্শকেরা তাদের ওপর চাবুক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সিরিয়ার আরামিয়ানদের কথা আগে বলা হয়েছে। বিবাদ-বিসংবাদ সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান ঘনিষ্ঠভাবেই চলেছিল আসিরিয়ার। ফলে, আসিরীয় সমাজে আরামিয়ান ভাষাভাষীর সংখ্যা খুবই বেশি হয়ে পড়েছিল। রাজ্যে চলত দুই ভাষা—আরামিয়ান (Aramaic) ও আসিরীয়। রাজকার্যে কেরানীর পদগুলি আরামিয়ানরাই দখল করেছিল।

পুরোহিতের প্রাধান্য ছিল না আসিরিয়ায়, সেন্নাচেরিব ব্যাবিলনে পূজারীদের উৎসাদন করেছিলেন। রাজা দেবাদিদেব আস্থরের প্রতীক বা অবতার বলে পরিগণিত হলেও জাতির হিংস্র স্বভাবকে ধর্ম প্রশমিত করতে পারে নি। আস্থর রুদ্রমূর্তি সূর্য-দেবতা, ঘোর রক্তপিপাসু। বন্দী শত্রুসৈন্যদের বলি দেওয়া হত তাঁর কাছে, নররক্তপানেই ছিল তাঁর আনন্দ। ইস্‌তার পূজিত হতেন রণচণ্ডীরূপে। আস্থর ও ইস্‌তারের তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁদেরই আদেশে যুদ্ধযাত্রা করতেন নৃপতিগণ—এ ছাড়া দেবতার কোন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ইঙ্গিত আসিরীয় ধর্মে দেখা যায় না। বস্তুত আসিরিয়ায় ধর্মের প্রধান কর্মই ছিল ভবিষ্যৎ নাগরিককে দেশপ্রেমিকের বশ্যতা—অর্থাৎ নির্বিচারে শাসকবৃন্দের আদেশ পালন বিষয়ে উপদেশ এবং দেবতার তুষ্টির জন্য মন্ত্রতন্ত্র ও বলিদান সম্বন্ধে শিক্ষাদান। ধর্মগ্রন্থ যেসব উদ্ধার করা গেছে সেগুলি মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, নানান লক্ষণের অর্থ নির্ণয় প্রভৃতি বিস্তারিত তালিকা দিয়ে ভরা। প্রত্যেকটি নৈসর্গিক বা অন্য ঘটনা কিরূপ ভবিষ্যৎ সূচনা করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাই বর্ণিত হয়েছে। এইসব উদ্ভট মন্ত্রাদিই আসিরিয়ার ধর্ম-সাহিত্য। তা ছাড়া ছিল আর এক প্রকার সাহিত্য, আসিরিয়ার একান্ত নিজস্ব—এই সাহিত্য নৃপতিগণের দিগ্বিজয় বর্ণনার মধ্যে পরিস্ফুট। খালুলি যুদ্ধের বর্ণনায় যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে, শৌর্য-বীর্যের এমন নিপুণ ব্যঞ্জনা প্রাচীন সাহিত্যে সত্যই দুর্লভ। অন্যান্য সাহিত্য ব্যাবিলোনীয় সাহিত্যের নিকৃষ্ট অনুকরণ। তবে আসিরীয় পাঠাগারগুলিতে অসংখ্য প্রাচীন মৃৎলিপি সযত্নে রক্ষিত হত, এবং তা থেকে বোঝা যায় নৃপতিগণ ছিলেন বিদ্যানুরাগী।

বিজ্ঞান ও কলা-শিল্প

আসিরিয়ায় একটি মাত্র বিজ্ঞান প্রতিপত্তি লাভ করেছিল—সেটি সামরিক বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান আনুষঙ্গিক মাত্র। চিকিৎসাবিদ্যা ছিল ব্যাবিলোনীয়, জ্যোতির্বিদ্যাও তাই—কেবল ভবিষ্যৎ গণনার জন্যই জ্যোতির্বিদ্যার আবশ্যক হত। তত্ত্বদর্শনের কোন বালাই ছিল না আসিরীয় জাতির। কিন্তু কতগুলি ব্যবহারিক শিল্প, স্থাপত্যবিদ্যা ও কলা-শিল্পের চর্চায় বিরত হয় নি তারা। প্রকৃতপক্ষে, এইসব শিল্প বিষয়ে তারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

খনন-কার্যে সেন্নাচেরিবের রাজ্যকালের একটি পয়ঃপ্রণালীর কিয়দংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। পয়ঃপ্রণালীটি সুদীর্ঘ, ত্রিশ মাইল দূর থেকে জল প্রবাহিত করা হয়েছিল নিনেভে নগরে এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে। বলা হয়েছে, এই প্রস্তরনির্মিত পয়ঃপ্রণালী (aqueduct) পৃথিবীতে সুবিদিত। ব্যাবিলন ইঁটের তৈরি শহর, ইমারত নির্মাণ কাজে ব্যাবিলোনীয় শিল্প চুল্লীতে পোড়ানো ইঁটের ব্যবহার করত, পাথরের ব্যবহার হত কদাচিৎ। আসিরিয়ার উত্তরেই পাহাড়, পাথর সংগ্রহ সহজেই করা যায় সেখানে। সেজন্য আসিরিয়ায় বাড়ি তৈরি হত পাথরের, অথবা কাঁচা ইঁটের দেয়ালের বাইরের দিক পাথর দিয়ে গাঁথা হত। সেন্নাচেরিব রাজা হয়ে রাজধানী নিনেভে নগরে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এই নগরটি তৈরি হয়েছিল পাথর দিয়ে। পাথরে খোদাই করা হয়েছে নানারূপ কারুকার্য—পাথরের মূর্তি, খিলানের কাজ (arch), ইঁটের ওপর এনামেল-করা চিত্র। আসিরিয়ার স্থাপত্যের একটি বিশেষত্ব, খিলানের কাজ। স্থূলভাবে খিলান নির্মাণ করতে ব্যাবিলোনীয় শিল্পীরাও জানত, কিন্তু আসিরিয়ার তিন-খিলানযুক্ত প্রাসাদতোরণ (triple arches) সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বিরাট দর্শনীয় বস্তু। এইরূপ খিলানই রোমান খিলানশিল্পের পুরোধা। খিলানের গাত্র এনামেল-করা চিত্রিত ইষ্টক দ্বারা পরিশোভিত, আর তার দুই দিকেই সারি সারি প্রস্তরমূর্তি, মাথা মানুষের কিন্তু দেহ বৃষের। রাজকীয় নগরের সব জায়গা থেকেই তোরণের খাঁজ-কাটা (castellated) প্রাচীরচূড়াটি দেখা যেত। আসিরীয় শিল্পের অনেক জিনিস অন্য জাতিদের কাছ থেকে ধার করা—কথাটা পুরোপুরি সত্য না হলেও, অনেকটা তাই। কারু-শিল্প ও কারিগরি শিল্প এই উভয়বিধ শিল্পের উন্নতি সম্ভব হয়েছিল বিদেশ থেকে শিল্পীর আমদানি করে। আসিরিয়ার রূপসজ্জার শিল্প (decorative art) এবং রঙিন-ইঁটের ওপর এনামেলের কাজ মিশরীয় শিল্প থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসিরীয়রা এই শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিল, এমন কি ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই শিল্প বিষয়ক একটি গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। ফিনিসীয় শিল্পীরা করেছে নানা রকম ব্রঞ্জের কাজ। জলসেচের যন্ত্র ব্রঞ্জ দিয়ে নির্মাণ করা সেন্নাচেরিবের আমল থেকে শুরু হয়েছিল। একটি তোরণ সম্বন্ধে সেন্নাচেরিব নিজেই বলে গেছেন

যে, হিটাইটদের কোন রাজপ্রাসাদের আদর্শ ধরেই তোরণটি নির্মাণ করা হয়েছে।

শিল্পক্ষেত্রে আসিরিয়া তার গুরু ব্যাবিলোনিয়ার সমকক্ষ হয়েছিল, এবং পাথরে খোদাই-করা কাজে গুরুকেও অতিক্রম করেছিল, বিবিধ প্রকার অনুকরণের নিদর্শন সত্ত্বেও এই কৃতিত্ব আসিরিয়ার প্রাপ্য। বিরাট রাজ-প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল—সৌন্দর্য অপেক্ষা আকারের বিরাটত্বের ওপরই সম্ভবত নজর ছিল বেশি, যদিও এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলবার উপায় নেই। কারণ, কোন প্রাসাদই এখন দাঁড়িয়ে নেই, ধ্বংসাবশেষগুলি বালুস্তূপ-সমাচ্ছন্ন। ইতিহাসখ্যাত রাজারা সকলেই যে বিরাট নির্মাণ-কার্য করেছিলেন তার লিখিত বিবরণ আছে। প্রথম টিগলাথ পিলেসার তাঁর নির্মিত পাথরের মন্দিরের বিবরণ দিয়ে বলেছেন, "তিনি মন্দিরের খিলান আকাশের চন্দ্রাতপের মতই ঝকঝকে করেছেন, দেয়ালগুলিকে করেছেন নক্ষত্রখচিত শোভা-সমুজ্জ্বল।" দ্বিতীয় সারগন যে বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, তার ফটকের দুই পাশে ছিল পক্ষযুক্ত বৃষ (winged bulls), দেয়ালের পালিশ-করা টালির ওপর চিত্র-বিচিত্র সজ্জা, বৃহৎ কক্ষগুলি নানান কারুকার্য-করা আসবাব ও প্রস্তরমূর্তি দিয়ে সাজানো। বন্দীদের নির্মাণ-কার্যে নিয়োজিত করা হয়েছিল, প্রাসাদ ও নগরের শোভাবর্ধন করা হয়েছিল দিগ্বিজয়ের লুণ্ঠিত সোনারুপো ও বহুমূল্য পাথর দিয়ে। প্রাসাদের পিছন দিকে একটি সাততলা জিগ্‌গুরাট (ziggurut) নির্মাণ করে দেবতাকে উৎসর্গ করেছিলেন সারগন, স্বর্ণ ও রৌপ্য দিয়ে চূড়াদেশ মণ্ডিত করেছিলেন। সেন্নাচেরিব নিনেভে নগরে একটি সৌধ নির্মাণ করেছিলেন—তার নাম ছিল "অতুলনীয়" ('The Incomparable')। প্রাচীনকালের কোন সৌধই এত বৃহৎ ছিল না। বহুমূল্য ধাতু, পাথর ও কাঠের দেয়াল ঝলমল করত। টালিগুলির (glazed-tiles) চাকচিক্য ছিল জ্যোতিষ্কের মতই উজ্জ্বল। কর্মকারেরা তাম্র ঢালাই করে প্রকাণ্ড সিংহ ও বৃষ মূর্তি নির্মাণ করেছিল। পক্ষযুক্ত বৃষ-মূর্তি তৈরি করেছিল ভাস্করেরা পাথর কেটে, এবং নানান দৃশ্য দেয়ালে খোদাই করেছিল।

মানুষের প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করতে আসিরীয় শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারে নি। কারণ বোধ করি এই যে, মানুষের প্রতিমূর্তি নির্মাণ

ভাস্কর্যে আসিরীয় সম্রাট আস্সুরবানিপালের শিকার-দৃশ্য

(ক) সিংহ-মূর্তি—আসুর-নাজিরপালের ভাস্কর্য
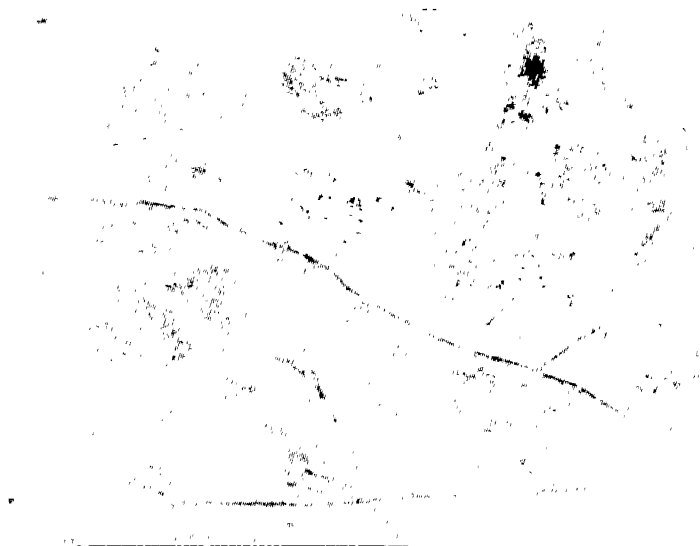
(খ) শরবিদ্ধা 'মরণোন্মুখিনী সিংহী'—আসুরবানিপালের প্রাসাদ-গাত্রে খোদিত

সম্বন্ধে কতগুলি নিয়ম (convention) দিয়ে শিল্প-শৈলীকে এমন ধারা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে আকৃতির স্বাভাবিক রূপকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয় নি। আসিরীয় ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—দ্বিতীয় আস্থর-নাজির-পালের কালের একটি প্রস্তরমূর্তি, দেবতা মারদুক অপদেবতা তিয়ামতকে বধ করছেন। মনুষ্যমূর্তিগুলি সব যেন একই ছাঁচে ঢালাই, কঠিন ও রুক্ষ, অভিব্যক্তিশূন্য। কিন্তু জীবজন্তুর মূর্তিগুলি জীবন্ত, শিল্পীর অদ্ভুত শক্তির পরিচায়ক। সিংহ, অশ্ব, গর্দভ, মৃগ, পক্ষী, পতঙ্গ সব রকম জীবজন্তুর প্রতিকৃতি নানান ভঙ্গীতে দেখা যায় প্রাসাদ-প্রাচীরের গাত্রে (dado) এনামেল-করা ইঁটের ওপর অঙ্কিত, অথবা প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ (bas-relief)। অধিকাংশই শিকারের দৃশ্য—ভল্লবিদ্ধ পশুর মৃত্যুযন্ত্রণা মুখে প্রকটিত, শিহরনে কম্পনে মাংসপেশীর মধ্যে অভিব্যক্ত। দ্বিতীয় সারগনের পাথরে উৎকীর্ণ অশ্ব, সেন্নাচেরিবের প্রাসাদে আহত সিংহের প্রতিমূর্তি, আস্থরবানিপালের প্রাসাদে আলাবেস্টরে

সপ্তম খৃস্টপূর্বাব্দের মরুবাসী আরব—আস্থরবানিপালের রাজত্বকালের ভাস্কর্য—
বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত

খোদিত শরবিদ্ধা 'মরণোন্মুখিনী সিংহী' ("the Dying Lioness")—ভাস্কর্যের এমনি কত উৎকৃষ্ট নিদর্শন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে আরোহণ করেছিল এই শিল্প আস্থরবানি-

পালের আমলে, শরবিদ্ধা সিংহীর প্রতিচ্ছবিটি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়—পিছনের পা দুটি পঙ্গুভাবে এলিয়ে পড়েছে, স্তম্ভের মত সুদৃঢ় সামনের দুই পায়ের ওপর দেহটি রয়েছে ভর করে, আর বিবৃত মুখটি দেখা মাত্রই যেন বিকট আর্তনাদ কানে শোনা যায়। বৃটিশ মিউজিয়ামের নিনেভে গ্যালারিতে রক্ষিত একটি ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ দুটি রেখাচিত্র এখানে দেওয়া হয়েছে, আসুরবানিপালের রাজত্বকালের ভাস্কর্য, উটের পিঠে আরূঢ় দু'জন আরব যাযাবরের প্রতিকৃতি। মরুভূমিতে ধাবমান উটের গতিভঙ্গী অপূর্ব, একটি চিত্রে তীরবিদ্ধ জনৈক আততায়ী উটের পায়ের নীচে শায়িত।
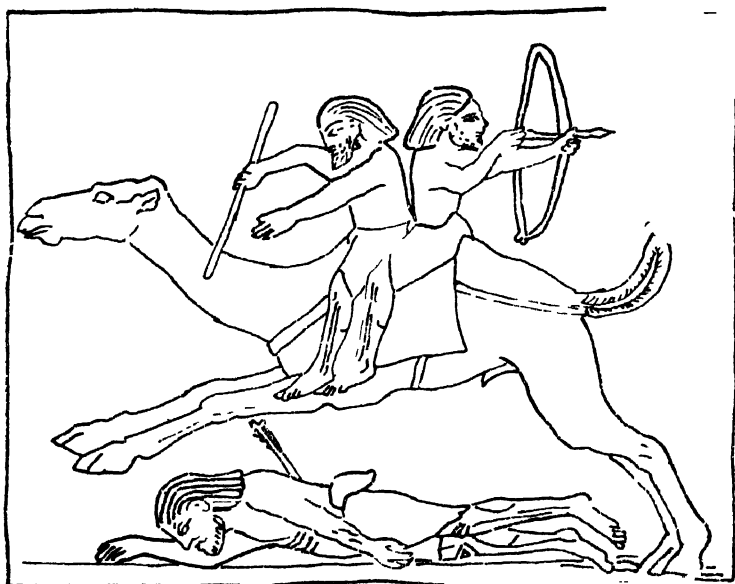
সপ্তম খৃস্টপূর্বাব্দের মরুবাসী আরব—আসুরবানিপালের রাজত্বকালের ভাস্কর্য—
বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত

গ্রীকরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ভাস্কর্যে মনুষ্যমূর্তি নির্মাণে, ইতালীয়রা চিত্রাঙ্কনে—তেমনি আসিরীয়রা সিদ্ধহস্ত ছিল bas-relief বা পাথরের ওপর পশু-চিত্র খোদাই-কার্যে। আসিরীয়দের হিংস্র স্বভাব-প্রকৃতিই যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছিল শিল্পীর হাতে পশুমূর্তি সৃষ্টির মধ্যে। শিল্পী যে সেই হিংস্র ভাবটিকে মনুষ্যমূর্তির মধ্যে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলেন নি, পশুমূর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, আর্টের পক্ষে এইটেই হয়েছিল একটি মস্ত লাভ!

॥ সাত ॥

ক্যালডিয়ান বা নব-ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্য

নবোপোলাস্‌সার ও নেবুকাড্‌নেজ্‌জার

আসিরিয়ার বর্ণ-বৈচিত্র্য-ভরা সাম্রাজ্য আকাশ-চেরা জ্যোতির তেজে যেমন একদিন চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছিল, নিঃশেষও হল তেমনি সে উল্কার মত। তখন সেই ফাঁকা শূন্যের মধ্যে শেষবারের মত একটি নূতন সেমেটিক রাজ্য ব্যাবিলোনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অল্প কিছু কালের জন্য (খৃঃ পূঃ ৬২৫-৫৩৯)। এই নূতন রাজ্যের নাম—ক্যালডিয়ান (Chaldean) বা নব-ব্যাবিলোনীয় (Neo-Babylonian) সাম্রাজ্য। রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নবো-পোলাস্‌সার বা নবু-পাল-উজ্জার। তিনি ছিলেন ক্যালডিয়ায় আসিরিয়া কর্তৃক নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধি। মিডিসরা যখন নিনেভের ওপর ঘন ঘন হানা দিতে আরম্ভ করেছিল, আসিরিয়ার দুর্বলতার সুযোগ তখন তিনি সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করলেন, মিডিস-রাজ উভক্ষত্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে। হিরোডোটাসের বর্ণনায় আছে, উভক্ষত্রের পৌত্রী আসিতিসের সঙ্গে তিনি তাঁর পুত্র নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের বিবাহ দিয়েছিলেন। উভক্ষত্রের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং নবোপোলাস্‌সাব, এরূপ মতবাদও প্রচলিত দেখা যায় ঐতিহাসিকদের মধ্যে। মিডিসদের আক্রমণে তাঁর সক্রিয় সাহায্যের ফলে যখন নিনেভেব পতন ঘটল, তখন আসিরীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারে বেশ উদ্যোগী হয়েই তিনি ব্যাবিলোনিয়ার দক্ষিণ অংশে রাজ্য স্থাপন করলেন, সম্ভবত মিডিসদের অধীনে। এদিকে মিশর-রাজ নেকো আসিরীয় সাম্রাজ্যের ছিন্ন টুকরোগুলি কুড়িয়ে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া দখল কবে ইউফ্রেটিস নদীর তীরে এসে উপস্থিত হল মিশরীয় বাহিনী। নবোপোলাস্‌সার প্রমাদ গণলেন। ব্যাবিলোনিয়াকে নির্বিরোধে মিশরেব হাতে সমর্পণ করবার অভিপ্রায় তাব আদৌ ছিল না। নেকোর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যুবরাজ নেবুকাড্‌নেজ্‌-জারকে পাঠালেন তিনি সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অধিনায়করূপে। খৃঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে কারকেমিশ নগরের সন্নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধল (battle of Carchemish), এবং সেই যুদ্ধে মিশরীয় সেনাদলের সাংঘাতিক

পরাজয় ঘটল। ছত্রভঙ্গ সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে নেবুকাড্‌নেজ্‌জার মিশরের প্রান্তদেশ পর্যন্ত এসেছিলেন, কিন্তু সেই সময় পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁকে ব্যাবিলনে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সেখানে বিপুল সমারোহে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল (খৃঃ পূঃ ৬০৪)।

ইহুদিদের ব্যাবিলনে নির্বাসন

কারকেমিশ যুদ্ধের পর সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ব্যাবিলনের অধীন রাজ্যে পরিণত হল। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ক্ষুদ্র রাজ্য জুডার অধিপতি জেহোইয়াকিম সর্বান্তঃকরণে ব্যাবিলনের আধিপত্য মেনে নেন নি, কিছু-কাল পরেই স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন। সেই ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে নেবুকাড্‌নেজ্‌জার প্যালেস্টাইন অধিকার করবার জন্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। এই সময় জুডায় জেরেমিয়া নামে একজন প্রফেট বা পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি ইহুদি জাতির পাপাসক্তির ঈশ্বরদত্ত দণ্ডরূপে ব্যাবিলনের শাসন শিরোধার্য করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু অদূরদর্শী জুডাধিপতি তাঁর সময়োচিত বিজ্ঞ উপদেশে কর্ণপাত করলেন না। ফলে ইহুদিরাজ জেহোইয়াকিম যুদ্ধে বন্দী হয়ে ব্যাবিলনে প্রেরিত হলেন, এবং সেই সঙ্গে দশ হাজার ইহুদিকে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয়েছিল (খৃঃ পূঃ ৫৯৬)। নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের নির্দেশমত জুডার রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন জেড্‌কিয়া কিন্তু অল্পকাল মধ্যে এই নূতন রাজাটিও ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন। তখন নেবুকাড্‌নেজ্‌জার যুদ্ধযাত্রা করলেন ইহুদি সমস্যা চিরকালের জন্য চূড়ান্তভাবে মিটিয়ে দেবার জন্য। ৫৮৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে নেবুকাড্‌নেজ্‌জার জেরুসালেম নগর দ্বিতীয় বার দখল করে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করলেন, প্রাসাদগুলি করলেন চূর্ণবিচূর্ণ, রাজা সলোমনের মন্দিরটিকেও ধ্বংস করলেন। জেড্‌কিয়ার সমুখেই তাঁর পুত্রদের হত্যা করে তাঁর চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করা হয়েছিল। পরিশেষে জেরুসালেমের সমস্ত ইহুদিদের বন্দী করে ব্যাবিলনে নির্বাসিত করা হয়েছিল। এই সময়কার ইহুদিদের ব্যাবিলনে বন্ধাবস্থার বর্ণনা দিয়ে বাইবেলের 'সাম' (Psalm) কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা আছে :

ব্যাবিলন নদীতটে বসিলাম আসি,
জিয়নেরে (Zion) স্মরি কত ঢালি অশ্রুরাশি—
ঝুলায়ে রাখিনু বীণা তরুশাখা 'পরে,
নীরব সংগীত—আর সুধা নাহি ঝরে।
বন্দীদের নির্বাসনে নিয়ে যায় যারা
চায় গান—আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা—
বলে, গাও জিয়নের সংগীত মধুর।
কোথা পাব গীত, হায়! কণ্ঠে নাই সুর—
অজানা বিদেশে?

(*Psalm 137*)

ব্যাবিলন ও উর পুনর্নির্মাণ

ব্যাবিলন নগর সেন্নাচেরিব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলেন, নানান যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থেকেও সেই শহরটিকে নিখুঁতভাবে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন নেবুকাড্নেজ্জার। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই রাজার পূর্বকালের কোন সৌধের চিহ্নমাত্র খুঁজে পান নি। নেবুকাড্নেজ্জার নিজেই প্রশ্ন করেছেন, "শক্তির দ্বারা যে রাজধানী নির্মাণ করেছি আমার মহিমা বর্ধনের জন্য, এ কি সেই বিরাট (প্রাচীন কালের) ব্যাবিলন নয়?"* তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য ব্যক্ত করেছিলেন তিনি মারদুক-দেবের উদ্দেশে একটি প্রার্থনার মধ্যে : "তোমার মহিমাময় মূর্তিকে আমার নিজের জীবনের মতই প্রিয় মনে করি। ব্যাবিলনের বাইরে কোন স্থান বসবাসের জন্য নির্বাচিত করি নি আমি। হে করুণাময় মারদুক, যে গৃহ আমি নির্মাণ করেছি তা যেন চিরস্থায়ী হয়, গৃহের জাঁকজমক যেন আমাকে তৃপ্ত করে। আমি যেন বহু সন্তান-সন্ততি নিয়ে বৃদ্ধকালে এই গৃহে অবস্থান করতে পারি। সর্ব দেশের রাজগণের, সর্ব মানবের প্রেরিত কর আমি যেন এই গৃহে গ্রহণ করতে পারি।"

তাঁর এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। তিনি মিশরকে ব্যাবিলোনিয়ার

* "The King spake, and said, Is not this great Babylon, that I have built for the house of the kingdom by the might of my power, and for the honour of my majesty?" (*Daniel 4*)

একটি প্রদেশে পরিণত করেছিলেন—জোসেফাসের এই কিংবদন্তীর উল্লেখ সম্ভবত অতিশয়োক্তি। কিন্তু তিনি যে অন্তত একবার মিশরের অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। তিনি একজন দিগ্বিজয়ী বীর মাত্র ছিলেন না, পুনর্নির্মাণ কার্যে কিরূপ সুদক্ষ ছিলেন, তার চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়েছেন হিরোডোটাস। দেড় শ' বছর পর হিরোডোটাস যখন ব্যাবিলনে এসেছিলেন নেবুকাড্‌নেজ্‌জার নির্মিত শহরটি তখনো 'বিশাল সমতলভূমির মধ্যস্থলে' মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। প্রশস্ত প্রাকারবেষ্টিত শহর, চার ঘোড়ার রথ চলে প্রাকারের ওপর দিয়ে। দু শ' বর্গমাইল আয়তনকে পরিবেষ্টিত করে আছে সেই নগর-প্রাচীর। তালকুঞ্জ-শোভিত নগর ইউ-ফ্রেটিসের উভয় তীরে অবস্থিত, তীর দুটি সুন্দর সেতু দিয়ে বাঁধা। ইস্‌তার ফটক, ব্যাবেলের মিনার ও ঝুলন্ত বাগানের কথা পূর্বে বলা হয়েছে ব্যাবি-লোনীয় শিল্প প্রসঙ্গের আলোচনায়, এগুলি সবই নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের কীর্তি। হিরোডোটাসের বর্ণনায় ৬৫০ ফিট উঁচু একটি বিরাট জিগগুরাটের উল্লেখ রয়েছে, সেটি প্রথমেই পড়ে দর্শকের চোখে, এনামেল-করা চূড়া সূর্যকিরণে ঝলমল করে। পিরামিডের চেয়েও উঁচু সেই সৌধ সাতটি ধাপে উঠে গেছে ঊর্ধ্বদেশে, চূড়ার ওপর সুবর্ণ-আসনে দেবতা আসীন, আর তারই পাশে রয়েছে শয্যা বিছানো যেখানে প্রতিদিন নিশীথে কোন-না-কোন দেবদাসী এসে শয়ন করে দেবসেবায় আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে।

প্রাচীন সুমেরীয় নগর উর-এর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন নেবুকাড্‌-নেজ্‌জার। সমগ্র শহরটির না হোক, অধিকাংশ দেবমন্দিরের নির্মাণ-কার্যে তাঁর হস্তাবলেপ সুপরিস্ফুট। তিনি শুধু পুরনো সৌধগুলিকে সংস্কার করেই ক্ষান্ত হন নি, প্রাচীন নির্মাণপদ্ধতির ধারা পরিবর্তন করে মৌলিক সৃষ্টি করেছিলেন। চন্দ্র-দেবতা নান্‌নার-এর মন্দিরের চতুর্দিকে ৪০০ গজ দীর্ঘ ও ২০০ গজ প্রশস্ত বিস্তৃত 'পবিত্র ভূমি' ("Sacred Area")-কে পরিবেষ্টিত করে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন তিনি—এই প্রাচীরের নাম 'ট্রেমেনস্‌ দেয়াল' (Tremenos Wall)। দুই সারি দেয়াল দিয়ে গঠিত এই প্রাকার, শীর্ষদেশ ৩৩ ফিট চওড়া, উচ্চতা সম্ভবত ৩০ ফিট। সামরিক গতিবিধির সুবিধার জন্যই শীর্ষদেশ বিলক্ষণ প্রশস্ত করা হয়েছিল। প্রাচীরটির ৬ ফুট উঁচু ভগ্নাবশেষ খনন-কার্য দ্বারা উদ্ধার করেছেন স্যর লিওনার্ড উলি।

তিনি বলেন—"Inside the wall nearly everything bore the stamp of Nebuchadnezzar's creation." অর্থাৎ, দেয়ালের ভিতর দিকে যা কিছু পাওয়া গেছে সবই নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের সৃষ্টির চিহ্ন বহন করে। এই নৃপতির পূর্ত-কার্যের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। অনেক পয়ঃপ্রণালী খনন করে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি—আর খালগুলির উদ্বৃত্ত জল সংগ্রহের জন্য একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন যার পরিধি ছিল এক শ' চল্লিশ মাইল।

৫৬১ খৃস্ট পূর্বাব্দে নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের মৃত্যু হয়। এই সুদীর্ঘ বেয়াল্লিশ বছর রাজত্বকালের যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নাই। আসিরীয় রাজন্যবর্গের যুদ্ধবর্ণনা কেমন এক প্রকার উৎকট ব্যাধিরূপে দেখা দিয়েছিল, আমরা তা পূর্বে আলোচনা করেছি। নব-ব্যাবিলোনীয় নৃপতিগণও শিলা-লিপি রেখে গেছেন বিস্তর, কিন্তু সেগুলি যুদ্ধ-বিবরণ নয়—শিলালিপির বর্ণনা ব্যাবিলন ও অন্যান্য শহরে মন্দির ও প্রাসাদসমূহের সংস্কার বা নির্মাণ-কার্যের স্মৃতিরক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের রাজত্বের মাঝামাঝি কালে লিডিয়া-রাজ আলিয়াটিস-এর সঙ্গে তাঁর আত্মীয় উভক্ষত্রের পঞ্চবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলেছিল। হিরোডোটাসের বিবরণে দেখা যায়, উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপন ব্যাপারে নেবুকাড্‌নেজ্‌জারই মধ্যস্থতা করেছিলেন।

ক্যালডিয়ান সাম্রাজ্যের পতন-কাল : শেষ নৃপতি নবোনিডাস

নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের মহিমা শেষবারের মত প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের রাজত্বকালে, এবং সেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটল তাঁর মৃত্যুর মাত্র বাইশ বছর পর। এই অল্পকালের মধ্যে চারজন নৃপতি ব্যাবিলনে রাজত্ব করেছিলেন। নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের পুত্র আমেল-মারদুক ছিলেন কৃতী পিতার অযোগ্য সন্তান। এই নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত অনাচারী নৃপতিকে হত্যা করে তার স্থলে নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের জামাতা নেরিগ্লিসার-কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রবলপ্রতাপ পুরোহিত-কুল। নেবুকাড্‌নেজ্‌জার কর্তৃক জেরুসালেম অবরোধকালে তিনি ছিলেন একজন সেনাপতি—বাইবেলে নেরগেল-সারেজার (Nergel Sharezer) নামে

অভিহিত (*Jeremiah 39*)। চার বৎসর পর এই কর্মকুশল নৃপতির মৃত্যু হল, এবং সেই সঙ্গে দেশের সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের আশাও অন্তর্হিত হল। তখন তাঁর নাবালক পুত্রকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করে পুরোহিতেরা নবোনিডাস নামক জনৈক স্বগোত্রীয় ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন (খৃঃ পূঃ ৫৫৫)। তিনিই ছিলেন ব্যাবিলনের শেষ নৃপতি। তাঁর জন্ম পুরোহিতকুলে, পুরোহিতের ঐতিহ্য নিয়েই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। মন্দিরনির্মাণ পরিকল্পনায় তিনি সর্বতোভাবে নেবুকাড্‌নেজ্জারের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, কিন্তু সেই বিচক্ষণ নৃপতির সমর-নৈপুণ্য বা গঠন-প্রতিভা কিছুই তাঁর ছিল না। পূজারীর বিষয়-বৈরাগ্য ছিল তাঁর একটি চরিত্রগত প্রকৃতি, যার জন্য রাজ্যশাসনে তিনি একান্তভাবে মনোনিবেশ করতে পারেন নি। তার ওপর মতিবুদ্ধি আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর আর একটি অব্যাপার—যেন গোদের ওপর বিষফোড়া। প্রাচীন মন্দির-গুলির ইতিহাস নিয়ে গবেষণাই সেই বিস্ফোটক। আসুরাধিপ আসুর-বানিপাল ছিলেন বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, অসংখ্য গ্রন্থের সংগ্রাহক। সম্ভবত তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নবোনিডাস একজন সত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক ও পুরাতত্ত্ববিদ্ হয়ে উঠেছিলেন। আক্‌কাডীয় রাজা সারগনের রাজত্বকাল তিনিই নিরূপণ করেছিলেন, এবং তাঁর নির্ধারিত কাল—খৃঃ পূঃ ২৭৫০—অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক গ্রহণ করেছেন। এই আবিষ্কারটির কথা বেশ গর্ব সহকারেই তাঁর লিখিত বিবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম ব্যাপারে তিনি একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যার জন্য তাঁকে পুরোহিতকুলের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। ধর্মকে তিনি চেয়েছিলেন কেন্দ্রীভূত করতে, এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের সকল নগর-দেবতাকেই ব্যাবিলনে নিয়ে এসে বেল-মারডুকের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রাজ-নৈতিক। স্ব স্ব প্রধান নগর-দেবতারা নগর-রাষ্ট্রসমূহের স্বাতন্ত্র্যই রক্ষা করে এসেছিল, রাজ্যে ঐক্যবিধান ও সংহতি সৃষ্টির প্রধান অন্তরায় তারা, দুর্বলতার কারণ। সম্ভবত ঐরূপ ধারণা থেকেই তিনি এই নূতন কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে ধর্মপ্রবণ। উরের চন্দ্র-দেবতা নান্নারের মন্দিরে তিনি তাঁর কন্যাকে পূজারিনীরূপে উৎসর্গ করেছিলেন।

পারস্যাধিপ কুরুশ : ওপিসের যুদ্ধ

মিডিসদের সহানুভূতি ও সাহায্য, মিডিস ও ক্যালডিস রাজবংশের মধ্যে বিবাহসূত্রে আত্মীয়তা স্থাপন নব-ব্যাবিলোনীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার গোড়াকার কথা। মিডিস ছিল প্রবল পরাক্রান্ত, আসিরিয়া ধ্বংস করেছিল প্রধানত মিডিসের বাহুবল, এখন কিন্তু সেই মিডিস-জাতির ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল তাদেরই জ্ঞাতিকুল দক্ষিণ পারস্যের অধিবাসী পারসীকদের হস্তে। ইলামের আনসান নামক প্রদেশের রাজা ছিলেন কুরুশ বা সাইরাস (Cyrus)। কতকাল পূর্বে আর্যজাতির একটি শাখা এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিল তা আমাদের ঠিক জানা নেই। উত্তরাঞ্চলে জাগ্রোস পর্বতের উপত্যকায় মিডিসদের রাজধানী ছিল আগবাটানা নগর, দক্ষিণে তেমনি তাদের স্বগোষ্ঠীয়রা পাসারগাদি (Pasargadae) নামক নগরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। আসুরবানিপালের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে ইলাম যখন শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল, সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন আনসান-রাজ চিশ্‌পিশ—তাঁর নির্দেশে যুবরাজ কুরুশ ইলামের রাজধানী সুসা নগর অধিকার করলেন। সিংহাসনে আরোহণ করে কুরুশ সুসায় রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন, তারপর যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করলেন মিডিয়ার বিরুদ্ধে। মিডিয়া-রাজ ইস্তুভেগু-র দৌহিত্র ছিলেন কুরুশ, মাতামহের বিরুদ্ধে তিন বছর অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে মিডিয়া অধিকার করলেন তিনি। এবার এল ব্যাবিলন (ক্যালডিয়া) আক্রমণের পালা। পারসীক সৈন্যবাহিনীর কুচের মোড় ঘুরল ব্যাবিলনের দিকে।

ক্যালডিয়ার রাজা নবোনিডাসের নির্দেশে যুবরাজ বেলসেজ্‌জার আক্রমণোদ্যত পারসীক বাহিনীর গতিরোধ করতে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। অতি প্রাচীন নগর ওপিস, সেখানে বাধল কুরুশের সঙ্গে বেলসেজ্‌জারের যুদ্ধ (battle of Opis)। বেলসেজ্‌জার পরাজিত হলেন। ওপিসের রণাঙ্গনে পরাজিত হয়েও তিনি সংগ্রাম চালাতে চেয়েছিলেন সৈন্য সংগ্রহ করে, কিন্তু বারবার ব্যর্থকাম হন। নবোনিডাস পলায়ন করলেন। গুবরু নামে নেবুকাড্‌নেজ্‌জারের আমলের একজন প্রতিষ্ঠাবান ভূতপূর্ব সেনাপতি পূর্বাহ্নেই ব্যাবিলনের দুর্বলতা উপলব্ধি করে এই স্থির করেছিলেন যে দেশবাসীর পক্ষে

সর্বনাশ থেকে উদ্ধার লাভের একমাত্র উপায় বিনা যুদ্ধে পারস্যের কাছে আত্ম-সমর্পণ। বিনা শর্তে পারস্য সাম্রাজ্য মধ্যে ব্যাবিলনের অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন তিনি, এবং এই মনোভাব নিয়ে যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে, কুরুশ একরকম বিনা যুদ্ধেই ব্যাবিলন দখল করেছিলেন 'বেল-মারদুকের আশীর্বাদ মাথায় ধারণ করে'। অভিজাতবর্গ কর্তৃক পরিত্রাতা রূপে অভ্যর্থিত হলেন কুরুশ, পুরোহিতকুল তাঁকে উদ্‌বাহু হয়ে সংবর্ধন করলেন। গুবরু ব্যাবিলনের রাজ্যপাল নিযুক্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবী বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করলেন যুদ্ধে পরাজিত বেলসেজ্‌জারের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে হত্যা করে। ইতিপূর্বেই নবোনিডাস বন্দী হয়েছিলেন।

ইতিহাসে ওপিসের যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই জন্য যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ সারা ব্যাবিলোনিয়াকে কুরুশের হাতে তুলে দিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূল পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁর অধিকার বিস্তারের পথ মুক্ত করে দিয়েছিল। আরও একটি বিষয়ে পশ্চিম এশিয়ায় পারসীক শক্তি বিস্তারের তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। আক্কাড-বংশীয় সারগনের আমল থেকে দু হাজার বছরেরও ঊর্ধ্বকাল ধরে সেমেটিক জাতিই এ অঞ্চলে শাসন করে এসেছিল, অবশ্য ক্যাসাইটদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তারাও সেমেটিক সংস্কৃতি, সেমেটিক ভাষা সম্পূর্ণভাবেই গ্রহণ করেছিল। আর্য দিগ্বিজয়ীর পুরোধারূপে কুরুশের আবির্ভাব পশ্চিম এশিয়ায় আর্যদের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এবং এই আর্য-আধিপত্য চলেছিল পারসীক, গ্রীক, পার্থব ও সাসানিডদের রাজত্বকাল ষষ্ঠ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন আরব বাহুশক্তির নব-অভ্যুত্থান সেমেটিকদের পূর্ব-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম হয়েছিল।

এমনিভাবে নব-ব্যাবিলোনীয় রাজবংশের অবসান ঘটেছিল। অধঃপতনের মূল কারণ এই যে, নবোনিডাস রাজপদ লাভ করেছিলেন পুরোহিত-সমাজের সমর্থনের ফলে, এবং তিনি নিজেও ছিলেন একজন পুরোহিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই পুরোহিতদের সঙ্গেই তিনি কলহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাদের বদ্ধমূল ধর্ম-সংস্কারকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন নগর থেকে বিগ্রহ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্যম ব্যাবিলন নগরকে প্রাচীন বিগ্রহসমূহের একটি মিউজিয়ামে পরিণত করেছিল। কিন্তু এই কার্যটির গুরুতর পরিণামের কথা চিন্তাও

করেন নি অদূরদর্শী রাজা নবোনিডাস। নগরের রক্ষাকর্তা নগর-দেবতা—প্রজাকুলের মনে গভীর অসন্তোষ জেগে উঠেছিল এই ভেবে যে বিগ্রহ স্থানান্তরিত করে তিনি তাদের দৈবী শক্তির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করেছেন। এই সার্বজনীন ব্যাপক অসন্তোষই কুরুশের নির্বিরোধে ব্যাবিলন অধিকারের পথ সুগম করে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে কুরুশের ব্যাবিলন বিজয় ধ্বংস-কার্যে পর্যবসিত হয় নি। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল কুরুশের। পুরোহিত ও জনগণের রক্ষণশীল ধর্মভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মারদুকের মন্দিরে বিভিন্ন নগর থেকে সংগৃহীত বিগ্রহসমূহ নিজ নিজ স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। ইহুদিদের বদ্ধাবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বদেশে প্রেরণ করেছিলেন, তাই ব্যাবিলনে নির্বাসিত ইহুদি সম্প্রদায় কুরুশের এই বিজয়-অভিযানকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলেই মনে করেছিল, এবং সেজন্য তাঁকে তাদের ধর্মশাস্ত্র 'ঈশ্বরানুগৃহীত রাজা' ('anointed by the Lord') রূপে বর্ণনা করেছে।

ইতিহাসে ধর্মতত্ত্ব—'দেয়ালের গায়ে লিখন'

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও অন্যান্য প্রামাণিক তথ্য নিয়ে ইতিহাসের কারবার, ক্যালডিয়ার পতনের উপরোক্ত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকেই আহরণ করা হয়েছে। কিন্তু হিব্রুরা চিরদিন ধর্মতত্ত্বের রসায়নে ইতিহাসের বৃত্তান্ত-গুলিকে জারিত করেই গ্রহণ করেছে, তাই স্বদেশের স্বর্ণভূমি থেকে ইহুদিদের নির্বাসিত করেছেন স্বয়ং জিহোভা তাদের পাপাসক্তির জন্য, ঈশ্বরের ন্যায়নিষ্ঠার ওপর দৃষ্টি রেখে এই নিদারুণ আত্মনিন্দা করেছিলেন প্রফেট জেরেমিয়া। আর বাইবেলে প্রফেট নাহুম আবেগকম্পিত ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন, কিরূপে অত্যাচারী আসিরিয়ার ওপর ঈশ্বরের উদ্যত হস্তের খড়্গাঘাত নিনেভের পতন ঘটিয়েছিল। তেমনি আর একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর অবতারণা করেছেন হিব্রু ড্যানিয়েল মানবের প্রতি ঈশ্বরের আচরণকে সমর্থন করবার জন্য ("to justify the ways of God to man"), এবং সেখানে হিব্রু ধর্মতত্ত্বকেই দেখি আমরা জেরুসালেম লুণ্ঠনকারী পৌত্তলিক ক্যালডিয়ার বিভীষিকাময় ভবিষ্যৎ নিয়তির হস্তাক্ষরে দেয়ালের গায়ে লিখে যেতে। বাইবেলে ক্যালডিয়ার শেষ নৃপতির নাম বেলসেজ্জার, ইতিহাসে যিনি যুব-রাজ, নবোনিডাসের নাম বাইবেলে নেই। সেই গ্রন্থে রাজা বেলসেজজারের

'স্বপ্নদর্শনে'-র চমৎকার বর্ণনায় বলা হয়েছে, নিশীথ রাত্রে প্রমোদোৎসব-কালে পাত্র-মিত্র বারাঙ্গনা পরিবৃত বেলসেজ্জার দেয়ালের গায়ে নিয়তির লিখন দেখে ভয়চকিত হয়ে ওঠেন, এবং পরদিন প্রভাতে সেই নিয়তির লিখন ধরল সত্যরূপ—রাজা নিহত হলেন, ব্যাবিলোনিয়ার পতন ঘটল, আর তাঁর সিংহাসন অধিকার করল পারসীক (*Daniel 5*)। বাইবেলের এই কাহিনী অবলম্বন করে কবি বাইরন Belshezzar's Vision নামে একটি চমৎকার কবিতা লিখেছিলেন, সেই পদ্যরচনাটি উজ্জ্বল দ্যুতি বিকীর্ণ করে রয়েছে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের মণিমঞ্জুষায়। কবিতাটির বাংলা রূপ এই :

বেলসেজ্জারের দিব্য-দর্শন

বসেছিল রাজা সিংহাসনে,
সভাঘরে পাত্রমিত্র দল—
মত্ত সবে উৎসব ব্যসনে,
দীপমালা করে ঝলমল।
যে স্বর্ণপাত্রে জিহোভারে
    ভক্তি অর্ঘ্য পূত বারি
        দেয় ইহুদিরা,
পৌত্তলিক যারা ধর্মহীন
    পান করে সেই পাত্রে
        বিহ্বল মদিরা।

অকস্মাৎ সভাগৃহে
    দেখা দিল একখানি হাত—
অঙ্গুলির ঋজু যষ্টি,
    যেন শুষ্ক মরুবালুকায়,
স্থূল হস্ত অবলেপ
    লিখে গেল দেয়ালের গায়,
অক্ষরের সারি বেঁধে
    কার জানি অজানা বরাত!

দেখে রাজা কাঁপে থরথর,
থেমে গেল প্রমোদ-কল্লোল,
প্রাণহীন দৃষ্টি অপ্রখর,
ভাঙা কণ্ঠে ফুটে ওঠে বোল :
"ধরা মাঝে বিজ্ঞ সুধী যারা,
এস ত্বরা করে।
যে অক্ষর ভীতির সঞ্চার
করেছে অন্তরে,
সেই ভয় দূর হবে
ব্যাখ্যা যদি কর অক্ষরের—
নিশার আঁধার কেটে
ধারা বয়ে যাবে আনন্দের।"

ক্যালডি-র সুধীগণ,
ব্যাবেলের প্রাজ্ঞ বর্ষীয়ান,
জ্ঞান-বৃদ্ধ শাস্ত্রবিদ,
এল সব দেশের বিদ্বান।
স্থির নেত্রে দেখে তারা,
বিস্ময় মানে না—
আখরের পরিচয়
কেউ তো জানে না।

বন্দী এক অনামী তরুণ
শোনে সেই আদেশ রাজার—
অক্ষরের সত্য সকরুণ
দিল তার মরমে ঝংকার।
চারদিকে উজ্জ্বল দীপের
স্বর্ণরশ্মি—নিয়তির বাণী
চোখে ভাসে—স্তব্ধ নিশীথের
নিথর নীরব হাতছানি

গোপন যে সত্য ব্যক্ত করে ইশারায়,
প্রভাতে সে দেখা দিল বাস্তব কায়ায়।

"সমাধি রচিত দেখ
নরপতি বেলসেজ্জারের—
রাজ্য তার অস্তমিত,
কেটে গেছে ঘোর স্বপনের।
সে যে ওই পড়ে আছে
লঘু ক্লেদ পঙ্কের মতন,
রাজ-পরিচ্ছদ তার
মূল্যহীন শব-আচ্ছাদন,
চন্দ্রাতপ তার যেন শিলা সমাধির—
ওই দেখ মিডিসেরা বহায় রুধির
নগরের সিংহদ্বারে—সভার অঙ্গনে
পারসীক এসে বসে রত্ন-সিংহাসনে।"

৫৩৯ খৃস্ট পূর্বাব্দে কুরুশ ব্যাবিলনে প্রবেশ করেন। ব্যাবিলনের ইতিহাসের যবনিকা পতন হয়েছে সেই সঙ্গে, এ কথা সত্য হলেও আসিরিয়ার মত তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নি। পরাধীন অবস্থায়ও জনগণের জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলতে লাগল, ব্যবসায়ীদের কারবার ও বাণিজ্যও ছিল অব্যাহত। কুরুশের শাসনাধীনে ব্যাবিলনে শান্তি বিরাজ করত, তার কারণ প্রত্যেক জাতির ও প্রত্যেক ধর্মের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধা, কোন জাতির ধর্ম, আচার ও বিধানসমূহের ওপর হস্তক্ষেপ করেন নি তিনি। কর বৃদ্ধি করা হয় নি। রাজনৈতিক পরিবর্তন শুধু রাজবংশকেই বদলে দিয়েছিল, কোনরূপ অর্থনৈতিক বা সামাজিক গ্লানি বহন করে আনে নি। ফলে আসিরিয়ার শাসনকালে যেরূপ ঘন ঘন ষড়যন্ত্র ও অশান্তি দেখা দিয়েছিল, কুরুশের রাজত্বকালে তেমন কোন উপদ্রব ঘটে নি।

কুরুশের পরবর্তী কালও হয়তো বা এমনি নিরুপদ্রবে কেটে যেত, কিন্তু তাঁর পুত্র কাম্বোজিয় বা ক্যামবিসিস্ (Cambysis)-এর রাজত্বকালে পারস্য সাম্রাজ্যের একটি আপদকাল উপস্থিত হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের আবশ্যক নেই—এখানে শুধু এই মাত্র বলা যেতে পারে যে, মিশর-বিজয়ের

পর প্রত্যাগমনের পথে সিরিয়ায় যখন কাম্বোজিয়ের মৃত্যু হল, তখন পারস্যের সিংহাসন দখল নিয়ে বিবাদ বাধে, আর সেই সময় ব্যাবিলনেও বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল। মিশর-বিজয়ী পারসীক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন দারায়ুস বা ডেরায়াস (Darius)—পারস্য রাজবংশীয় বিশতস্‌পের পুত্র। অচিরেই তিনি পারস্যের সিংহাসন অধিকার করে সসৈন্যে ব্যাবিলনে যুদ্ধযাত্রা করলেন (খৃঃ পূঃ ৫২১)। বিদ্রোহ দমনকালে ব্যাবিলনের নগর-প্রাচীর ভূমিসাৎ করেন দারায়ুস। ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীর ও মারডুকের বিশাল মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন দারায়ুস-পুত্র জারেক্‌জেস্‌ (Xerxes)। সম্রাট দারায়ুস বাহিস্তান পর্বতগাত্রে তাঁর বিজয়কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন —সেই শিলালিপির পাঠোদ্ধারের ফলেই আমরা ব্যাবিলোনিয়া ও আসিরিয়ার প্রাচীন ইতিহাস অবগত হয়েছি, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। খৃঃ পূঃ ৩৩১ অব্দে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার নিজেকে 'এশিয়ার রাজা' (King of Asia) বলে ঘোষণা করে ব্যাবিলনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করলেন। তখন বিরাট ধ্বংসের মধ্যে শহরটির জীবন স্তিমিতপ্রায়—দশ হাজার ব্যক্তির দু মাসেরও অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল মারডুক মন্দিরের ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করবার জন্য। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলেকজাণ্ডার সেই মন্দিরটিকে পুনর্নির্মাণ করতে পারেন নি।

ক্যালডিয়ানরা নূতন কোন সভ্যতা গড়ে তোলে নি। পূর্বকালের সেমেটিক যাযাবরদের মত, এককালে তারাও ছিল যাযাবর সেমেটিক জাতি, নদী-উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করে ব্যাবিলোনীয় সভ্যতাকে তারা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। তাম্রযুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে। ব্যাবিলনে লৌহযুগ প্রবর্তন করেছিল আসিরীয়রা, কিন্তু ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজের কোন ক্ষেত্রেই পারম্পর্য ভঙ্গ হয় নি। সুদীর্ঘ তিন সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল ধরে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে ব্যাবিলোনিয়া, ভাগ্যবিপর্যয়ও ঘটেছে তার বিস্তর। সেমেটিক জাতির সংস্পর্শ ও বিভিন্ন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সংস্কৃতি শুধু খোলসই বদলিয়েছে, তার প্রকৃতিগত মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

বর্ষপঞ্জী

১. সুমের ও আক্কাড

খৃঃ পূঃ

খৃঃ পূঃ	(কিশ)	(লাগাস)	(উম্মা)	(উর)
৩৬০০	**সুমেরীয় সভ্যতার সূচনা**			
—	মেসিলিম	লুগাল-সাগ-এঙ্গুর	—	—
৩১০০	—	উর-নিনা	—	—
৩০০০-২৯০০	—	এয়ানাটুম	—	—
		এনান্নাটুম (১)	উর-লুম্মা	—
		এনটেমেনা		
		এনান্নাটুম (২)		
		* * *		
	(কিশ-বংশ)	উরুকাগিনা	লুগল-জাগ্গিশি	
২৭০০	মনিসটুস্থ	—	—	—
	উরুমুস			
	(আক্কাড-বংশ)			
২৬৫০	সার-গনি-সারি (সারগন)	—	—	—
২৬০০	নারাম-সিন	—	—	—
২৪৫০	—	গুডিয়া	—	
		উর-নিনগিরস্থ		
২৪০০	—	—	—	উর-এঙ্গুর
২৩৫৭	**ইলাম কর্তৃক উর ধ্বংস**			
২৩৫০	—	—	—	ডুঙ্গি
				বুর-সিন
				গিমিল-সিন
				ইবি-সিন

২৩০০-২১০০ ইসিন-বংশের রাজত্বকাল

প্রথম রাজা ইসবি উরা	**(লারসা ও উর)**
শেষ রাজা দামিক ইলিসু	গুনগুনুম
—মোট ১৬ জন	(খৃঃ পূঃ ২২৪২)
	রিমসিন
	(খৃঃ পূঃ ২০৭১)

২০৯২ হাম্মুরাবির ব্যাবিলোনিয়া বিজয়

১ ব্যাবিলন

খৃঃ পূঃ

২২২৫-১৯২৬ ··· প্রথম ব্যাবিলোনীয় রাজবংশ

২২২৫-২২১২ ··· সুমু-আবুম
২২১১-২১৭০ ··· সুমু-লা-ইলাম
২১৭৫-২১৬২ ··· জাবুম
২১৬১-২১৫৪ ··· আপিল-সিন
২১৪৩-২১২৪ ··· সিন-মুবালিট
২১২৩-২০৮১ ··· হাম্মুরাবি (আইন-প্রণেতা)
২১১৭-২০৯৪ ··· হাম্মুরাবির দিগ্বিজয়
২০৮০-২০৪৩ ·· সামসু-ইলিনা
২০৪২-২০১৫ ··· আবি-এসু
২০১৪-১৯৭৮ ··· আম্‌মি-দিতানা
১৯৭৭-১৯৫৭ ··· আম্‌মি-জাদুগা
১৯৫৬-১৯২৬ ··· সামসু-দিতানা

১৯২৬-১৭০৩ ··· দ্বিতীয় ব্যাবিলোনীয় রাজবংশ (১১ জন নৃপতি)

১৭৬০-১১৬৯ ··· ব্যাবিলোনিয়ায় ক্যাসাইট আধিপত্য

১৭৬০ ··· প্রথম ক্যাসাইট নৃপতি গন্দাস

১৪৬১ … ক্যাসাইটরাজ বুরনা-বুরিশ

৩. আসিরিয়া

১৭১৬ … আসিরিয়ার অভ্যুত্থান : দ্বিতীয় সামসি-আদাদ
১২৭৬ … প্রথম সালমানেসার কর্তৃক আসিরিয়া একীকরণ
১১১৫-১১০২ প্রথম টিগলাথ পিলেসার : সাম্রাজ্য বিস্তার
দ্বিতীয় টিগলাথ পিলেসার
৯৫০ … আসিরিয়ার পুনরভ্যুত্থান
তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার
দ্বিতীয় আসুর-দান
৯১১-৮৯০ … দ্বিতীয় আদাদ নিরারি
৮৯০-৮৮৪ … দ্বিতীয় টুকুল্‌তি-নিনিব
৮৮৪-৮৬০ … তৃতীয় আসুর-নাজির-পাল
৮৬০-৮২৪ … দ্বিতীয় সালমানেসার
৮৫৪- … কারকারের যুদ্ধ
৮২৫-৮১২ … চতুর্থ সামসি-আদাদ
১২-৭৮৩ … তৃতীয় আদাদ-নিরারি (সেমিরামিস উপাখ্যানের নায়িকার স্বামী)
৭৮৩-৭৭৩ … তৃতীয় সালমানেসার
৭৭৩-৭৬৩ … তৃতীয় আসুর-দান
৭৬৩-৭৫৫ … চতুর্থ আদাদ-নিরারি
৭৫৫-৭৪৬ … তৃতীয় আসুর-নিরারি
৭৪৫-৭২৭ … তৃতীয় টিগলাথ পিলেসার
৭২৭-৭২২ … চতুর্থ সালমানেসার
৭২২-৭০৫ … দ্বিতীয় সারগন বা সারুকেনু
৭০৫-৬৮১ … সেননা চেরিব
৬৮২-৬৬৯ … এসারহেডন বা আসুর-আখি-ইদ্দিন
৬৬৯-৬২৬ … আসুরবানিপাল বা আসুর-বানি-হাবল

শকগণের আক্রমণ

৬২৬-৬০৬ ... সিন-স্থম-লিসির
আস্থর-এতিল-ইলানি
সিন-সার ইসকুল

৬১২ ... **নিনেভে ধ্বংস**

৪. ক্যালডিয়া বা নব-ব্যাবিলোনিয়া

৬২৫ ... নবোপোলাস্‌সার কর্তৃক নব-ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
৬১২ ... নিনেভের পতন : আসিরিয়ার তিরোধান
৬০৪-৫৬২ ... দ্বিতীয় নেবুকাড্‌নেজ্‌জার
৬০৪ ... কারকেমিশের যুদ্ধ : মিশরীদের পরাভব
৫৯৭-৫৮৬ ... জেরুসালেম অধিকার : ইহুদিদের ব্যাবিলনে নির্বাসন
৫৬২-৫৬০ ... আমেল মারদুক
৫৬০-৫৫৬ ... নেরগল-সার-উস্থর
৫৫৬ ... লাবাসি-মারদুক
৫৫৫-৫৩৯ ... নবু-নাইদ বা নকোনিডাস
৫৩৯ ... পারস্য-রাজ কুরুশ কর্তৃক ব্যাবিলোনিয়া বিজয়

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

(Sir) A. Layard—*Nineveh and Babylon*
A. Robinson—*Morals in World History*
Arnold Toynbee—*A Study of History*
F. W. Westaway—*The Endless Quest—3000 Years of Science*
George Rawlinson—*Five Monarchies*
Gordon Childe—*What Happened in History*
—*The Most Ancient East*
H. G. Wells—*Outline History of the World*
H. R. Hall—*The Ancient History of the Near East*
J. H. Breasted—*Ancient Times*
James T. Shotwell—*The History of History*
Jawaharlal Nehru—*Glimpses of World History*
Leonard W. King—*History of Sumer and Akkad*
—*History of Babylon*
(Sir) Leonard Woolley—*Digging up the Past*
—*Ur of the Chaldees*
Lewis Spence—*Outline of Mythology*
Old Testament—*Kings ; Chronicles ; Isiah ; Nahum*
Sherwood Taylor—*A Short History of Science*
W. G. De Burge—*The Legacy of the Ancient World*
Wallbank and Taylor—*Civilization—Past and Present*
Webester and Wesley—*World Civilization*
Will Durant—*Our Oriental Heritage*
Zenaide A. Ragozin—*Assyria*

এই লেখকের আর দু'খানি বই সম্বন্ধে

ক য়ে ক টি অ ভি ম ত

প্রাচীন মিশর

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

'The present work forms a very illuminating introduction to the splendour of Ancient Egyptian culture....The book is eminently readable...A book of this type has a very great intellectual and cultural significance for Bengali readers.'

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

'সুসাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "প্রাচীন মিশর" নামে মিশর দেশের একটি মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।...এমন একটি উপাদেয় গ্রন্থ রচনার জন্য এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসশাখার একটি প্রকাণ্ড ফাঁক পূরণ করার জন্য শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার প্রতিটি অনুরাগী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।'

ডক্টর কালিদাস নাগ বলেন :

'.. শীঘ্র এই ইতিহাস-বিজ্ঞান সমর্থিত বাংলা বইখানি রাষ্ট্রভাষায় অনূদিত হওয়া উচিত।'

Amrita Bazar Patrika বলেন :

'We congratulate the author on his fruitful labour which has definitely enriched Bengali literature. Told in literary prose, the dry facts of history have become immensely interesting. Here is a suitable book for every library.'

আনন্দবাজার পত্রিকা বলেন :

'"প্রাচীন মিশর" বইটি থেকে বাঙালী পাঠক প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুন্দর ও সম্পূর্ণ পরিচয় পাবেন।...গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর

শ্রেণীবিভাগ—অথবা বলা যায় পুরো বইটির স্কীম—অত্যন্ত সুন্দর। বিশেষ করে প্রাচীন মিশরের ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্য-নীতি সম্পর্কে লেখকের অনেকগুলি স্বাধীন মন্তব্য নূতন রকমের অনুসন্ধিৎসা জাগায়।'

মহাচীনের ইতিকথা

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এল. সি. বলেন :

'MAHA-CHINER ITIKATHA...is destined to go down in the history of Bengali literature as a remarkable monument of painstaking, comprehensive and accurate historical scholarship. ...It is the first endeavour of its kind in the Bengali Language.'

সাপ্তাহিকপত্র দেশ বলেন :

'সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমানে, এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে চৈনিক সভ্যতার যে ক্রমাগ্রসর ধারা—ধর্মে, শাসনে, সংস্কৃতিচর্চায় কি প্রাচ্য সভ্যতার উন্নয়নে তা নিঃসন্দেহে বিস্মিত অনুধাবনযোগ্য।...এই অমূল্য গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক স্বীকৃতি ছাড়াও একটি বিশেষ সাহিত্যমূল্যও রয়েছে। ইতিহাস যে কখনো কখনো উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য হয় বর্তমান গ্রন্থে তার প্রমাণ মিলবে।'

মাসিক বসুমতী বলেন :

'...চীনের বিগত সভ্যতা ও বর্তমান সভ্যতা, তার পুরাতন ও নূতন সমস্যাসমূহ, তার রাষ্ট্রব্যবস্থা শাসনপদ্ধতি, তার সামাজিক আচার আচরণ, এ সব-কিছুরই একটি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ছবি পাওয়া যায় আলোচ্য গ্রন্থে।... চীন দেশ সম্বন্ধে পুস্তকখানি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা দাবী করতে পারে স্বচ্ছন্দেই।'